# আঁধার রাতের আগন্তুক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

# ANDHAR RATER AGANTUK

প্রথম প্রকাশ
১৩৭২ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

# আঁধার রাতের আগন্তুক

ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন। শহর ও নগর সৃষ্টি করেছে মানুষ। ইট, কাঠ, পাথরে গড়া বড় বড় শহর আর নগরগুলো বড়ই চমকদার, বড়ই চটকদার, বড়ই আকর্ষণীয়। জীবিকার কারণে, মোহের আকর্ষণে আর হাজারো ইচ্ছাপূরণের আশা বুকে নিয়ে দুনিয়ার মানুষ ভিড় করে মানুষের সৃষ্ট এইসব বড় বড় শহর আর নগরগুলোতে।

এখানে যারা সফল হয়, বিত্ত আর বৈভবের অধিকারী হয়, তারা তাদের শক্ত হাতের মুঠোয় বন্দি করে রাখে এখানকার সকল সুখ, সকল স্বাচ্ছন্দ্য, সকল আনন্দকে। আর যারা বিফল হয়, তারা হতাশ হয়, তারা নিরাশ হয়। জীবন ও জীবিকার জন্য এখানে তাদের কঠিন লড়াই করে টিকে থাকতে হয়।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদে, যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে বড় বড় শহর আর নগরের বিত্তবানেরা একদিকে পেয়েছে আরামপ্রদ জীবন, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন, আনন্দময় জীবন। কিন্তু অন্যদিকে তারা যা হারিয়েছে, বড় বড় শহর আর নগরগুলো থেকে যা খোয়া গেছে তার তালিকাও বড় কম নয়।

দূষণে মোড়া এইসব বড় বড় শহর আর নগরগুলোতে খোলা আকাশ নেই, মুক্ত বাতাস নেই, নেই এখানে বিহঙ্গের মধুর কলতান। এখানকার আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো মুছে দিয়েছে ভোরের মিষ্টি স্বপ্নের মতো দৃশ্যমান দূরের দিগন্ত রেখাকে।

এখানে ঝিল নেই, বিল নেই। নেই এখানে শান বাঁধানো পুকুর। এখানে দিনে ফোটে না মধুগন্ধা পদ্মিনী, রাতে ফোটে না শিশির-গন্ধা কুমুদিনী। এখানে নেই রুই কাতলা চিতলের দাপাদাপি, চুনো-পুঁটির লাফালাফি। এখানে নেই মাছরাঙা, পানকৌড়ি আর মেছো বকের আনাগোনা। নেই এখানে শঙ্খচিলের উদাস করা মূর্ছনা।

এখানে অরণ্যানী নেই। নেই এখানে দোয়েলের সুতীক্ষ্ণ শীষ, কোয়েলের কুহু-কুহু রব। এখানে নেই পাপিয়ার পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা জিজ্ঞাসা, বউ কথা কও-এর নিরবচ্ছিন্ন সুর-মূর্চ্ছনা।

এখানে খেত নেই, খামার নেই, ঝোপ নেই, ঝাড় নেই। নেই এখানে আত্মগোপনকারী কুবোর কুব্ কুব্ হুঙ্কার।

এইসব বড় বড় শহর আর নগরগুলোতে রাত্রি নামে না। তাই বহু গল্প প্রসবিনী এইসব শহর আর নগরগুলোতে জমে ওঠে না গল্পের আসর।

এখানে রাত্রি নামে না। কারণ, রাত্রি এখানে নামতে ভয় পায়। দিন-ভ্যাঙানো বিজলী বাতির নিঃশব্দ অহঙ্কারে ভীত হয়ে রাত্রি এখানকার ঊর্ধ্বাকাশে থমকে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই বেচারী রাত্রি অবাক বিস্ময়ে এইসব আজব শহর আর নগরগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

গ্রামে কিন্তু রাত্রি নামে। আজও নামে। তুলসীতলার মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনির রেশ আর মসজিদের পবিত্র আজানের রেশ মিলিয়ে যেতেই ধীর পদক্ষেপে এখানে রাত্রি নামে।

এখানে ধীরে নামে রাত্রি! রহস্যময়ী রাত্রি। রাত্রির শীতল স্পর্শে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলো শান্তি পায়, স্বস্তি পায়

এখানে আঁধারকে সঙ্গী করে ধীরে ধীরে নামে রাত্রি। রহস্যময়ী রাত্রি।

যখন রাত্রি নামে, গ্রামগুলো ছেয়ে যায় আঁধারে। আর সে আঁধার দূর করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ জোনাকি। সারা গ্রামে তারা দীপ জ্বেলে দেয়। বিন্দু বিন্দু নীল আলোয় ভরিয়ে দেয় গ্রামগুলো। আঁধার ফিকে হয়।

এখানে আঁধারকে সঙ্গী করে ধীরে নামে রাত্রি। রহস্যময়ী রাত্রি।

যখন রাত্রি নামে, বনফুলের তীব্র সুগন্ধে রাতের বাতাস মোহগ্রস্ত হয়, মাতাল হয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো ঝিল্লী রব তুলে রাতের থমথমে ভাবকে ভেঙে দিতে সচেষ্ট হয়।

রহস্যময়ী রাত্রির স্পর্শে গ্রামের বনাঞ্চলের তখন আর এক অনির্বচনীয় রূপ।

যখন রাত্রি নামে, সজারু দম্পতি তখন ঝম্ ঝম্ আওয়াজ তুলে নিশি ভ্রমণে বের হয়। উপোসী বাদুরগুলো দলবদ্ধ ভাবে আম জাম কলা বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলাহারে ওরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। কাল পেঁচাগুলো কিচ্ কিচ্ কিচ্ আওয়াজ তোলে। অতর্কিতে ওরা ব্যাঙ আর মেঠো ইঁদুরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে শিকারের ভবলীলা সাঙ্গ করে। তারপর মাংসাহারে ওরা সারাদিনের কঠোর উপবাস ভঙ্গ করে। কোটর পেঁচাগুলো বিরাট বিরাট গাছের কোটরে বসে বিজ্ঞজনের মতো বনরাজ্যে সংঘটিত তাবৎ ঘটনা গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

রাত্রি বাড়তে থাকে। গভীর রাতে উঁচু গাছের ডালে বসে হুতোম পেঁচাগুলো বিকট হুম হুম আওয়াজ তুলে ছোট ছোট বন্যপ্রাণীগুলোকে ভয় দেখায় সেই বিকট আওয়াজে পল্লীর ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানব শিশুর ঘুম ভেঙে যায়। ভয় পেয়ে ওরা ককিয়ে কেঁদে ওঠে। ওরা মায়ের কোলের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ওরা মায়ের বুকে মুখ লুকায়।

বন্যশূকরগুলো দলবদ্ধভাবে বনভূমিতে টহল দেয়। ওরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলে, মূল আর শেকরের সন্ধানে মাটি খোঁড়ে

যামঘোষগুলো প্রতিযামে ঐক্যবদ্ধভাবে যাম ঘোষণা করে বনভূমিতে প্রহর নির্দেশ করতে থাকে রহস্যময়ী রাত্রি রিমঝিম, রিমঝিম আওয়াজ তুলে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে

পূবের আকাশ ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি বিদায় নেয়।

দীর্ঘ সুষুপ্তির পর অতিভোরে যখন গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষগুলো জেগে ওঠে, কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, সমস্ত নিশাচর প্রাণী আর কীটপতঙ্গের জগতে তখন শুরু হয় ঘুমের আয়োজন।

জোনাকী আর দীপ জ্বালে না সে পরিশ্রান্ত তার ঘুমের প্রয়োজন ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ঝিল্লী রব তোলে না। সেও পরিশ্রান্ত সেও ঘুমোতে চায়। সজারু দম্পতিরও সেই একই কথা। একই কথা বলে কালপেঁচা, কোটর পেঁচা আর হুতোম পেঁচা। আকণ্ঠ ফলাহারে তৃপ্ত বাদুড় ঢুলু ঢুলু চোখে সুউচ্চ বৃক্ষশাখে বাদুড় ঝোলা হয়ে ঝুলে পড়ে।

ওদিকে পর্যাপ্ত বিশ্রামের আশায় বন্যশূকর তখন খুঁজে ফেরে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। আর রাতভর প্রহর-ঘোষণা কর্মের শেষে, বিশ্রাম মানসে শৃগাল ফিরে চলে তার পাতালপুরীর আবাসনে।

বনভূমির শাসন ব্যবস্থা বনরাজের নিজের হাতে। বড় কঠিন তাঁর শাসন। বনভূমিতে তাঁর কথাই শেষ কথা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশে সারা বনভূমিতে শব্দ-জব্দ আইন বলবত হয়। তাঁর নির্দেশেই উঁচু গাছের ডালে বসে ঘুঘু পাখিগুলো একটানা ঘু-ঘু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু ডাকে ঘুমপাড়ানি গান গায়। সে গানে সারা বনভূমিতে ঘুমের আমেজ নেমে আসে। অচিরেই বনের তাবৎ রাতজাগা প্রাণী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তখন আইনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের কারণেই রঙ্গিন প্রজাপতিগুলো নিঃশব্দ ডানায় উড়ে বেড়ায়, বনফুলের মধু খায়। বাঁশঝাড়ে পাকা বাঁশ পাতাগুলো বহু উঁচু থেকে ঘুরপাক খেতে খেতে নিঃশব্দে নীচে নেমে আসে। তারপর তারা চিরদিনের মতো ছায়াশীতল ভূমিশয্যা গ্রহণ করে। চঞ্চল খরগোসগুলো নিঃশব্দে ঘাসবনে লাফিয়ে বেড়ায়, কচি ঘাসে পেট ভরায়। অতিচঞ্চল কাঠবিড়ালীগুলো পর্যন্ত আইন মোতাবেক নিঃশব্দ পদে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ওরা এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে পড়ে, পাকা ফলের স্বাদ গ্রহণ করে। বনভূমিতে সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলে।

দিনান্তে সপ্তরঙ ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য পাটে বসে। সূর্যের ওই সপ্তরঙের অন্তরালেই অপেক্ষা করে থাকে সন্ধ্যা। একসময় সপ্তরঙ অন্তর্হিত হয়। এগিয়ে আসে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার আগমনে জেগে ওঠে বনভূমি প্রত্যাহৃত হয় সেথায় শব্দ-জব্দ আইন। আর গ্রামের ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাদীপ। ক্ষুদে পড়ুয়ারা সেথায় ছেঁড়া মাদুরে বসে মিটিমিটি আলোয় দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করতে থাকে। তাদের ঐকতানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

আবার সন্ধ্যার আগমনে গ্রামের কোথাও বা জমে ওঠে সান্ধ্য-গল্পের আসর। কোন গল্পের আসর বসে জীর্ণ কোন আট চালায় আবার কোন গল্পের আসর বসে কোন গল্পের বৈঠকখানায়।

শীতের সন্ধ্যা। এমনই এক সন্ধ্যা-গল্পের আসর বসেছে ব্রজপুর গ্রামপ্রান্তের এক জীর্ণ আটচালায়। আটচালার চালের বাতা থেকে দড়িতে ঝুলছে কালিঝুলি মাখা এক টিমটিমে হ্যারিকেন। তারই ঝাপসা আলোয় আসর জমিয়ে বসেছেন গ্রামেরই কয়েকজন যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ। নিজেদের মধ্যে সবে পারিবারিক গল্প-সল্প শুরু হয়েছে, এমন সময় অধিক শৈত্যের কারণে আপাদ-মস্তক চাদরে ঢাকা একব্যক্তি আটচালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আগন্তুক কয়েকবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। আর তারপর উনি আসরের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখুন, আমি একজন ভিন গাঁয়ের লোক। তবুও লোকমুখে আপনাদের ব্রজপুরের এই সান্ধ্য-গল্পের আসরের কথা আমি অনেক শুনেছি

আর আপনাদের এই আসরে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছাও আমার অনেক দিনের। তো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি। তা আপনারা আমাকে এই আসরে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দেবেন কী?

আগন্তুকের কথা শুনে আসরের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য রামলোচন খুড়ো বললেন, আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই আসরের দরজা সকলের জন্যই খোলা। তোমাকে অনুমতি দেওয়া হল। তুমি অনায়াসে ভেতরে প্রবেশ করতে পার।

গ্রাম বাংলার আটচালায় নেই কোন দরজার বালাই। সুতরাং ভিন গাঁয়ের আগন্তুককে খোলা দরজার খোঁজ করতে হল না। উনি সোজা উঠে এসে আসরের পাশে দাঁড়ালেন।

আসরের সদস্যগণ কম্বলে সারা শরীর ঢেকে, কয়েকখানি ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর বসেছিলেন। রামলোচন খুড়ো সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ওই আগন্তুককে বললেন, ফরাশ পাতা রয়েছে, উপবেশন কর, ভায়া।

আগন্তুক ওই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর উপবেশন করলেন।

তখন আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে খুড়ো বললেন, তুমি ভিন গাঁয়ের লোক। আমাদের এই গল্পের আসরে অংশগ্রহণ করতে এসেছ, এটা আনন্দের কথা।

তবে শোন ভায়া। আমাদের এই সান্ধ্যগল্পের আসরের কিছু নিয়ম-কানুন আছে। এবং সেগুলো আমরা সকলেই মেনে চলি। তুমি এই আসরে নতুন এসেছ। কিন্তু তবুও তোমার ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য হবে।

তো আসরের নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, এই আসরে কোন নবাগত এলে প্রথমদিন তাকেই গল্প শোনাতে হয়। নবাগতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের কারণেই এই নিয়ম। তুমি নবাগত। সুতরাং, আজ তুমি গল্প শোনাবে, আর আমরা শুনব।

দ্বিতীয়তঃ, এই আসরের সকলেই আমরা চৌপর দিন সংসার নামক যোয়ালে বাঁধা থাকি। আর এই সন্ধ্যেয় ছাড়া পেয়ে, আমরা একত্রিত হয়ে সহজ-সরল ভাষায় কিছু খোশ-মেজাজী গল্প-সল্প করে থাকি। অর্থাৎ এই সান্ধ্যগল্পের আসরে সচরাচর সেইসব তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত গল্পই পরিবেশিত হয়ে থাকে যা শুনে কোনো সদস্যের মাথা ভারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। বা, সেইসব গল্প এমন কিছু তথ্য ভারাক্রান্তও হয় না, যার ভারে কোন সদস্যের মাথা ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

তৃতীয়তঃ এই সান্ধ্যগল্পের আসরে বসে আমরা সত্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। কিন্তু তত্রাচ অসত্য সদা পরিত্যাজ্য বলে আমরা মনে করি না।

আবার, বাস্তব অভিপ্রেত হলেও এই গল্পের আসরে অবাস্তব সদা অনভিপ্রেত নয়।

এতদ্ব্যতীত গল্পের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণে লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা শ্রবণে আমরা অধিক আগ্রহান্বিত।

আবার এই আসরে বসে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই ঘটনার যথার্থ কাল নির্ণয় করতে যাওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা মিথ্যা কালক্ষয় বলেই বিবেচনা করে থাকি।

এছাড়া কোন ভৌগোলিক স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে যে যথেষ্ট গোলের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, একথা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি। এবং সেই কারণেই ওইরূপ কর্ম হতে আমরা সদা বিরত থাকি।

এতদ্ব্যতীত গল্পে ব্যবহৃত বিষয়গুলি সত্য না অসত্য, পার্থিব না অপার্থিব, লৌকিক না অলৌকিক, মন্দ না ভাল ইত্যাদি ব্যাপারগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গেলে শেষে গোটা গল্পটাই যে মাঠে মারা যাবে, সে কথাটা আমরা সদা স্মরণে রাখি।

আর সেই কারণেই তোমাকে আমরা পূর্বেই অবহিত করতে চাই যে এই সান্ধ্য-গল্পের আসরে বসে আমরা সত্য বুঝি না, অসত্য বুঝি না। বাস্তব বুঝি না, অবাস্তব বুঝি না। ইতিহাস বুঝি না, ভূগোল বুঝি না। পার্থিব বুঝি না, অপার্থিব বুঝি না। লৌকিক বুঝি না, অলৌকিক বুঝি না। মন্দ বুঝি না, ভাল বুঝি না। কিন্তু আমরা মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার সঙ্গে এইসব বিষয়ের মিশেলে তৈরি মেজাজ প্রীতিকর এবং প্রাণবন্তকর গল্পের স্বাদ বুঝি। এবং ওইসব স্বাদের গল্প শুনতে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি। কারণ ওইসব স্বাদের গল্প শুনে আমাদের মন প্রীত এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আর তাই আজ রাতে আমরা তোমার কাছ থেকেও ওই ধরনেরই গল্প আশা করছি।

খুড়োর কথা শুনে আগন্তুক খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। এবং তিনি মনে মনে ভেবে দেখলেন যে লোকমুখে তিনি যাই শুনে থাকুন না কেন, এই আসরটা আসলে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা গল্পের আসর। আর তাই এই আসরে পরিবেশিত গল্পগুলোকেও হতে হবে খাঁটি জগাখিচুড়ির মতো। মানে, চাল ডাল লবণ মরিচ হলদী ও বহুবিধ শাকসবজির মিশ্রণে রান্না করা খাঁটি জগাখিচুড়ি।

বা বলা যায়, গল্পগুলোকে হতে হবে নানা রকমের ভাজা এবং নানা রকমের মশলা ও মরিচের মিশেলে তৈরী কৌটো-ঝাঁকানো বাইশ ভাজার মতো।

অথবা, এও বলা যায় যে, গল্পগুলোকে হতে হবে সত্য, অসত্য, মন্দ, ভাল, বাস্তব-অবাস্তব, পার্থিব-অপার্থিব, লৌকিক-অলৌকিক এবং ইতিহাস ও ভূগোল-গোলা রসে জারিত এক আজব পদার্থের মতো।

তো এসব কথা চিন্তা করে আগন্তুক বুঝতে পারলেন যে এঁদের ফরমাশ অনুযায়ী গল্প-বলা এক দুরূহ ব্যাপার। আর তাই তিনি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, দেখুন, একজন গুণীজনের পক্ষে আপনাদের ফরমাশ অনুযায়ী গল্প শোনানো নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, আমি কোন গুণীজন নই। আমার তেমন কোন গুণও নেই। আমি নেহাৎই একজন সাধারণ মানুষ।

একটু থেমে আগন্তুক আবার বললেন, লোকে বলে, যে দরজী খদ্দেরের পছন্দসই

নিখুঁত পোষাক পরিচ্ছদ বানিয়ে দিতে পারেন, তিনি একজন গুণী সূচীশিল্পী। মন-পছন্দ স্বর্ণালঙ্কার গড়িয়ে দিয়ে যে স্বর্ণকার নারীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনি একজন গুণী স্বর্ণশিল্পী। যে ঘটক কর্তা-গিন্নীর পছন্দমাফিক রাজযোটক পাত্র-পাত্রীর মিলন ঘটিয়ে উভয়পক্ষের আনন্দবর্ধন করেন, তিনি একজন করিতকর্মা লোক। আর যে কাহিনীকার তাঁর কল্পিত কাহিনীর চরিত্রগুলোকে জীয়নকাঠিরূপ কলম স্পর্শে জীবন্ত করে তুলতে পারেন, তাঁর কল্পিত কাহিনীতে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠক-পাঠিকার অনুভূতিতে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারেন, তিনি একজন সার্থক স্রষ্টা। তিনি একজন বড়মাপের গুণীজন। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমার তেমন কোন গুণই নেই। আমি নেহাৎই একজন সাধারণ মানুষ।

আগন্তুকের কথা শুনে রামলোচন খুড়ো বললেন, তা ভায়া, তুমি যেমন বলছ তেমন গুণীজনের অভাব এ আসরেও প্রকট। সে কারণে তোমার কুণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার ভাঁড়ারে যা সঞ্চিত আছে, এই আসরে তুমি তাই পরিবেশন কর। আমরা তাতেই তৃপ্তিলাভ করব। নাও, এখন শুরু কর।

আসরের অন্যান্য সদস্যরাও একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি শুরু করুন।

তখন আগন্তুক বললেন, আসলে গুণীজন হওয়া তো আর মুখের কথা নয়। অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

এই দেখুন না, আমার বাবা মা চেয়েছিলেন আমি যেন একজন গুণীজন হয়ে উঠি। এবং তার জন্য তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, যথাযথ ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি গুণীজন হতে পারিনি। কারণ আমার না ছিল প্রতিভা, না ছিল নিষ্ঠা। আমার প্রতিভা ছিল না। আমার অধ্যবসায়ের অভাব ছিল। আমি একনিষ্ঠ ছিলাম না। লেখাপড়ায় আমার মন বসত না। কাজে-কামেও ছিল অনিহা। আমি ছিলাম চঞ্চল মতি।

ছেলেবেলায় লেখাপড়া না-করার জন্য আমি বাপ-মায়ের কাছে বকুনি শুনেছি। তাঁদের হাতে আমি চড়-চাপড় খেয়েছি, অনেক লাঞ্ছনা ও সহ্য করেছি। কিন্তু তবুও আমার সুমতি হয়নি ফলে ইস্কুলের গন্ডিপার হতেই আমার বিশ বছর বয়স হয়ে গেল।

তখন বাবা বললেন, ঢের হয়েছে। আর বিদ্যের প্রয়োজন নেই। এবার আমার সঙ্গে খেত-খামারের কাজে লেগে পড়। সংসারের কিছু উপকার হোক। এবং বাবার কথায় সায় দিয়ে মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। অধিক বিদ্যের প্রয়োজন কী। তার চেয়ে তোর বাবার সঙ্গে কাজে-কামে লেগে যা। আর বছর খানেকের মধ্যেই তোর বিয়ে দিয়ে আমি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে আসি। তোদের সেই ছোটবেলায় আমি আমার সইকে কথা দিয়ে রেখেছি, তোর সঙ্গে অমৃতালক্ষ্মীর বিয়ে দেব।

আমি বললাম, আচ্ছা সে পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে নূরপুরে যেয়ে রতন কাকাকে আমার পাশের খবরটা দিয়ে আসি। অনেকদিন হল ওদিকে যাওয়া হয়নি।

কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে মা বললেন, অমৃতালক্ষ্মীকে আমার বড় পছন্দ। মেয়েটি এখন বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। তোর আগেই ও একটা পাশও দিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ও তোকে বেশ ভক্তি-ছেদ্দা করে, ভালওবাসে। তুই আর না করিস নি, বাবা।

তা অমৃতালক্ষ্মী আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে কিনা, তখন অবিশ্যি আমি তা বুঝতে পারিনি। তবে ওর ভালবাসার ব্যাপারটা আমি টের পেয়েছিলাম। ওর সেই চোদ্দ বছর বয়সেই আমি তা টের পেয়েছিলাম।

তবে একটা কথা বলে রাখি যে পরবর্তীকালে ওর ওই ব্যাপারটাকে আমার কাছে নেহাৎই এক ধরনের জেল্যাসি বলে মনে হয়েছিল, এবং আমার মনে হয়েছিল, কি জানি, প্রেমে হয় তো বা অমনটাই হয়!

অমৃতা নামটি ওর মায়ের দেওয়া আর লক্ষ্মী ওর ঠাকুমার। ছোট্ট গ্রাম হুতোমপুরে আমাদের বাস। গ্রামের একপ্রান্তে আমাদের বাড়ি, অন্যপ্রান্তে ওদের। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী। গ্রামবাসীরা বলে, খেয়ালী। বর্ষায় সে দু'কূল ছাপিয়ে ভীমগতিতে ছুটে চলে। আর অন্য সময়ে কিশোরী কন্যার মতোই তার অকারণে খিল খিল হাসি। আম জাম বাঁশঝাড়ে ঘেরা ছায়া শীতল গ্রাম আমাদের হুতোমপুর তো সেই পরিবেশেই আমি এবং অমৃতালক্ষ্মী ছোট থেকে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছি

একসঙ্গে আমরা দু'জন মাঠে-ঘাটে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। নানা রংয়ের প্রজাপতি ধরেছি। লাল ফড়িং ধরে তাদের কচিদূর্বার নরম অংশ খাইয়েছি। খেলার শেষে আবার তাদের উড়িয়ে দিয়েছি। খেয়ালীর জলে আমরা দু'জন একই সঙ্গে স্নান করেছি। সাঁতার কেটেছি। গামছায় ছোট মাছ ধরেছি। আম জাম কুল পেয়ারা যখন যা জোগাড় করতে পেরেছি, দু'জনে ভাগ করে খেয়েছি। অসমান ভাগের জন্য দু'জনে ঝগড়া করেছি, আড়ি করে দিয়েছি। কিন্তু বেশীক্ষণ আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারিনি। আবার দু'জন দু'জনের কাছে এসেছি আবার দু'জনে ভাব করেছি। এমনি ভাবেই আমরা দু'জন বেড়ে উঠেছি।

যাহোক, সেই ব্যাপারটা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স পনের পেরিয়ে গেছে আর অমৃতার চোদ্দ। কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী অমৃতাকে ওর বয়সের চেয়ে কিছু বড়ই দেখাত আর গ্রামের বালিকা বধূদের সঙ্গে অধিক মেলামেশার ফলে কিছু কিছু বিষয়ে ও ছিল বড়ই প্রগলভ।

দিনটি ছিল বোশেখের প্রথম দিকের এক ঝিম-ধরা, জ্বালা-ধরা দুপুর আমরা দু'জন গাছতলায় বসেছিলাম। বসে বসে সদ্য-ভাঙা কাঁচামিঠে আম চরকের মেলায় কেনা ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে, ফালি ফালি করে কেটে, অল্প নুন মাখিয়ে দু'জনে কচ কচ করে চিবিয়ে খাচ্ছিলাম। চারদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু অনতিদূরের ঘন আম্রশাখে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানরত এক বউ কথাকও পাখির একঘেয়ে অনুনয়, 'বউ কথা কও, বউ কথা কও'। কিন্তু কে জানে, ঠিক কত দূরে,

কোন শাখে, কোন বা পত্রাড়ালে লুকিয়ে ছিল ওর সাত পাকে বাঁধা নিঠুর হৃদয়া বউ। দয়িতের শত অনুনয়েও যে সাড়া দিল না একটিবার, ছুটে এল না তার কাছে।

তো ঠিক এমনি সময়ে সেই ব্যাপারটা ঘটল। হঠাৎ অমৃতা আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, দীপু দাদা, আমায় তুমি ভালবাস তো?

আমি নুন-মাখা আম চিবোতে চিবোতেই হাল্কা ভাবে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ভালবাসি। খুব ভালবাসি।

খুব ভালবাসি বললে তো হবে না। ঠিক কতখানি ভালবাস, তা বল।

এই এত্তোখানি! দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে আমি ওকে আমার ভালবাসার পরিমাণ বোঝাতে চাইলাম।

দূর! ওভাবে কী কেউ ভালবাসার পরিমাণ বোঝায় নাকি?

তবে? তবে কেমন ভাবে বোঝাব আমার ভালবাসার পরিমাণ, তা তুই-ই বলে দে।

সেটা তোমার ব্যাপার। তুমিই ঠিক কর, কেমন ভাবে বোঝাবে।

আমি বেশি কিছু না ভেবে চট করে বললাম, আচ্ছা বেশ। মা সদ্য তৈরি আমের আচার রোদে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ওখান থেকে খানিকটা আচার চুরি করে নিয়ে আসি। তারপর তোকে বেশিটা দিয়ে আমি নেব কমটা! ব্যস্, আমার ভালবাসার পরিমাণটা প্রমাণ হয়ে যাবে!

কিন্তু আমার ওই বোকা-বোকা কথা শুনে অমৃতা খিল খিল করে হেসে উঠল, এবং হাসতেই থাকল। তারপর হাসি থামিয়ে ও আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তুমি, লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট, দেবদাস-পার্বতী—এদের ভালবাসার কথা শুনেছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি। তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিলাম আমি।

এদের ভালবাসার কথা জানতে বই-পত্তর কিছু পড়েছ?

না। পড়াশুনা করতে আমার ভাল লাগে না। তবে দেবদাস বইটা পড়েছিলাম একবার। কিন্তু দেবদাসকে আমার ভাল লাগেনি। লোকটা যেন কেমন! একবার ও মেরে পার্বতীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।

আমার কথা শুনে অমৃতা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, দেবদাস রাগের মাথায় পার্বতীকে ছিপ দিয়ে মেরেছিল। তাতে ওর কপালটা একটু কেটে গিয়েছিল। দেবদাস ওর মাথা ফাটিয়ে দেয়নি, বুঝেছ?

দেবদাস পার্বতীকে ছিপ দিয়ে মেরেছিল। কারণ সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল যে পার্বতীর বড় রূপের দেমাক। তাই দেবদাস ওর কপালে একটা কালো দাগ এঁকে দিতে চেয়েছিল। তাই মেরেছিল। কিন্তু তাতে রূপসী পারুর রূপ এতটুকু কমে যায় নি। বরং উত্তরকালে ওই কাটা দাগে হাত বুলিয়ে পারু ওর দেবদার স্পর্শ অনুভব করত। ভালবাসায় অমনটা হয়।

যেহেতু অমৃতা বলেছিল, ভালবাসায় অমনটা হয়, আমি তখন মেনে নিয়েছিলাম, হ্যাঁ, ভালবাসায় অমনটা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম যে ভালবাসায় যে কী হয়, আর কী হয় না, সেই বেত্তান্ত আসলে কেউ জানে না, কেউ না।

যা হোক, অমৃতার অমন পাকা পাকা কথা শুনে আমি অবাক হলাম। আমার মনে হল, কোন এক মন্ত্রবলে অমৃতা যেন রাতারাতি অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক কিছু জেনে গেছে। অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতকথা তুই কী করে জানলি রে, অমৃতা?

পড়াশুনো করে। আলাপ-আলোচনা করে। উত্তর দিল অমৃতা।

একটু থেমে অমৃতা আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এত ঘনঘন তুমি মালো- পাড়ায় যাও কেন? ব্যাপারটা কী?

ঘনঘন আবার কোথায়? মাঝে মাঝে যাই। মাছ ধরার ব্যাপারে আলোচনা করতে যাই।

চাঁদনী রাতে নৌকো করে মাছ ধরার যে কী আনন্দ সে তুই বুঝবি নে। চাঁদের আলোয় জালে উঠে আসা রুপোলী মাছগুলো যখন নৌকোর পাটাতনের 'পরে লাফালাফি করতে থাকে, দাপাদাপি করতে থাকে, রুপোলী ছটা ছড়াতে থাকে, তখন যে কা আনন্দ হয়, সে তুই বুঝবি নে।

আমার কথা শুনে অমৃতা বলল, আমার বোঝার দরকারও নেই। তুমিও ওসব না বুঝলে আমি বাঁচতাম। মাঝে মাঝে আমার ভাবনা হয়।

ভাবনা! কিসের ভাবনা?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমৃতা বলল, শুনেছি মালোপাড়ার মেয়েগুলো বড্ড গায়ে পড়া। তারপর ও আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ও পাড়ার কোন মেয়েকে তুমি ভালবাস না তো?

দূর! আমি শুধু তোকে ভালবাসি। আর কাউকে নয়।

সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস তো?

হ্যাঁ, সত্যি।

তাহলে তিন সত্যি কর।

আমি বললাম, সত্যি, সত্যি, সত্যি।

এবার তাহলে আমার কাছে এসো। তোমার কানে কানে আমি একটা কথা বলব। সেটা তোমায় করতে হবে। ভালবাসার প্রমাণ দিতে হবে।

কি কথা? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সেটা শুধু একটা কথা নয়। সেটা একটা সম্মতি। সেটা একটা অঙ্গীকার। দু'টি হৃদয় এক হওয়ার পারস্পরিক সম্মতি! পারস্পরিক অঙ্গীকার।

তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

তোমার বোঝার দরকার নেই। তুমি তো শুধু আমায় ভালবাস। আর কাউকে নয়, তাই না? তাহলে আমার কাছে এসো। আমি যা বলি তা কর।

অমৃতার কথা মতো আমি ওর কাছে যেয়ে বসলাম। ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মুখ নীচু করে বসে রইল। ওর ব্যাপারটা আমি ঠিক আঁচ করতে পারলাম না। ভাবলাম, কি সেই কথা, কিসের সেই সম্মতি, কিসেরই বা সেই অঙ্গীকার যা ওকে এমন করে ভাসিয়ে তুলল! যার জন্য ওর এত চিন্তা! ব্যাপারটা কী?

তো একটু পরে অমৃতা মুখ তুলল। চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিল। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, নাও, আমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে একটা চুমু খাও। বেশ আদর করে। তাহলেই বুঝব আমায় তুমি সত্যিই ভালবাস।

অমন সময়ে, অমন খোলামেলা আমবাগানে আচমকা অমৃতার মুখ থেকে অমন একটা কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। আমার কান গরম হয়ে উঠল। ঝটিতে আমি ওর কাছ থেকে সরে এলাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তারপর ওর মুখের পানে চেয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম, 'অসভ্য'।

আমার ওই ছোট্ট 'অসভ্য' কথাটি শুনে মুহূর্তের তরে অমৃতার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর অমৃতাও ঝটিতে উঠে দাঁড়াল। ওর পরনের অগোছালো শাড়িখানাকে ও ঠিকঠাক করে নিল। আর তারপর ও ধরাগলায় বলল, বেশ, আমি অসভ্য। তবে আজ থেকে কোন সভ্য ছেলে যেন এই অসভ্য মেয়ের সঙ্গে কথা না বলে। বা, সে যেন এই অসভ্য মেয়ের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা না করে। কথা ক'টি বলে প্রায় ছুটেই ও আমার কাছ থেকে চলে গেল।

এই ঘটনার পর তিন দিন কেটে গেল। কিন্তু অমৃতা আমার সঙ্গে আর দেখা করল না। ফলে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল।

রোজ দুপুরেই আমি আম বাগানে যাই। দু'একটা কাঁচামিঠে আম গাছ থেকে পাড়ি। খোসা ছাড়িয়ে ফালি ফালি করে কাটি আর তারপর নুন মাখিয়ে কচ্ কচ্ করে চিবোতে থাকি। কিন্তু ভাল লাগে না। অমন মুখরোচক জিনিষ কী আর একা একা খেতে ভাল লাগে! সেই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে অন্য কিছু নয়, আমার মনের আয়নায় বার বার শুধু অমৃতার মুখখানাই ভেসে উঠতে লাগল। ওরজন্য মনটা আমার সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। বোশেখের ওই জ্বালা ধরা দুপুরের মতো আমার মনেও কেমন যেন জ্বালা ধরে গেল। বুঝিবা সে জ্বালা বিরহ জ্বালাই হবে!

চতুর্থ দিন দুপুরে আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। হাতের নুন-মাখা আমগুলো আমি ছুড়ে ফেলে দিলাম। আর তারপর এক দৌড়ে যেয়ে হাজির হলাম খেয়ালীর উঁচু পাড়ে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম সেথায়। চেয়ে দেখলাম,

আশপাশের স্নানের ঘাটগুলো সব সুনসান। জনপ্রাণীর কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। শুধু দূরে, বহু দূরে একখানা মাছধরা নৌকোর ওপর কয়েকজন জেলে তোলা উনুনে, কাঠের জ্বালে ভাত রান্না করছে। আর কালক্ষয় করলাম না আমি। সেই উঁচু পাড় থেকে ঝাঁপ দিলাম আমি খেয়ালীর জলে। তারপর সাঁতার কেটে এগিয়ে গেলাম আমি অমৃতাদের বাড়ির দিকে।

আমি ভিজে কাপড়েই ঢুকে পড়লাম অমৃতাদের বাড়ির মধ্যে। জ্বালা ধরা স্তব্ধ দুপুর। সবাই ভাতঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু অমৃতার ঠাকুমা তখন সুর করে রামায়ণ পাঠ করছিলেন।

পরপর দু'খানা বড় শোবার ঘরের পাশেই একখানা ছোট একচালা ঘর। আর তার পাশেই রয়েছে ওদের ঢেঁকিশাল। ঢেঁকিশালের পাশেই রয়েছে এক বিরাট লিচু গাছ। লিচু গাছের ডালপালা ঢেঁকিশাল আর একচালা ঘরখানাকে ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বোশেখের দাবদাহের প্রবেশ নিষেধ সেথায়।

একচালা ঘরখানাতে ঢুকে পড়লাম আমি। দেখলাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে নিকানো মেঝেয় একখানা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে অমৃতা। ঘুমিয়ে রয়েছে অমৃতা। ওর ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ ফাঁক, পরনের শাড়ি এলোমেলো। চুপি সারে ওর পাশে যেয়ে বসলাম আমি। চেয়ে রইলাম ওর ঘুমন্ত মুখের পানে। আধো আলো, আধো ছায়ায় একচালা ঘরের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিল এক অপূর্ব স্বপ্নালু পরিবেশ। আর সেই স্বপ্নালু পরিবেশে অমৃতার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করলাম নানা রূপের একত্র সমাবেশ। আমার মনে হল, এ অমৃতা সে অমৃতা নয়। আমার আশৈশবের সাথী সেই অমৃতা নয়। এ এক অন্য অমৃতা। এ অমৃতা বড়ই কোমল, বড়ই সরল, বড়ই আকর্ষণীয়া। শারীরিক দিক থেকে এ অমৃতা আর কিশোরী নয়, যুবতী।

পরিবেশ আমায় মোহাচ্ছন্ন করল। অমৃতার শিথিল বেশ আমায় প্রলুব্ধ করল। বোশেখের দাহ আমায় অস্থির করে তুলল। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, এই নির্জন স্বপ্নালু পরিবেশে এই মুহূর্তেই তো আমি ওর মনস্কামনা পূর্ণ করে দিতে পারি। আমি ওর ইচ্ছাপূরণ করে দিতে পারি। এতে তো দোষের কিছু নেই। একজন পুরুষ যদি একজন নারীর মনোবাঞ্ছাই পূরণ করতে না পারল তবে সে কিসের পুরুষ মানুষ! সেই মুহূর্তে নিজেকে আমি একজন জবর দস্ত পুরুষ মানুষ বলেই ভাবলাম। এবং অমৃতাকে এক পরিপূর্ণা নারী।

আমি ঘুমন্ত অমৃতার আরও একটু কাছে সরে গেলাম। বুকের মধ্যে আমার ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। স্থির করে ফেললাম, যাই কিছু ঘটুক না কেন, আজ আমি ওর ইচ্ছাপূরণ করবই করব।

আরও একটু সরে গেলাম আমি। তারপর মুখখানাকে আমি ওর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। আর তারপরই আমি আমার ঈষৎ ফাঁক ঠোঁট দু'খানাকে ওর ঠোঁটের

'পরে আলতো করে চেপে ধরতে গেলাম। আর তখনই, ঠিক তখনই অমৃতার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই ও চকিতে উঠে বসল। পরনের এলোমেলো শাড়িখানাকে ও ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ঘুম জড়ানো গলায় ও আমায় জিজ্ঞাসা করল, কখন এলে? আমায় ডাকোনি কেন? তোমার পরনের কাপড় এমন ভিজে কেন?

অমৃতার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলাম না আমি। মুখ নীচু করে বসে রইলাম। বসে বসে নিজের বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ শুনতে লাগলাম।

অমৃতা আবার আমায় জিজ্ঞাসা করল, কথা কইছ না কেন? কী হয়েছে তোমার?

আমি নিশ্চুপ। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে আমার সময় লাগল।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আমি অমৃতার পানে চাইলাম। বললাম, সেদিনের কথায় খুব রাগ করেছিস তুই, তাই না? আমার ঘাট হয়েছে রে, অমৃতা। ওরদিকে হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, আয়, আমার কাছে আয়। আজ আমি তোর সব ইচ্ছাপূরণ করে দেব।

আমার কথা শুনে অমৃতা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

ওর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আবার আমি ডাকলাম ওকে। বললাম, আয়, আমার কাছে আয়।

অমৃতা কিন্তু আমার কাছে এল না। কিন্তু তবুও ওর হাস্যরঞ্জিত মুখে আমি প্রত্যক্ষ করলাম ওর সব-পাওয়ার আনন্দ। মিটিমিটি হাসতে হাসতেই ও অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'অসভ্য'। আর তার পরেই ও খিল খিল করে হেসে উঠল।

রামায়ণ পাঠ থামিয়ে পাশের ঘর থেকে ওর ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, অ্যাই লক্ষ্মী, অত হাসছিস কেন করে?

লক্ষ্মী উত্তর দিল, এমনিই।

লক্ষ্মীর ঠাকুমা বললেন, ওমা! এমনি এমনি আবার কেউ হাসে নাকি?

লক্ষ্মী বলল, হ্যাঁ, হাসে।

ওর ঠাকুমা আবার ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর ঘরে কে রয়েছে রে?

লক্ষ্মী গলা নামিয়ে উত্তর দিল, তোমার নাত জামাই।

কী বললি? জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি নে।

লক্ষ্মী গলা চড়িয়ে বলতে গেল, তোমার নাত—।

আমি হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম। লক্ষ্মী আমার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

পাশের ঘর থেকে ওর ঠাকুমা বললেন, বুঝেছি!

লক্ষ্মী ওর ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করল, কী বুঝেছ, শুনি?

ঠাকুমা বললেন, দীপক এসেছে।

কী করে বুঝলে? জিজ্ঞাসা করল লক্ষ্মী।

তোর হাসি দেখে। এ কদিন তো মুখ গোমড়া করে বসে ছিলি।

লক্ষ্মী প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল। ওর ঠাকুমাকে ও জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ঠাকুমা বল তো, তোমার সীতাদেবী অমন ঝুড়ি ঝুড়ি সোনাদানা, মণিমুক্তো নিয়ে বনে গেছলেন কেন?

ওমা! ঝুড়িঝুড়ি সোনাদানা, মণিমুক্তো নিয়ে সীতাদেবী বনে গেছলেন, একথা তোকে কে বললে?

একটু আগে তুমিই পাঠ করছিলে, ভাই!

আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার সে ঝারা।
হিমালয় হৈতে যেন বহে গঙ্গা ধারা॥

ও, এই কথা? তা উনি ছিলেন রাজকন্যে, আবার রাজবধুও। সোনাদানা, মণি মুক্তোর তো আর অভাব ছিল না ওঁর। তাই—।

বাধা দিয়ে লক্ষ্মী বলল, তা নয় গো, তা নয়! আসলে রাজবধুই হোক আর সাধারণ বধুই হোক, কোন বধুই সোনা দানা ছেড়ে যায় না কোথাও, বুঝলে? কোথাও যাওয়ার আগে যার যা আছে তার থেকে কিছু নিজ অঙ্গে পরে নেয়। আর বাকীটা বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নেয়। সোনাদানার ব্যাপারে সব বধুই সমান!

বাব্বা! এত কথা তোকে কে শেখালে কে, লক্ষ্মী? জিজ্ঞাসা করলেন ওর ঠাকুমা।

বুলুদিদি বলেছে। উত্তর দিল লক্ষ্মী।

একটু থেমে লক্ষ্মী ওর ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করল, একটা সুখবর আছে, শুনবে?

বল, শুনি। নির্লিপ্ত গলায় বললেন ওর ঠাকুমা।

বুলুদিদি পোয়াতী। তাই ওর বর ওকে গতকাল ওর বাপের বাড়িতে রেখে গেছে।

আঃ! মাগীর মুখে দেখি কোন আগল নেই! চুপ কর! চুপ কর! ধমক দিলেন ওর ঠাকুমা।

ঠাকুমার ধমক খেয়ে লক্ষ্মী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, চলিরে, লক্ষ্মী।

কাল আসছ তো? জিজ্ঞাসা করল লক্ষ্মী।

না। কাল ভোরে উঠেই নুরপুরে রওনা হব। রতনকাকার ওখানে ক'দিন কাটিয়ে আসব। বাড়িতে বড় অশান্তি হচ্ছে। বাবা খুব রেগে আছেন।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মী ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল, তা অশান্তি যাতে না হয় তেমনভাবে চললেই তো পার। বলি, লেখাপড়া করতে কী তোমার গায়ে জ্বর আসে? কাজ-কাম করলে কী তোমার হাতে ফোস্কা পড়ে? অদ্ভুত ছেলে বটে তুমি!

লক্ষ্মীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, চলি।

আমার কথায় রাগ করলে? জিজ্ঞাসা করল লক্ষ্মী।

না, রাগ করিনি।

লক্ষ্মী বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বেশ তো, কর।

লক্ষ্মী বলল, সময়ে অসময়ে তুমি খেয়ালীর জলে ঝাঁপ দাও, তার স্বচ্ছ জ তুমি সাঁতার কাট। তাতে তোমার আনন্দ। খোলা মাঠে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে তু হাডুডু খেল, ফুটবল খেল। তাতে তোমার আনন্দ। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তু দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে ছুটে বেড়াও। তাতেও তোমার আনন্দ। আচ্ছা, সত্যি করে বলতে তোমার ওইসব অখণ্ড আনন্দের কালে কখনো কী এক মুহূর্তের জন্যও আমার ক তোমার মনে পড়ে না?

শুধু তোর কথা কেন, ও সময়ে আমার কারো কথাই মনে পড়ে না রে! আ শুধু ও সময়ে কেন, প্রায় কোন সময়েই আমি পেছনের কথা, পেছনের ভাবনা তেম করে ভাবতে পারিনে রে, লক্ষ্মী!

আমার কথা শুনে লক্ষ্মী মলিন মুখে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। কিছুক্ষ চুপচাপ কাটল। তারপর বললাম, চলি রে, লক্ষ্মী।

ওদের একচালা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। লক্ষ্মী ও আমার পেছনে পেছ এল। বাইরে এসে বলল, নাইবা গেলে কাল নূরপুরে। একা একা আমার ভাল লা না। আমার সময় কাটে না। এসব কী তুমি বোঝ না? বাড়িতে একটু মানিয়ে চললে তো পার। বারবার কেন আমাকে এমন একা ফেলে রেখে তুমি দূরে সরে যাও

লক্ষ্মীর কথার কোন উত্তর দিলাম না আমি। শুধু ওর মুখের পানে চেয়ে আবা বললাম, চলি।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমি রাস্তায় নামলাম। কিছুদূর যেয়ে পেছ ফিরে তাকালাম। দেখলাম, লক্ষ্মী উদাস নয়নে আমার চলার পথের দিকে চে রয়েছে। ওর মুখখানা বড় মলিন। আমি আর দেরী না করে হন হন করে এগি গেলাম।

আগন্তুক চুপ করতেই খুড়ো বললেন, তোমার কিশোরী নায়িকাটি একটি বি মেয়ে, ভায়া।

আসরের পেছন থেকে সর্বজ্ঞ মশাই গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, পল্লীর বালি বধূদের সহিত উক্ত কিশোরী কন্যার অধিক সংসর্গই ওর এবংবিধ আচরণের হে বলিয়া আমরা অনুমান করতে পারি।

সর্বজ্ঞ মশাইয়ের মন্তব্য শুনে গণেশ কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করে বলল, হে তা আপনি আপনার গুরুচন্ডালী দোষে দূষিত বাক্য সকল পরিহার করিতে সচেষ্ট হউ কারণ, ওই দূষিত বাক্য সকল মনুষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ভূকম্পনের ন্য কম্পন সৃষ্টি করিতে থাকে।

খুড়ো গণেশের দিকে চেয়ে বললেন, এখন থাক ওসব ঝগড়া। তারপর তিনি আগন্তুক বললেন, তুমি এগিয়ে চলো, ভায়া। শীতের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতঃপর আগন্তুক শুরু করলেন। তো পরদিন ভোর হতেই ঘরে ভাজা টাটকা মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে নূরপুরের পথ ধরেছিলাম আমি। রওনা হওয়ার আগে মাকে প্রণাম করে শুধু এইটুকু বলে এসেছিলেন, ফিরতে ক'দিন দেরী হবে আমার।

আমার কথা শুনে মা বলেছিলেন, একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস, বাবা। একবার বেরোলে তো আর ঘরের কথা মনে থাকে না তোর। ব্যস্, ওইটুকুই। আসলে বাড়িতে আমার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ততদিনে মায়ের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

হুতোমপুর থেকে নূরপুর চার মাইল পথ। আমার বহু পরিচিত পথ। ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে ও পথে গরুর গাড়িতে গিয়েছি। একটু বড় হলে আমি একাই হেঁটে পাড়ি জমিয়েছি ওই পথ। সেদিনও হেঁটেই চলেছিলাম নূরপুরে, রতন কাকার বাড়িতে।

আমার কাছে রতনকাকার বাড়ির বড় আকর্ষণই ছিল ওঁর দু'টি তেজী ঘোড়া। বাদশা আর তুফান। আমাদের বাড়ির ঘোড়া দুটির চেয়েও ও দুটি ছিল আরো সতেজ, আরো ঝকমকে।

তুফান ছিল আমার প্রিয় ঘোড়া। তুফানের পিঠে সওয়ার হয়ে যখন আমি উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে বেড়াতাম, তখন আমি আমার অতীত ভুলে যেতাম, ভবিষ্যতের চিন্তাও আমার মাথায় আসত না। শুধুমাত্র ছুটে চলার আনন্দেই তখন আমি বিভোর হয়ে থাকতাম।

রতন কাকাই আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন, ছুটে চলার গতি বাড়াতে শিখিয়েছিলেন। শিকার করাও শিখিয়েছিলেন উনিই।

আসলে রতন কাকা ছিলেন একজন নামকরা শিকারী। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি, যখন কোথাও কোন বাঘের উপদ্রব দেখা দিত, গৃহস্থের গরু ছাগল তুলে নিয়ে যেত বাঘে, অথবা মানুষের প্রান নাশ করত কোন বাঘ, কাকার কাছে খবর আসত। কাকা তখন সব কাজ ফেলে রেখে ছুটতেন সেই ঘাতক-বাঘ মারতে। শিকারীর পোষাক পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কাকা যখন বাঘ মারতে ছুটতেন, মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠত। আমার বড় ইচ্ছে হত কাকার মতো বড় শিকারী হওয়ার।

এক সময় আমার বাবাকেও দেখেছি কাকার সঙ্গে শিকারে যেতে। কিন্তু বাবা পরে শিকার-করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

টাকা পয়সা, সোনা-দানা, জমিজমা, কোন কিছুরই অভাব ছিল না রতন-কাকার। অভাব ছিল শুধু একটিই। কাকার কোন সন্তান ছিল না। সাহানা কাকীমা খুব কাঁদতেন। ভগবানের কাছে ওঁর একটিই প্রার্থনা ছিল। একটি সন্তান। শুধু একটি সন্তান।

সম্ভবতঃ কাকার কোন সন্তান-সন্ততি না-থাকার জন্যই উনি ওনার বিষয়-আশয়ের দিকে তেমন নজর দিতেন না। ওনার বিষয়-আশয় যিনি দেখাশোনা করতেন তাঁকে উনি মহেন্দ্রখুড়ো বলে ডাকতেন। ওনার মহেন্দ্র খুড়োর সততা সম্বন্ধে আমার মনে

মাঝে মাঝে সন্দেহ দেখা দিত। কিন্তু উদার মনের মানুষ রতন কাকা ও সব ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই উদাসীন।

সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি দেখতাম, মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত মহিলা আসতেন কাকার কাছে। কাকা ওই মহিলাকে রুকি মাসি বলে ডাকতেন। রুকি সম্ভবতঃ রুক্মিনির অপভ্রংশ হতে পারে। যৌবনে যে ওই মহিলা যথেষ্টই সুন্দরী ছিলেন, ওঁকে দেখে তা বোঝা যেত।

বড়ই অদ্ভুত ছিলেন ওই মহিলা। ওঁর গায়ের রঙ ছিল অত্যন্ত ফর্সা। আর ওঁর সেই ফর্সা শরীরে আঁকা ছিল লাল নীল উল্কি। ওঁর পরনে থাকত রঙিন ঘাঘরা, গায়ে কনুই অবধি হাতাওয়ালা লম্বা কামিজ। আর সেই কামিজের দু'পাশে থাকত দু'টি পাশ পকেট। মাথার সোনালী চুল থাকত দু'বেনী করে পিঠে ছেড়ে দেওয়া। এবং কাঁধে থাকত রঙিন ঝোলা। আর সেই ঝোলায় যে কী রহস্য লুকানো ছিল কেউ তা জানতে পারে নি কোনদিন। উনি ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলতেন।

সাহানা কাকীমা ওই মহিলাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। কাকীমা বলতেন, ওই মহিলা ভাল নয়। ও পিশাচ সিদ্ধা। ভূত প্রেতের কাঁধে চেপে ও দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। আমি অবাক হয়ে কাকীমার কথা শুনতাম।

কাকীমা আমাকে ওই মহিলার কাছে যেতে মানা করতেন। বলতেন, ওই মহিলাই তোর কাকার মাথায় ভূত-প্রেতের নেশা ঢুকিয়েছে। ওর কাছে গেলে ও তোর মাথায়ও ওই নেশা ঢুকিয়ে ছাড়বে।

ওই মহিলা সম্বন্ধে কাকীমার মুখে আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনতাম। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই ওঁর সম্বন্ধে আমি কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম। কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই।

মনে আছে, আমার বয়স তখন সাত। দুপুরবেলা। কাকীমা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি বারান্দায়। পাশের ঘরের বারান্দা থেকে ওই মহিলা হাতে ইশারা করে বলেছিলেন, এই লাতি, ইদিকে আয়। হামার কাছে আয়।

ওই মহিলা সম্বন্ধে আমার কৌতুহল ছিলই। সুতরাং প্রথম ডাকেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওঁর কাছে।

আমি ওঁর কাছে যেতেই উনি বললেন, তুমি হামার লাতি আছো। তুমাকে হামি একঠো উপহার দিবে। বোলো, তুমি কী লিবে। একঠো সফেদ কবুতর? নেহি তো একঠো বিলাইতি কুত্তার বাচ্চা? অর নেহি তো, একঠো লাল বিল্লীর বাচ্চা? বোলো, তুম ক্যায়া লেগা?

আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সফেদ কী?

উনি বললেন, সফেদ মতলব সাদা, সাদা কবুতর।

বেশ, আমাকে তুমি একটা সাদা কবুতরই দাও। সাদা কবুতর আমার খুব পছন্দ।

আচ্ছা, তাই হোবে। আমার জেবে একঠো সাদা কবুতর আছে। ওটা তুমি তুলে লাও।

আমি জানতাম, উনি ওনার কামিজের পকেটকে জেব বলেন। তাই দেরী না করে আমি ওঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আর তারপর চটপট আমি ওঁর কামিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু ওঁর পকেটে আমি কোন কবুতর পেলাম না। পেলাম একটা ডিম। কবুতরের ডিম। সুতরাং ডিম সমেত হাতটা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, কবুতর কোথায়? এটা তো একটা কবুতরের ডিম!

উনি বললেন, হাঁ, হাঁ, ওটা কবুতরের ডিম আছে। কবুতরের আণ্ডা আছে। আণ্ডা সে বাচ্চা হোয়। বাচ্চা সে বড়া কবুতর হোয়। তুমি একঠো কাম কর। ওই বেতের ধামা দিয়ে আণ্ডাটাকে তুমি ঢেকে দেও। দেখো, বহুত মজা আয়েগা!

চেয়ে দেখলাম, বারান্দার এক কোণে একটি বেতের ধামা রয়েছে। সুতরাং ওঁর কথামতো ডিমটাকে আমি ধামা-চাপা দিলাম। উনি বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মন্ত্রপড়া থামিয়ে উনি আমাকে বললেন, এই লাতি, ইবারে ধামা তোলো। অর দেখো, উসকো অন্দর ক্যায়া মজা হ্যায়!

ওঁর কথা মতো আমি ধামাটাকে তুললাম এবং তুলেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, ধামার নীচে সত্যিসত্যিই একটা পূর্ণবয়স্ক সাদা কবুতর রয়েছে!

উনি বললেন, কবুতরটা হামি তুমাকে উপহার দিলুম। তুমি ওটা লিয়ে লাও।

ওঁর কথা শুনে আমি তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা! ঝট করে ওই সাদা কবুতরটাকে আমি দু'হাতে তুলে নিলাম। আর তারপর এক দৌড়ে যেয়ে হাজির হলাম কাকীমার কাছে।

আড়াল থেকে কাকীমা সব কিছুই লক্ষ্য করেছিলেন। আমি যেতেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উনি ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। এবং তারপর বেশ রূঢ় ভাষায় বললেন, তোকে আমি বার বার বলেছি না, ওই মহিলা ভাল নয়, ওই মহিলা ভাল নয়। ও পিশাচ সিদ্ধা! ওর কাছে তুহ কক্ষনো যাবি না! আমার কথাগুলো কী তোর কানে ঢোকেনি?

বারে! উনি খারাপ হতে যাবেন কেন? এই দেখ না, আমাকে উনি একটা সুন্দর সাদা পায়রা উপহার দিয়েছেন! চেয়ে দেখ, পায়রাটা খুবই সুন্দর, তাই না?

তোর মাথা! ওটা মোটেও একটা সাধারণ পায়রা নয়। ওটা একটা ভূতুরে পায়রা! পাঁচ মিনিটে ডিম ফুটে কী একটা সত্যিকারের পায়রা বড় হয়ে যেতে পারে? দেখবি এখনই হয়তো ওটা ভূত বা পেত্নীর রূপ ধরে খিল খিল করে হেসে উঠবে। তখন বুঝতে পারবি ভূতুরে পায়রা কী জিনিস!

কাকীমার কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে ছাঁক করে উঠল! বড় বড় চোখ করে আমি কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হবে তাহলে?

কী আবার হবে। যা, এখুনি ভেতরের উঠোনে যেয়ে ওটাকে তুই উড়িয়ে দিয়ে আয়। আপদ বিদেয় হোক!

বারে, তুমি কেমন গো? এমন একটা সুন্দর সাদা পায়রাকে তুমি উড়িয়ে দিতে বলছ?

হ্যাঁ, বলছি। কেননা ওটা কোন সাধারণ পায়রা নয়। ওটা একটা ভূতুরে পায়রা। ওটা তোর ক্ষতি করতে পারে। যা, এখুনি ওটাকে তুই উড়িয়ে দিয়ে আয়।

আজও মনে পড়ে, কাকীমার আদেশ আমি অমান্য করিনি সেদিন। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভেতরের উঠোনে যেয়ে পায়রাটাকে আমি উড়িয়েই দিয়েছিলাম। পায়রাটা ওর শ্বেতশুভ্র ডানায় কয়েকবার পত্‌পত্‌ আওয়াজ তুলে সীমাহীন নীল আকাশে ভেসে গিয়েছিল। যতক্ষণ পায়রাটা আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল, অপলক দৃষ্টিতে আমি ওর পানে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর মধ্যে আমি ভূতপ্রেতের কোন লক্ষণই দেখতে পাইনি।

যা হোক, কাকীমার আদেশে পায়রাটাকে উড়িয়ে দিয়ে কাকীমার কাছেই আবার ফিরে এসেছিলাম আমি। চোখ দুটো আমার ছলছল করছিল, কান্না পাচ্ছিল। আমার অবস্থা দেখে কাকীমা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছিলেন। এবং বলেছিলেন, মন খারাপ করিস নি, বাবা। আগামী শনিবারের হাট থেকে আনোয়ারকে দিয়ে সত্যিকারের একজোড়া সাদা পায়রা আনিয়ে দেব তোকে। ভূতুতে পায়রা নয়।

কাকীমার কথায় আমার মুখে আবার হাসি ফুটেছিল।

কিন্তু কাকীমার শত বারণেও ওই অদ্ভুত মহিলার আকর্ষণ-মুক্ত হতে পারিনি আমি। আর আমার কৌতূহলেরও নিবৃত্তি হয়নি এতটুকু।

মনে আছে, সেদিন দুপুরেই আমি আবার যেয়ে হাজির হয়েছিলাম ওই মহিলার কাছে, ওঁর অস্থায়ী ডেরায়। কাকীমা তখন ভাত-ঘুমে আচ্ছন্ন।

কাকার বাড়ির শেষ সীমানায় কয়েকটি আম-কাঁঠালের গাছ ছিল। আর ওই গাছগুলোর নীচেই একখানা বড় খড়ের ঘর ছিল। ওই মহিলা যখন কাকার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখন ওই খড়ের ঘরেই থাকতেন উনি। যে ক'দিন থাকতেন, নিজের হাতেই রান্না করে খেতেন। চাল ডাল নুন তেল সব কাকীমার পরিচারিকা সরলাবালা দিয়ে আসত ওঁকে। তারপর হঠাৎই একদিন আবার কোথায় যে চলে যেতেন উনি, কেউ তা জানতে পারত না।

তো আমি ওঁর খড়ের ঘরে যেয়ে হাজির হয়েছি দেখে উনি তো একেবারে আঁতকে উঠলেন। এবং বললেন, হায় বাপ, তুমি ইখানে এসেছো কেনো? তুমার কাকীমা জানতে পারলে বহুত গুস্সা হোবেন!

কাকীমা কিছু জানতে পারবেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর এখন উনি ঘুমোচ্ছেন। বললাম আমি।

চেয়ে দেখলাম, ঘরের এককোণে কাঠের উনুনে, মেটে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। একটা আস্ত বেগুন লাফালাফি করছে ওই ভাতের হাঁড়িতে। একখানি সানকিতে নুন-হলুদ মাখানো কিছু চুনো মাছ রয়েছে। আর তার পাশে রয়েছে ফালি ফালি করে কাটা কয়েক টুকরা আলু-বেগুন, আর মাঝ বরাবর চেরা ক'টা শীতের সুগন্ধি কাঁচালঙ্কা।

তো, একথা সেকথার পর আসল কথায় এসেছিলাম আমি। বলেছিলাম, লাতিমাসি, তুমি আমাকে ভূত দেখাবে?

আমার কথা শুনে লাতিমাসি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি ভূত দেখবে? ঠিক আছে। হামি তুমাকে ভূত দেখাবে। লেকিন আভি নেহি। তুম যব বড়া হোবে, হামি তুমাকে ভূত দেখাবে।

আমি তো এমনই বেশ বড় হয়ে গেছি। তুমি আমাকে ভূত দেখা ও, লাতিমাসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বড়া হয়ে গিয়েছ। লেকিন আউর জরাসে বড়া না হলে ভূত দেখা যায় না। তুম যব আউর জরাসে বড়া হোবে, হামি তুমাকে ভূত দেখাবে। জরুর দেখাবে।

কিন্তু লাতিমাসির সঙ্গে আমি আর বেশীক্ষণ কথা বলতে পারিনি সেদিন। কারণ কথার মাঝেই আমার চোখ পড়েছিল পাশের জানালায়। কাকীমা বোধহয় তখন আমার খোঁজেই ওই খড়ের ঘরের দিকে আসছিলেন। আর তা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে গেছলাম পেছনের দরজা দিয়ে।

এরপর আমার বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পরিবেশে দেখা হয়েছে ওই অদ্ভুত মহিলার সঙ্গে। এবং একথা সেকথার পর প্রতিবারই আমি ওঁর কাছে ভূত দেখার জন্য আব্দার করেছি। কিন্তু উনি আমাকে প্রতিবারই হতাশ করেছেন। প্রতিবারই আমাকে উনি সেই একই কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, আউর জরাসে বড়া হও। হামি তুমাকে ভূত দেখাবে। জরুর দেখাবে।

তো বার বার ওই মহিলার মুখ থেকে সেই একই কথা শুনে শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এবং বিরক্ত হয়ে শেষে একদিন আমি ওঁকে দু'চার কথা শুনিয়েও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আচ্ছা, বার বার তুমি আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দাও কেন? আমি বুঝতে পেরেছি, ভূতপ্রেতের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই নেই'। আমাকে ভূত দেখানোর কোন ক্ষমতাই তোমার নেই। আসলে তুমি একজন ধাপ্পাবাজ মেয়েছেলে!

আমার কটূক্তি শুনে উনি কিন্তু কোন প্রতিবাদই করেননি। শুধু মলিন মুখে উনি কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়েছিলেন।

ক্ষণেক বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই রামলোচন খুড়ো আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভায়া। তুমি কী আমাদের আজ গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন, ভূতের গল্প শোনাতে চাইছ?

আজ্ঞা, শুধু ভূতের গল্প নয়, সঙ্গে কিছু মানুষের কথাও আছে। আগন্তুক উত্তর দিলেন।

বেশ, বেশ। তাহলে এগিয়ে যাও, ভায়া।

আগন্তুক আবার শুরু করলেন। তো কোঁচড়ের মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা ফুরনোর কিছুক্ষণ পরেই আমি রতন কাকার বাড়ি যেয়ে হাজির হলাম। আর ভাগ্যগুণে অথবা ভাগ্যদোষে, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আমি কাকা-কাকীমা দু'জনকেই একসঙ্গে

পেয়ে গেলেম। এবং একথা সেকথার পর সুযোগ বুঝে ওঁদের দরবারে আমি আমার ভূত দেখার আর্জিটা পেশ করে দিলাম।

কিন্তু হায়রে আমার কপাল! আমার আর্জি শুনে কাকীমা তো একেবারে ফুঁসে উঠলেন। আমার পনের পার হওয়া বয়েসটাকে উনি মোটে কোন বয়েস বলেই মানলেন না। বললেন, কী বললি তুই! ভূত দেখবি? তোর সাহস তো বড় কম নয় এই সেদিনের ছেলে তুই! এই ক'দিন আগেও তোর মুখে আমি দুধের গন্ধ পেয়েছি আর আজ তুই ভূত দেখতে যেতে চাস! বলি, ভূত কী জিনিস তুই জানিস? একবার যারা ওদের সামনা-সামনি হয়েছে তারা কী আর কেউ প্রান নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে! ওরা মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খায়। দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খায়। আর মাথাটাকে ওরা লাথি মেরে দূরে ছুড়ে দেয়, বুঝেছিস?

এয়েচ, খাওদাও, খেলা ধুলো কর। সাঁতার কাট। তুফানের পিঠে চেপে মাঠে-ময়দানে ছুটে বেড়াও। কোন আপত্তি করব না। কিন্তু তাই বলে ওইসব অলক্ষুণে কথা তুমি আর কোনদিন মুখেও আনবে না। এই আমি বলে দিলাম।

লক্ষ করলাম, কাকীমা যতক্ষণ আমাকে এক নাগাড়ে বকাঝকা করে গেলেন, কাক ততক্ষণ বসে বসে শুধু মুচকি মুচকি হাসলেন। কিন্তু মুখে উনি রা-টি কাড়লেন না আর তা দেখে কাকীমা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। এবং আমাকে ছেড়ে দিয়ে এবারে উনি কাকাকে নিয়ে পড়লেন। বললেন, হাসছ যে বড়! বলি, আমি কী কিছু মিথ্যে কথা বললাম নাকি? মানুষে-ভূতে যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক একথা বে না-জানে, শুনি?

নেহাতই ভাল মানুষের মতো মুখ করে কাকা বললেন, আহা! আমি কী সেইজন হাসছি নাকি? আমি হাসছি ভূতেদের বোকামীর বহর দেখে। বেটারা মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খায়। দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খায়। অথচ বোকার মতে মাথাটাকে লাথি মেরে দূরে ছুড়ে দেয়। কেন বাবা, ওটা দিয়ে তো তোরা অনায়াসে মুগ ডালের মুড়িঘন্ট করে খেতে পারতিস! বোকা ভূত আর কাকে বলে!

নিজের রসিকতায় কাকা নিজেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। আর তা দেখে কাকীমা কাকার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সেখান থেকে দ্রুত সরে গেলেন।

সুতরাং কাকীমার তীব্র বিরোধিতায় আমার আর ভূত দেখা হয়ে উঠল না সেবার কয়েকদিন কাকা-বাড়ি কাটিয়ে একদিন সকালে আমি আবার পথে নামলাম। উদ্দেশ বাড়ি ফিরে যাওয়া। সকালের শীতল হাওয়ায় শরীর মন আমার জুড়িয়ে গেল। পথ চলতে চলতে অদ্ভুত ভাবে আমার মায়ের কথা, বাবার কথা, ছোট বোন কুসুমের কথা, অমৃতার কথা, সবার কথা মনে এল। ভেবে দেখলাম, সকলের মনঃকষ্টের কারণ আমি নিজে। আমি যদি ঠিকমতো লেখাপড়া করি, কাজে-কামে মন দিই তবে মায়ের মুখে হাসি ফোটে, বাবা খুশি হন, অমৃতা আনন্দে ডগমগ করে ওঠে। তো এসব

কথা ভেবে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এবার আমি ঠিকমতো লেখাপড়া করব। কাজে কামে মন দেব। আর পাঁচটা ছেলের মতো আমিও ভাল ছেলে হব। এসব কথা ভেবে মনটা আমার হাল্কা হয়ে গেল। চলার গতি বেড়ে গেল। হনহনিয়ে আমি বাড়ির পথে এগিয়ে চললাম।

কিন্তু হায়রে আমার কপাল! বাড়ি ফেরার পথটুকু আর আমি শেষ করতে পারলাম না। কেননা, কিছুদর এগিয়ে যেতেই আমার নজরে পড়ল পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি আমার চলার পথেই এগিয়ে আসছে। গাড়িগুলো কাছে আসতেই আমি বুঝতে পারলাম, সেগুলো রটন্তী অপেরার গাড়ি। প্রতিটি গাড়িতেই দলের ফেস্টুন আঁটা। গাড়িগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে গোটা দলটাকে তাঁদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। গাড়ির ভেতরে সকলেই গল্প-গুজবে মশগুল। আমি পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারিবদ্ধ গাড়িগুলো আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। দেখলাম, সবার পেছনের গাড়িতে বসে রয়েছেন সূর্যকান্ত দাস মশাই। ম্যানেজারের অবর্তমানে যিনি একাধারে দলের ম্যানেজার এবং অধিকারী।

এসব দেখেশুনে নিজেকে আর আমি সামলাতে পারলাম না। ভাবলাম, আজ রাতে কোথায় পালা গাওয়া হবে, কি পালা গাওয়া হবে জানা বিশেষ প্রয়োজন। এবং সেইমতো আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সুতরাং আর দেরী না করে গাড়িগুলোর পেছনে পেছনে হেঁটে চললাম আমি। আর হেঁটে চলতে চলতেই একসময় সুযোগ বুঝে দাসমশাইকে বললাম, নমস্কার দাস মশাই। ভাল আছেন তো?

দাসমশাই গাড়ির ঝাঁকনি খেতে খেতেই আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে বাবা তুমি? হঠাৎ এই মাঠের মাঝে কোথা থেকে উদয় হলে?

আজ্ঞা, আমার নাম দীপক। এই কাছেই হুতোমপুরে আমার বাড়ি। আমি উত্তর দিলাম।

দাঁড়াও, দাঁড়াও! হুতোমপুর, হুতোমপুর! নামটা বড় চেনা চেনা ঠেকছে!

আজ্ঞা, ঠেকবেই তো! এই তো গত অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের গ্রামে আপনারা লক্ষণ বর্জন পালা গাইলেন যে! বড় ভাল গেয়েছিলেন। সব্বাইকে একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়ে ছিলেন। সত্যিই একজন সার্থক অধিকারী আপনি!

তো আমার প্রশস্তিতে অধিকারী মশাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লেন। এবং উনি বুক ঠুকে বললেন, জান তো, এই শর্মার নাম সূর্যকান্ত দাস! এই শর্মা মানুষকে কাঁদাতে পারে, হাসাতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে যে কাউকে তাধিন তাধিন নাচ নাচাতেও পারে!

আজ্ঞা, তা যা বলেছেন! আমি সায় দিলাম।

তো আমার কথাবার্তায় অধিকারী মশাই বেশ খুশি হলেন। এবং আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা এই সাতসকালে তুমি কোথায় চলেছ?

আমি উত্তর দিলাম, আজ্ঞা, আপনারা যেথায় যাবেন, সেথায়। কারণ আমার বড্ড ইচ্ছে, অন্ততপক্ষে আর এক রাত্তির আপনাদের পালা শুনি।

বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! তা হেঁটে যাবে কেন? গাড়িতে উঠে এসো!

অতঃপর গাড়িতে উঠে বসলাম আমি। এবং অধিকারী মশাইয়ের পাশেই ঠাঁই করে নিলাম। তারপর ঝাঁকনি খেতে খেতে সবার সঙ্গে আমি ও এগিয়ে চললাম। এগিয়ে চললাম আমি অনির্দিষ্টের পানে। এগিয়ে চললাম আমি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে। কারণ সেই যে সেদিন রটন্তী অপেরার গরুর গাড়ির ঘেরাটোপে বসে আমি চলা শুরু করেছিলাম, সহজে তা শেষ হয়নি।

তো গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছলাম। এবং ভাল ছেলে হওয়ার কিঞ্চিৎ ইচ্ছাও আমার আর মনে জাগেনি। এবং হুতোমপুর নামক গ্রামটার কথাও আমার আর স্মরণে আসেনি।

তো কিছুদূর এগিয়ে যেতেই লক্ষ করলাম, অধিকারীমশাই গম্ভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছেন। সুতরাং আমিও আর কোন কথা না বলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। গাড়ি এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরে একজন মাঝবয়সী মহিলা আমাদের সম্মুখের গাড়ি থেকে নেমে এসে অধিকারী মশাইকে বললেন, অধিকারী দাদা, তাড়াতাড়ি ওষুধ দাও। কৃষ্ণার আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এয়েচে!

অধিকারীমশাই পাশের প্যাঁটরা খুলে কয়েকটি বটিকা তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো একটুকরো কাগজে মুড়ে ওই মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, যা, এখুনি এগুলো জল দিয়ে খাইয়ে দেগে। খানিকক্ষণের মধ্যেই জ্বর নেমে যাবে। মহিলা বটিকাগুলো নিয়ে চলে গেলেন।

এবং ওই মহিলা চলে যাওয়ার পর অধিকারী মশাই স্বগতোক্তি করলেন, মেয়েটা বিপদে ফেললে দেখছি! জ্বর বাধাবার আর সময় পেলিনে বাছা! বিছানা নেওয়ার আগে তোর রোহিতাশ্বের কী গতি হবে, একবার ভেবে দেখলি নে!

অধিকারী মশাইয়ের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই ওঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রোহিতাশ্ব কে?

উনি উদাস নয়নে চেয়ে উত্তর দিলেন, রাজপুত্তুর।

আমি বললাম, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না!

উনি বললেন, এতে না বোঝার কিছু নেই। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাবালক পুত্র রোহিতাশ্ব। তারপর হঠাৎই উনি আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা দীপক, তুমি অ্যাকটো জান?

আমি আমতা করে উত্তর দিলাম, আজ্ঞা, তেমন কিছু জানি নে। তবে ওই পাড়ার সখের ঠেটারে মাঝে মধ্যে অ্যাকটো করে থাকি। তবে আপনাদের যাত্রাদলের—।

আমায় বাধা দিয়ে উনি বললেন, ব্যস্, ব্যস্! ওতেই হবে।

দেখলাম, অধিকারী মশাই মুহূর্তে মেজাজ ফিরে পেলেন এবং বুক ঠুকে বললেন, এই শর্মার নাম সূর্যকান্ত দাস। এই শর্মা মেয়েকে ছেলে সাজাতে পারে, আবার ছেলেকে মেয়ে। জোয়ানকে বুড়ো বানাতে পারে, আবার বুড়োকে জোয়ান। তুমি কিশোর দীপক কাল রাত্রে আমার হাতের ছোঁয়ায় নাবালক রাজপুত্র রোহিতাশ্বে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এই তুমি দেখে নিও!

ওঁর কথা শুনে আমি তো একেবারে আঁতকে উঠলাম। বললাম, যাত্রার ব্যাপারে যে আমি কিছুই জানি নে! তাছাড়া আমার পার্ট মুখস্থ নেই! রোহিতাশ্বের চরিত্র—!

আমায় বাধা দিয়ে উনি বললেন, তুমি কিচ্ছু ভেব না। আগামীকাল সন্ধ্যের মধ্যে আমি তোমায় ঠিক তৈরি করে নেব। একটা রাতের তো ব্যাপার! তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

যদিও অধিকারীমশাই আমায় বললেন, তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি!

গাড়ি এগিয়ে চলল। একটু পরে অধিকারী মশাই বললেন, কৃষ্ণার ম্যালেরিয়া হয়েছে। ওকে কুইনাইন দিতে হবে। চরনসীপুরে যেয়েই সব ব্যবস্থা করব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানেই কী আপনারা কাল পালা গাইবেন?

হ্যাঁ, ওখানকার জমিদার বাড়িতে আমরা পালা গাইব। এই তো আর ক্রোশ দুয়েক পথ গেলেই চরনসীপুর গ্রাম।

তো চরনসীপুর জমিদার বাড়িতে পৌঁছনোর পর আমাকে তৈরি করে দেয়ার ভার পড়ল অধিকারীমশাইয়ের ভাগ্নে দুর্জন দাসের 'পরে। শুনলাম সে নাকি বড় অ্যাক্টর। কিন্তু আমাকে তৈরি করে দিতে এসে সার্থক নামা দুর্জন দাস যে ভাবে আমাকে গালিগালাজ করতে লাগল, চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল, তাতে পার্ট মুখস্থ করা দূরের কথা, সব কিছুতেই আমি ভুল করতে লাগলাম। এবং শেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম, কাউকে কিছু না বলে দল ছেড়ে আমি পালিয়ে যাব।

আর মনস্থির করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ওই বদমেজাজী দুর্জন দাসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাত্রাদলের তাঁবুর বাইরে চলে এলাম। এবং কেউ কোথাও নেই দেখে এক ছুটে আমি পালিয়ে যেতে গেলাম। আর ঠিক তখনই তাঁবুর আড়াল থেকে কে যেন খপ্ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরল। আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে রঙিন তাঁত-শাড়ি পরা এক শামলা সুদর্শনা কিশোরী। সেই আমার হাত চেপে ধরেছে। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল, রোহিতাশ্ব।

ও, বুঝেছি। তুমিই তাহলে কৃষ্ণা। তা তোমার তো জ্বর হয়েছে, উঠে এসেছ কেন? ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কৃষ্ণা চট করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর যাত্রার ঢঙে উত্তর দিল—তোহারি লাগিয়া, সখা!

তারপর কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠল—তোহার লাগিয়া ঘর ছাড়িয়াছি পথ করিয়াছি ঘর।/নিঠুর নিদয় সুজন সখা আমারে কোরো না পর।

আমি বললাম, রঙ্গরাখ। পথ ছাড়। আমায় যেতে দাও।

কৃষ্ণা আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েই আবার গেয়ে উঠল—বৃন্দাবন ছাড়ি যাবে মথুরাতে কে পুছিবে তোহা সেথা। / বিরহ ব্যথায় অভাগিনী রাই ধুলায় লুটাবে হেতা।

আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, আঃ! পথ ছাড়। আমায় যেতে দাও।

কিন্তু কৃষ্ণা আমার পথ ছাড়ল না। আগের মতোই সে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে গেয়ে উঠল—তুমি মথুরাতে যাবে কুব্জীরে পাবে মালা চন্দন হাতে।/কালো কুৎসিত বিকট বদন উন্নত পিঠ সাথে।/তুমি আরো যেথা পাবে কংস মামারে উদ্যত অসি হাতে।

দেখ কৃষ্ণা, তুমি আমায় আটকানোর চেষ্টা কোনো না। এখানে কোন ভাল মানুষ তিষ্ঠোতে পারে না!

কৃষ্ণা বলল, না, না, সখা। তুমি অমন কথা বোলো না। সবাইকে তুমি দুর্জন দাস ভেব না। আমরাও আছি। আর আমরা সবাই কিছু খারাপ লোক নই। সে তুমি দু'চার দিন এখানে থাকলেই বুঝতে পারবে।

কী বললে! দু'চার দিন? এখানে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।

তা তো হয় না, সখা। তোমার এই সখীকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে তুমি চলে যেতে পার না। আর পুরুষমানুষ হয়ে তোমরা যদি পালিয়ে বাঁচতে চাও, তবে আমরা কোথায় দাঁড়াব বল তো?

কৃষ্ণার কথায় আমার উদ্ধত কৈশোর-মন ঘা খেল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ বিপদে পড়েছ তুমি? আমি এখানে থেকে গেলেই কী তুমি সেই বিপদে থেকে উদ্ধার পাবে?

কৃষ্ণা বলল, শোন সখা, শোন। আমার কথা শোন। দেখ, এই যাত্রাদল চলছে বলেই আমার মতো কয়েকজন ভাগ্যহীনার অন্নসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু দল থেমে গেলে আমাদের যে কী গতি হবে, তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বলল, ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু বছর তিনেক আগে তিনি বসন্ত রোগের প্রকোপে অন্ধ হয়ে গেছেন। এবং সেই থেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি এই যাত্রাদলে রয়েছি। এখানে অভিনয় করে যা পাই তাতে আমার এবং আমার অন্ধ বাবার কোন রকমে পেট চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন ধরে আমি জ্বরে ভুগছি! মাঝে মাঝেই কাঁপনি দিয়ে জ্বর আসে। শরীর দুর্বল। মাথা ঘোরে। এই অবস্থায় রাত জেগে অভিনয় করা আমার

পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানে দলে এমন কোন কিশোর বা কিশোরী নেই যে নাকি রোহিতাশ্বের চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। এদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র পালার জন্য অধিকারীকাকা বাবুদের কাছ থেকে বায়না নিয়েছেন। এই অবস্থায় তুমি চলে গেলে আমরা সকলেই বিপদে পড়ব।

কিন্তু তোমাদের ওই দুর্জন দাস—।

বাধা দিয়ে কৃষ্ণা বলল, ওর নাম সুজন দাস। ওর দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে ওকে দুর্জন দাস বলে। সুজন ভাল অভিনয় করে। কিন্তু সত্যিই ও লোক সুবিধের নয়। অভিনয় শেখার সময় ওর হাতে আমাকে চড়-চাপড়ও খেতে হয়েছে। এখন অবিশ্যি আমার সাথে ও ভাবজমাতে চায়। আমাকে ও বিরক্ত করে। ওকে রুখতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়।

কিন্তু ওর দুর্ব্যবহারের জন্য ওর মামা ওকে শাসন করেন না কেন?

কে ওর মামা? এখানে ওর কোন মামা নেই। সুজন দাস বড়লোকের ঘরের বখাটে ছেলে। আমাদের মতো ও পেটের দায়ে এই যাত্রাদলে আসে নি, এসেছে সখে। তবে অভিনয়ের ব্যাপারে ও দারুণ সিরিয়াস। খলনায়কের চরিত্রে ও দারুণ অ্যাকটিং করে। অধিকারীকাকা ওর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তাছাড়া ওঁদের দু'জনের মধ্যে টাকা-পয়সা লেনদেনের কি একটা ব্যাপার আছে শুনেছি। আর তাই ওর সঙ্গে সমঝোতা করে চলা ছাড়া কাকার কোন উপায়ও নেই। এইসব কারণে কাকা ওর অনেক দোষই মাফ করে দেন। আর সে জন্যই ওঁদের দু'জনকে সবাই মামা-ভাগ্নে বলে।

তারপর গলা নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, অর্থাৎ একজন শকুনি, তো অন্যজন দুর্যোধন!

একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বলল, সুজন দাসের অনেক দোষ। ও মদ খায়, মাতলামি করে। দলের মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে প্রেম করতে যেয়ে ও তাদের কাছে গালাগালি খায়। ওর উৎপাতে বিরক্ত হয়ে মেয়েগুলো এক-এক সময় ফুঁসে ওঠে! দলে চীৎকার চেঁচামেচি হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একসময় মেয়েগুলো মাথা নত করে। সব আবার শান্ত হয়ে যায়। সব কিছুই আবার গতানুগতিকভাবে চলতে থাকে। আমরাও চলতে থাকি। যাযাবরের মতো চলতে থাকি। এখান থেকে সেখানে যাই। সেখান থেকে অন্য কোনখানে। অস্থায়ী ডেরা বাঁধি। আবার ভাঙি, আবার বাঁধি। এইভাবেই চলছে।

থাক সে সব কথা। তোমার কথা শুনি। তা হঠাৎ তুমি কোথা হতে উদয় হলে? বাড়ি থেকে পালিয়েছ বুঝি?

না, পালাইনি। বাড়ি থেকে আউট হয়ে গেছি।

ওমা! সে কী কথা! আউট হলে কী করে? সংসারে সৎমা আছেন বুঝি?

আরে না, না! সেসব কিছু নয়। আসলে ঘর আমার ভাল লাগে না। ঘরের বাঁধন আমার সহ্য হয় না। কারো কাছে বাঁধা পড়তেও আমার ইচ্ছে হয় না। তাই ঘর ছেড়ে আমি পথে নেমেছি। এক জায়গায় বেশি দিন মন বসে না তাই ছুটে বেড়াচ্ছি।

তোমার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি! আমরা ঘর ছাড়া হয়ে ছন্নছাড়ার মতো পথে পথে ঘুরে মরছি। ঘর ফিরে পাওয়ার আশায় আমরা ভবিষ্যতের পানে চেয়ে দিন গুনছি। আর তুমি স্বইচ্ছায় ঘর ছেড়ে পথে নেমেছো। পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছ। কিন্তু কেন এই মতিচ্ছন্ন?

স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে তোমায় বেঁধে রাখতে পারে, এমন আপনজন কী তোমার কেউ নেই?

কৃষ্ণার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওর কাজল-কালো চোখের পানে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কৃষ্ণা নিজেও অনিমেষে আমার চোখের 'পরে চোখ-রেখে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে ও চোখ নামিয়ে নিল। তারপরও মৃদুস্বরে বলল, এসো।

কৃষ্ণার কাজল-কালো চোখে কি যাদু ছিল জানিনে। ওর আহ্বানে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতোই ওকে অনুসরণ করলাম। যেখানে যেয়ে আমি থামলাম, সেটা যাত্রাদলের মহিলা-তাঁবু। ইশারা করে কৃষ্ণা আমাকে মাটিতে পাতা জীর্ণ শতরঞ্চির ওপরে বসতে বলল। ও নিজেও বসল।

চেয়ে দেখলাম, তাঁবুর ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাতা জীর্ণ শতরঞ্চির ওপরে কেউ বসে রয়েছে, কেউ শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেউ বা হাতে-লেখা পুঁথিতে চোখ বুলিয়ে নিজের পার্ট রপ্ত করছে। আমার মহিলা তাঁবুতে প্রবেশে ওদের কারো কোন আপত্তি আছে বলে মনে হল না। ওরা শুধু একবার করে আমার 'পরে চোখ বুলিয়ে নিল। ব্যস্, ওই পর্যন্তই।

একটু পরে কৃষ্ণা বলল, দেখ, আমাদের এই মহিলা তাঁবুতে যাদের তুমি দেখছ, সবাই ভাগ্যহীনা। এরা কেউই সখে এই যাত্রাদলে আসেনি, এসেছে পেটের দায়ে। জীবনে যারা ঘর পেয়েছে, বর পেয়েছে, সুখ পেয়েছে, শান্তি পেয়েছে, তাদের কেউ এখানে নেই। আসলে এরা যেন বর্ষার জলে ভেসে চলা একদল কচুরি-পানা। এরা কোথায় চলেছে তা জানে না। এরা শুরু জানে, কিন্তু শেষ জানে না।

একটু থেমে কৃষ্ণা এক মহিলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ওই যে দেখছ ফর্সা করে ওই যুবতী, উপুড় হয়ে আধশোয়া অবস্থায় বুকে কোল বালিশ চেপে ধরে, হাতে-লেখা পুঁথিতে চোখ বুলোচ্ছে, আর বিড় বিড় করে নিজের পাট মুখস্থ করছে, ওকে সবাই ছোটরানী বলে ডাকে। ও স্বামীহীনা, সন্তানহীনা। বিধবা হওয়ার পর কোথাও ওর ঠাঁই হয়নি। না শ্বশুর বাড়িতে, না বাপের বাড়িতে। শেষে এই যাত্রাদলে এসে ওর একটা গতি হয়েছে।

আর ওই যে শামলা, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া যুবতী, আলস্য ভরে চোখ-বুঁজে শুয়ে রয়েছে, ওর নাম শকুন্তলা। ওর দুষ্মন্ত ওকে নেয় না। সে এক অল্পবয়সী সুন্দরীকে বিয়ে করে সুখে ঘর করছে। আর এ বেচারী শকুন্তলা পেটের দায়ে পড়ে রয়েছে এই যাত্রাদলে।

তাঁবুর শেষপ্রান্তে চেয়ে দেখ ওই প্রসাধনরতা উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপবতীর দিকে।

ওকে সবাই ঘৃতাচী বলে ডাকে। ওকে দেখলেই বোঝা যায় সৃষ্টিকর্তা ওর সৃষ্টিকালে পরম প্রসন্নভরে ওকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ওর সৃষ্টিকর্তা ওর প্রতি প্রসন্ন হলেও ওর ভাগ্যদেবতা ওর প্রতি বড়ই বিরূপ। স্রষ্টার প্রসন্নতা আর ভাগ্য দেবতার বিরূপতার টানা-পোড়েনে পড়ে বেচারী ঘৃতাচী শেষে ছিটকে এসে পড়েছে এই রটন্তী অপেরাতে।

একটু থেমে কৃষ্ণা আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সখা, বল তো, ওকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?

আমি উত্তর দিলাম, ওর ওই পুতুল পুতুল চেহারা দেখে আমার মনে হচ্ছে, ও যেন পুতুল নাচের এক রূপবতী পুতুল।

কৃষ্ণা বলল, এখানে আমরা সবাই পুতুল নাচের জড় পুতুল। অধিকারী মশাই আমাদের বাজিকর। ওঁর নির্দেশ রূপ সুতোর টানে আমরা হাসি, কাঁদি, নাচি।

একটু থেমে কৃষ্ণা বলল, আসলে মেয়েটির রূপই মেয়েটির কাল হয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভেই রূপসী ঘৃতাচীর পরিচয় হয় এক রূপবান যুবকের সঙ্গে। নাম বিরূপাক্ষ। ঘৃতাচী ওর প্রেমে পড়ে। এবং স্বল্প পরিচিত হলেও মোহের বশে ও একদিন বিরূপাক্ষের হাত ধরে গৃহত্যাগ করে। কালীঘাটে ওদের বিয়ে হয়। ঘৃতাচী কয়েকমাস বিরূপাক্ষের ঘরও করে। কিন্তু তবুও ভণ্ড বিরূপাক্ষের আসল উদ্দেশ্য ও বুঝতে পারেনি।

কয়েক মাস পরে ওরা দু'জনে ওড়িশা ভ্রমণে যায়। সেখানেই বিরূপাক্ষ ওকে এক নারীপাচারকারী দলের কাছে মোটা টাকায় বিক্রী করে দেয়। আর তারপর ও নিজে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ভাগ্যহীনা ঘৃতাচী প্রায় সপ্তাহ খানেক ওই পাচারকারী দলের ডেরায় বন্দি হয়ে থাকে।

শেষে একদিন রাত্রে পুলিশ ওই পাচারকারী দলেব ডেরায হানা দেয়। আর সেই সুযোগে ঘৃতাচী ওখান থেকে পালিয়ে এসে এক হাওড়াগামী ট্রেনে চেপে বসে। ট্রেন চলতে শুরু করে। ঘৃতাচী হাঁপ ছাড়ে।

কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে ঘৃতাচী বুঝতে পারে যে নারীপাচারকারী দলেরই এক চর ছদ্মবেশে ওই কম্পার্টমেন্টেই বসে আছে। আর সে ওর প্রতি নজর রেখে চলেছে। ব্যাপার দেখে ওর বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু তবুও ঠাণ্ডা মাথায় ও ওই ছদ্মবেশী চরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

অবশেষে ট্রেন বাংলায় প্রবেশ করার কিছু সময় পরে একটা সুযোগ আসে। খড়গপুর স্টেশনে ঢোকার আগে সিগনাল না পাওয়ায় ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পরে। ছদ্মবেশী চরটি তখন বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আর সেই সুযোগে ঘৃতাচী ট্রেন থেকে নেমে ছুটতে শুরু করে। ভোরের দিকে ও আমাদের মহিলা তাঁবুতে ঢুকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। ওর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল। সেই থেকেই ঘৃতাচী এই যাত্রাদলে রয়ে গেছে।

একটু থেমে কৃষ্ণা বলল, আসলে এই পৃথিবী ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। সবাই

এখানে থাকতে চায়। বেঁচে থাকতে চায়। সব কিছু হারিয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। কেন জান?

কেন? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কৃষ্ণা বলল, সব মানুষই স্বপ্ন দেবে। ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন। সেই সুখস্বপ্নই মানুষের শত দুঃখেও তাকে বেঁচে থাকতে প্রলুব্ধ করে। আর তাই সে বেঁচে থাকে। এবং ভবিষ্যতের পানে চেয়ে সে এগিয়ে চলে। রূপসী ঘৃতাচীর জীবন বৃত্তান্ত সেই সত্যেরই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দেখ, মানুষ ঘৃতাচীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওর নারীত্বের সকল গরিমায় কালি মাখিয়েছে। ওর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তবুও ও বেঁচে থাকতে চায়। সব কিছু হারিয়েও ও বেঁচে থাকতে চায়। কারণ ও বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতে একদিন না একদিন ও সুখী হবে, শান্তি পাবে। একটি বড় মনের বর পাবে, ছোট্ট একটি ঘর পাবে, কোল আলো করা সন্তান পাবে।

কৃষ্ণা থামতেই আমি ওকে বললাম, একটু আগে তুমি বলছিলে, ঘরছাড়া হয়ে তোমরা ছন্নছাড়ার মতো পথে পথে ঘুরছ। ঘর ফিরে পাওয়ার আশায় তোমরা ভবিষ্যতের পানে চেয়ে দিন গুনছ। তোমাদের ঘৃতাচীও স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে একদিন ও সুখী হবে, শান্তি পাবে। আচ্ছা, তোমরা সকলেই কী সেই স্বপ্নে দেখা সুখ পাখিটার সন্ধানে পথে নেমেছ?

মৃদু হেসে কৃষ্ণা বলল, হ্যাঁ, তাই।

এমন সময় অধিকারী মশাই হন্তদন্ত হয়ে ওই মহিলা তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। এবং ওঁকে দেখে আমরা দু'জন চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। দুর্জন দাসের কাছ থেকে আমার অন্তর্ধানের সংবাদ উনি বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেছিলেন। আর তাই আমার প্রতি নজর পড়তেই উনি হাত-পা নেড়ে যাত্রার ঢঙে শুরু করে দিলেন—

ধিক্ ধিক্ রোহিতাশ্ব একী আচরণ।
সূর্য্যবংশ জানে না তো পৃষ্ঠ প্রদর্শন॥
তোর উত্তর পুরুষ রাম সর্বলোকে বলে।
দশাননে বধিল সে দীপ্ত বাহুবলে॥
কূটনীতি ভেদনীতি সখ্যনীতি বলে।
অনার্যের ধ্বজা সে ফেলে ভূমিতলে॥
দাশরথি উড়াইল আর্যরাজ ধ্বজা।
উপলক্ষ্যের জয় হল উদ্ধারিত সীতা॥
তুমি তার পূর্বপুরুষ আপনার জন।
তোমাতে কী শোভা পায় এই আচরণ॥

তো আমা হেন মহাবীর বংশের পূর্বসূরির লজ্জাজনক পশ্চাদপসরণকে ধিক্কার দিতে এবং একই সঙ্গে আমাকে আমার কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করতে অধিকারী মশাই যতক্ষণ

থার ফুলঝুরি ঝরাতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি হাঁ করে ওঁর মুখের পানে চেয়ে াড়িয়ে রইলাম। আমার মুখ থেকে রা-টি সরল না। চকিতে চেয়ে দেখলাম কৃষ্ণার বস্থাও সেই আমারই মতো। আশপাশের অন্যান্য মহিলারাও অবাক হয়ে ওঁর রামায়ণী থা শুনছেন। তাঁরাও নির্বাক।

কিন্তু কখন যে আমার পরিত্রাত্রী রূপে ছোটরাণী আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছলেন, তা বুঝতে পারিনি। অধিকারীমশাই থামতেই উনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আচ্ছা াকা, তোমার কী আক্কেল বল তো? ওইটুকু ছেলেকে তুমি রামের কূটনীতি, ভেদনীতি, খ্যনীতির কথা শোনাচ্ছ! বলি, অতশত বোঝার মতো কী ওর বয়েস হয়েছে? তোমার ই ব্যক্তিমে শুনে আর লম্ফঝম্প দেখে ও বেচারা কেমন হাঁ হয়ে গেছে দেখেছ? বে যাই বল না কেন কাকা, ওকে তুমি আর ওই দুর্জন দাসের খাঁচায় ঢোকাতে ারবে না। এই আমি বলে রাখলাম। দরকার হলে আমরাই ওকে তালিম দেব।

ততক্ষণে কৃষ্ণাও বোধহয় ওর মনের জোর ফিরে পেয়েছিল। অধিকারীমশাইকে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রোহিতাশ্বের চরিত্রে তেমন কিছু বেশী নম্বরের পার্ট নেই। ওকে ামিই তৈরি করে দিতে পারব।

যা হোক, শেষে কৃষ্ণার কথাই বোধহয় অধিকারীমশাইয়ের মনঃপূত হল। উনি ষ্ণাকে বললেন, তা বেশ। ওকে তাহলে আর আমি সুজনের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে াচ্ছি নে। তুমিই ওকে তৈরি করে দাও। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে ছোটরানীও থাকবে। আর ময় নষ্ট না করে তোমরা এখনই কাজে লেগে যাও। আমি আবার পরে আসব।

অধিকারীমশাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর তা দেখে সবাই যেন হাঁপ ছড়ে বাঁচলেন। ছোটরানী বললেন, চল ভাই, এবারে আমরা তোমাকে নিয়ে পড়ি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, চলুন।

উনি বললেন, দেখ ভাই, আপনি-আজ্ঞেটা আমার তেমন পছন্দ নয়। আর তোমার খ থেকে আমি 'ছোট রানী' ডাকও শুনতে চাইনে। তুমি বরং আমায় রানীদিদি লে ডেকো।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তো আমাকে তৈরি করে দেওয়ার জন্য রানীদিদি আমাকে মহিলা তাঁবুর একপ্রান্তে য়ে গেলেন। সঙ্গে কৃষ্ণাও গেল। আর তারপর অভিনয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি-বিষয় রা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। প্রম্‌টারের সাহায্যে কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে নিজের বলা যায়, সুঅভিনয় করা যায় ইত্যাদি ব্যাপারে ওঁরা আমাকে তালিম দিতে । আমাকে যথাযথভাবে তৈরি করে দেওয়ার জন্য ওঁরা একেবারে উঠে পড়ে । এবং শেষে রানীদিদি রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণা শৈব্যা ও আমি রোহিতাশ্বের রিহার্সাল দিতে শুরু করে দিলাম। এবং ওঁদের দু'জনের আন্তরিকতায় আমি হলাম।

সন্ধ্যের দিকে অধিকারীমশাই আবার মহিলা তাঁবুতে এলেন। ততক্ষণে ওঁরা দু'জন

আমাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর তা দেখে অধিকারীমশাই বেশ খু হলেন। এবং বললেন, ছোটরানী আর কৃষ্ণা তোমাকে প্রায় তৈরি করে এনেছে। অ খানিকক্ষণ খাটলেই হয়ে যাবে। তাছাড়া আগামীকালের পুরো দিনটা তো রয়েছে সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে মনে সাহস রেখো। আর তোমার সং ঠেটারের অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ো। এখন চলি। ওদিকে অনেক কাজ রয়েছে। আ আবার কাল সকালে আসব।

পরদিন রাত্রে দেখলাম চরনসিপুর জমিদার বাড়ির যাত্রাপালা শুরুর ধরন-ধার কিছু আলাদা। রাত প্রায় ন'টায় জমিদার বাড়ি থেকে আমাদের জন্য জলযোগে ব্যবস্থা করা হল। গরম গরম লুচি, তরকারি আর মিষ্টি দিয়ে। সাজ-সজ্জার প পালা শুরু হল আরও পরে, এবং শেষ হতে হতে রাতও শেষ। বোধহয় দূরা দর্শকদের যাত্রা শেষে বাড়ি ফেরার সুবিধার কথা চিন্তা করেই অমন ব্যবস্থার হয়েছিল।

যাত্রা শোনা আর যাত্রা করার মধ্যে যে কী বিরাট ব্যবধান, কনসার্ট বেজে ওঠা সঙ্গে সঙ্গেই আমি তা দুরু দুরু বক্ষে অনুভব করেছিলাম। তারপর শুরু হয়েছি পালা এবং তা চলেছিল ভোর রাত অবধি।

শেষে বিশ্বামিত্র মুনির ক্রোধানলে রাজা, রানী এবং রাজপুত্রের অশেষ দুর্গ ভোগের পর শেষ দৃশ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন রাজপুত্র রোহিতাশ্বের মাথায় রাজমু পরিয়ে দিলেন, পুবের আকাশ তখন ফিকে লাল হয়ে ওঠেছে।

যাত্রাশেষে অধিকারীমশাই আমার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন। যদিও প্রশংসার সবটুকুই প্রাপ্য রানীদিদি এবং কৃষ্ণার। ওঁদের আন্তরিক এবং ঐকা প্রচেষ্টার ফলেই পালায় আমি উতরে গেছি।

অধিকারীমশাইয়ের 'একটা রাতের ব্যাপার' শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং খাওয়া সেরে ওঁর কাছে আমি বিদায় নিতে গেলাম। কিন্তু বিদায় চাইতেই উনি অ আমতা করতে লাগলেন। এবং শেষে বললেন, দেখ দীপক, কৃষ্ণা এখনও সুস্থ ওঠেনি। ওর আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। অবশ্য ওর জন্য আমি ওষুধ প ব্যবস্থা করেছি। এবং আশা করছি দু'চারদিনের মধ্যেই ও সেরে উঠবে। তাই বরং আর ক'টা দিন আমাদের সঙ্গে থেকে যাও।

তা বার বার যখন জ্বর আসছে, তবে তো ওকে কোন ডাক্তার বা কবরে দেখানো দরকার।

আমার কথা শুনে উনি হাত নেড়ে বললেন, আরে না, না। তার কোন প্রয়ে নেই। ওর ম্যালেরিয়া হয়েছে। আর তার জন্য ওকে আমি একেবারে অব্যর্থ আনিয়ে দিয়েছি। খাঁটি কুইনাইনে প্রস্তুত চাঁদ মার্কা পাঁচন। দু'চার দিন খেলেই ে ম্যালেরিয়া বাপ্ বাপ্ বলে পালিয়েছে।

একটু থেমে অধিকারীমশাই বললেন, আসলে তুমি নতুন এসেছ তো

এখানকার ব্যাপার-স্যাপার তোমার অজানা। এই যাত্রাদলের মেয়েদের কখনো ডাক্তার-কবরেজের দরকার হয় না। এদের জান বড় শক্ত। এরা দু'চার দিন ভোগে, দলকে ভোগায়, আবার সেরেও ওঠে। এদের তেমন কিছু হয় না।

অধিকারী মশাইয়ের কথা শুনে আমি ভাবলাম, সত্যিই তো, যাত্রাদলে আমি নতুন। সে কারণ এখানকার ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমার অজানা। এখানকার মেয়েদের জান ঠিক কতটা শক্ত সে বিষয়েও আমার কোন ধারণা নেই। এরা যে অসুখ-বিসুখে ভোগে, অথচ বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকেও এদের তেমন কিছু হয় না, এসব তথ্য ও আমার অজানা। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে ওঁকে আমি বললাম, তাহলে আমি এখন আসি।

উনি বললেন, হ্যাঁ, এসো। সারারাত জেগেছ। নিজের তাঁবুতে যেয়ে এখন বিশ্রাম করগে। আর শোন। যাওয়ার পথে একবার কৃষ্ণাকে দেখে যেও।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তারপর উনি আবার বললেন, শুনেছ বোধহয়, আজ বিকেলেই আমরা বন নসিপুরে রওনা হচ্ছি। ওখানকার মস্ত বড় মহাজন হরিকৃষ্ণ পোদ্দার মশাইয়ের বাড়িতে আমাদের বায়না আছে।

আমি বললাম, আজ্ঞা, শুনেছি।

তো মহিলা তাঁবুতে ঢুকে দেখলাম, কৃষ্ণা এককোণে কম্বল-মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুমন্ত মুখখানা খুশিতে ভরা। বোধ হয় ও স্বপ্ন দেখছে। সুখ স্বপ্ন।

যা হোক, একটু অপেক্ষা করে আমি কৃষ্ণাকে ডাকলাম। বললাম, কৃষ্ণা ওঠ। কিন্তু ওর তরফ থেকে কোন সাড়া পেলাম না। আমি আবার ওকে ডাকলাম। বললাম, সখী ওঠ। এই অবেলায় ঘুম কিসের! কিন্তু কোন সাড়া নেই।

শকুন্তলা পাশেই সতরঞ্চির ওপর বসেছিলেন। সমুখে আয়না রেখে উনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে উনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ও বুঝি তোমার সখী?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

উনি বললেন, বাব্বা! এই দু'দিনেই তুমি সখী পেয়ে গেছ। তা দেখেশুনে চলো, বাছা। অপেরার জমিতে বড় কাদা। যেন পা পিছলে না যায়!

আমি বললাম, না, না, পা পিছলোবে কেন। এখানে কাদা নেই।

উনি বললেন, সব কাদা কী আর চোখে দেখা যায়? আমি তোমাকে সাবধানে চলতে বলছি। সেই কথায় বলে না, সাবধানের মার নেই।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তা অমন মিনমিনে গলায় ডাকলে কী আর কারো ঘুম ভাঙে? জোরে ডাক, জোরে।

না জাগলে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দাও। মেয়েমানুষের অত ঘুম ভাল নয়, বাপু!

একটু থেমে উনি আবার বললেন, হয়েছে তো একটু জ্বর। তাতে আবার অত আদিখ্যেতা কিসের? যত্তোসব—! উনি আপন মনেই গজগজ করতে লাগলেন।

যাহোক, শকুন্তলার কথা মতো আমি এবার একটু গলা চড়িয়েই ডাকলাম কৃষ্ণাকে। আর তাতে কাজও হল। কৃষ্ণার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই ও কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওকে দেখে আমার মনে হল, এই মুহূর্তে ওর মন বুঝি অন্য কোন জগতে বিচরণ করছে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ, সখী?

আমার কথায় কৃষ্ণা সম্বিত ফিরে পেল। বলল, কে সখা? এসো এসো। আমার পাশে এসে বোসো।

আমি ওর পাশে যেয়ে বসলাম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচন খেয়েছ?

ও উত্তর দিল, হ্যাঁ, গিলেছি। জ্বর কিছুটা কমেছে। মনে হয় দু'এক দিনের মধ্যে ছেড়ে ও যাবে। তবে তা পাঁচনের গুনে নয়। ওর ওই বিটকেল গন্ধ সহ্য করতে না পেরে জ্বর আমায় ছেড়ে পালাবে।

খুবই বিটকেল বুঝি?

সে আর বলতে! বেটা পেটে ঢুকেই মোচড় লাগায়। তখন গা গোলায়। বমি হওয়ার উপক্রম হয়।

একটু থেমে কৃষ্ণা আমায় জিজ্ঞাসা করল, তা তোমার খবর কী? অধিকারী কাকা ছাড়েন নি তো?

না, ছাড়েন নি।

আমি জানতাম, তোমায় উনি সহজে ছাড়বেন না।

কেন, ছাড়বেন না কেন?

ওমা! আমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তোমায় উনি ছাড়েন কেমন করে?

এসেছ যখন, থেকেই যাওনা। যাত্রাদলের মেয়েদের জীবন বেত্তান্তটা জেনেই যাও না।

আমি থেকে যাব। আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবে, এই তো?

ও মা! আমার সুখস্বপ্নের সংবাদ তোমায় কে দিলে, সখা?

ও আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়েই বুঝতে পেরেছি।

তাই? তা আমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে তুমি আর কি বুঝতে পেরেছ, শুনি?

আরো বুঝতে পেরেছি যে মনটা তোমার চোত-বোশেখের শিমুল তুলোর মতোই আকাশে উড়তে চায়। কিন্তু পারে না। কঠোর বাস্তব এসে সামনে দাঁড়ায়। শেকলে টান পড়ে। কিন্তু তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, সুযোগ পেয়ে মনটা তোমার আকাশে ডানা মেলে।

তারপর উড়তে উড়তে চলে যায় সুদূরের স্বপ্নলোকে। আমি চুপ করতেই বলে ঠল কৃষ্ণা।

এবং পর মুহূর্তেই ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সখা, স্বপ্ন লোকের রাজপুত্তুর ার রাজকন্যেরা যদি এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসত, তাহলে কেমন হত?

পুরো ব্যাপারটাই মাটি হয়ে যেত। আমি উত্তর দিলাম।

মুচকি হেসে কৃষ্ণা বলল, হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক। আসলে আমাদের এই মাটির থিবীর সঙ্গে স্বপ্নলোকের কোন সাদৃশ্যই নেই।

একটু থেমে কৃষ্ণা বলল, কোথায় স্বপ্নালু পরিবেশের দেশ সুদূরের ওই স্বপ্নলোক, ার কোথায় প্রখর সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত আমাদের এই মাটির পৃথিবী! কত তফাত!

সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু তার চেয়েও অধিক সুন্দর সুদূরের ওই াপ্নলোক। স্বপ্নলোকে যেমন প্রখর দাবদাহের প্রবেশ নিষেধ, তেমনি আবার কনকনে াণ্ডারও সেথায় ঢুকতে মানা। আর তাই তো সেথায় চিরবসন্ত বিরাজ করে। প্রখর র্যালোক যেমন সেই লোকে পৌঁছয় না, তেমনি আবার নিকষ কালো আঁধারও সেথায় াবেশের পথ খুঁজে পায় না। আর তাই তো সেথায় সৃষ্টি হয়েছে এক সুন্দর স্বপ্নালু ারিবেশ। আর সেই স্বপ্নালু পরিবেশে ঘটে কত রকমের সব অলৌকিক ঘটনা।

একটু থেমে কৃষ্ণা বলল, স্বপ্নলোকের সবপুরুষই সুন্দর, সব নারীই সুন্দরী। ফুলে ফলে ফসলে আর সুমিষ্ট শীতল জলে সমৃদ্ধ সেই লোক। সেথায় হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, নেই কোন ভেদাভেদ। নেই সেথায় বীভৎস কামনা বাসনা। সেখানকার সরল াদাসিধে মানুষগুলো একে অপরকে ভালবাসে। আর তাই তো অপার শান্তির দেশ সেই সুদূরের স্বপ্নলোক।

হঠাৎ আমার মুখের পানে চেয়ে কৃষ্ণা প্রশ্ন করল, আচ্ছা সখা, তুমি কখনো গেছ দূরের ওই স্বপ্নলোকে?

না সখী, তোমার ওই স্বপ্নলোকের ঠিকানা আমার জানা নেই। জানা থাকলে একবার যতাম সেথায়।

কৃষ্ণা বলল, আসল ব্যাপারটা কী জান, সখা? আসল ব্যাপারটা হল, এক এক দিন, এক এক সময় আমাদের মনটা বড় প্রশান্তিতে ভরা থাকে। আর ঠিক সেই ময়ে যদি আমরা সুষুপ্তিতে মগ্ন হতে পারি, তাহলেই আমাদের মন কল্পনার ডানায় র করে সুদূরের সেই স্বপ্নালু পরিবেশের দেশ স্বপ্নলোকে যেয়ে হাজির হয়। একবার সেখানে যেয়ে পৌঁছলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু তা তো আর হওয়ার য়। ফিরে যে আসতেই হয়!

কৃষ্ণার স্বপ্নলোক সম্বন্ধীয় কথাগুলো আমার ঠিক বোধগম্য হল না। আমি বিস্ময়বোধ করলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইলাম। আর তা দেখে কৃষ্ণা বলল, তুমি এতেই অবাক হলে, সখা! ওখানকার আরও বৃত্তান্ত রয়েছে যে!

বেশ তো, বল শুনি।

জান, ওখানকার এক রাখালছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব। ছেলেটি গরু চরায়।

ওর গরুগুলো যখন মাঠে চরে বেড়ায়, ও তখন ছায়া শীতল গাছতলায় বসে বাঁশী বাজায়। ওর বাঁশীর সুর আমাকে আকর্ষণ করে। আমি ছুটে যাই ওর কাছে। ও বাঁশী বাজায়, আমি নাচি। ওকে আমি ভালবাসি, সখা।

তারপর মুচকি হেসে কৃষ্ণা বলল, ওকে তুমি ঈর্ষা কোরো না, সখা। আমি তোমাকেও ভালবাসি। খুব ভালেবাসি। তুমি যে আমার সখা!

আমি বললাম, আচ্ছা, তোমার নাচ কী শুধু ওই স্বপনপুরীর রাখালছেলের জন্য? আমার জন্য নয়? আমার জন্য তুমি নাচতে পার না?

কৃষ্ণা বলল, এই যাত্রাদলে থাকলে তুমি আমার অনেক নাচ দেখতে পাবে। আমার অনেক গান শুনতে পাবে

সে নাচ-গান তো সব'র জন্য।

শুধু আমার জন্য তুমি নাচতে পার না? শুধু আমার জন্য তুমি গাইতে পার না?

কৃষ্ণা উত্তর দিল, বেশ তো, শুধু তোমার জন্যই আমি নাচব। শুধু তোমার জন্যই আমি গাইব। আগে আমায় একটু সুস্থ হয়ে উঠতে দাও।

এমন সময় রমার মা একবাটি গরম সাবু নিয়ে এসে কৃষ্ণাকে বলল, এটুকু খেয়ে নাও, দিদি। নুন আর লেবু দিয়ে এনেছি। খেতে ভালই লাগবে।

কিন্তু রমার মায়ের কথায় কৃষ্ণা চটে উঠল। রাগতস্বরে বলল, কে তোমায় সাবু আনতে বলেছে, শুনি? নিয়ে যাও তোমার ওই সাবুর বাটি আমার সমুখ থেকে. আমি সাবু খাব না।

ওমা, সে কি কথা গো! সাগু খাবে না তো কী খাবে? জ্বর হলে তো লোকে সাগুই খায়। এ ক'দিন তো সাগুই খেয়েছ, দিদি. আজ আবার মেজাজ অমন তিরিক্ষে হল কেন? নাও দিদি, এটুকু—?

কথার মাঝেই গণেশ বলে উঠল, দাঁড়ান কাকা, দাঁড়ান। আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি!

বেশ, বল। বললেন অগস্ত্যক

গণেশ বলল, দেখুন কাকা, আপনার আখ্যায়িকার প্রথম দিকে কৃষ্ণাকে আমরা একজন বাস্তববাদী মেয়ে বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন ওর মুখ থেকে আমরা বেশ কিছু অবাস্তব এবং অমূলক কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি.

একটু থেমে গণেশ আবার বলল, আমরা জানি যে নিদ্রিত অবস্থায় সকলেই স্বপ্ন দেখে। এবং সকলেই জানে যে স্বপ্নের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। স্বপ্ন নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ানুভব মাত্র। সে কারণে স্বপ্ন সব সময়েই মূলশূন্য, আদিকারণশূন্য, অবস্তুগত এবং অপ্রামাণিক হয়ে থাকে। তাছাড়া স্বপ্নের কোন পৌনঃপুনিকতা বা ধারাবাহিকতা থাকে না

কৃষ্ণা স্বপ্ন দেখে। এটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে ওর স্বপ্ন কী বারংবার অমন সুনির্দিষ্ট রূপ পেতে পারে? স্বপ্নে ও একেবারে ওর কল্পনার স্বপ্নলোকে যেয়ে হাজির হয় এবং তথাকার এক রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হয়ে নৃত্য করতে থাকে। আচ্ছা,

স্বপ্নে কী অমন সুনির্দিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক দর্শন সম্ভব? আর কৃষ্ণার মতো একজন বাস্তববাদী মেয়ের মুখে এইসব অবাস্তব এবং অমূলক কথাবার্তা মানায় কী?

গণেশের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বললেন, শোন বাপু। সেইসময় কৃষ্ণার মুখে তার স্বপ্নদর্শন এবং স্বপ্নলোক সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনে আমিও বিস্ময়বোধ করেছিলাম। এবং তখন আমারও মনে হয়েছিল যে স্বপ্নে অমনটা ঘটতে পারে না। কিন্তু তবুও, পরে আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছিলাম। এবং একসময় আমার মনে হয়েছিল যে অমন সুনির্দিষ্ট না হোক, অমন পৌনঃপুনিক না হোক, অমন ধারাবাহিক না হোক, সাধারণভাবে সব মানুষই স্বপ্ন দেখে। তবে কৃষ্ণার স্বপ্নদর্শনের ব্যাপারটা হয়তো এক বিরল ব্যতিক্রম। আর তা যদি হয় তবে কৃষ্ণার ওইরূপ স্বপ্নদর্শন এবং তা থেকে পাওয়া স্বর্গীয় আনন্দ যে কোন ধনবানেরও ঈর্ষার ধন। হোক না তা যতই ক্ষণস্থায়ী। মানুষের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেই বা দীর্ঘস্থায়ী হয়?

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, ভাগ্যদোষে ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া জীবনে জড়িয়ে পড়া কৃষ্ণার শিল্পীসুলভ মন সুষুপ্তিকালে তার কল্পনার স্বপ্নলোকে যেয়ে হাজির হত। এবং তথাকার এক রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হয়ে সে নৃত্যরতা হত। আর তাতেই তার শিল্পী মন অফুরন্ত আনন্দ পেত। অপার তৃপ্তি লাভ করত। কারণ, সে ছিল এক সত্যিকারের জাত শিল্পী।

আচ্ছা বলতো, কজন শিল্পী-কন্যার মন অমন কল্পনার স্বপ্নলোকে পৌঁছতে পারে? ক'জন শিল্পী-কন্যার মনে অমন নির্মল আনন্দ লাভ ঘটতে পারে? ক'জন শিল্পী-কন্যার মনে অমন অপার তৃপ্তিলাভ হতে পারে?

দেখ, সব মানুষই স্বপ্ন দেখে। কারণ সব মানুষের মনেই কিছু অপূর্ণ কামনা-বাসনা থাকে, কিছু অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেইসব অপূর্ণ কামনা-বাসনা, অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম প্রধানতঃ কঠোর বাস্তবের কঠিন অভিঘাতে, এবং তাদের অবস্থান মানুষের অবচেতন মনে। আর তারই প্রতিফলন ঘটে মানুষের সুষুপ্তিকালের স্বপ্নে। আর সেই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষের স্বপ্নদর্শন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

ধর, যে ব্যক্তি কৃপন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা হল যেন তেন প্রকারে ধনের পুঞ্জীভূত করণ আর তাই সে বারংবার স্বপ্ন দেখে সেই ধন নিয়ে। যে ব্যক্তি মাতাল, তার কামনা-বাসনা হল ভরপেট সুরা সেবন। তাই যে প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখে সেই সুরা নিয়ে। যে ব্যক্তি গাঁটকাটা, তার ইচ্ছা, তার প্রত্যাশা হল অপরের গাঁটকাটা। তার স্বপ্নেও তাই বারবার ফুটে ওঠে অপরের গাঁটচিত্র।

আর সবশেষে বলি যে কোন বাস্তববাদী মানুষের সুখস্বপ্ন দর্শনের ওপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আছে বলে আমার জানা নেই।

আগন্তুক চুপ করতেই এক মাথা মোটা যুবক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না, না, এ ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। আর থাকলেও আমরা তা মানব না। কৃষ্ণার মতন আমরাও সুখস্বপ্ন দর্শন করে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করতে চাই।

একথা শুনে রামলোচন খুড়ো বলে উঠলেন, আঃপসু! তুই থাম দেখি। তোর যত খুশি সুখস্বপ্ন দর্শন করে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিস। কেউ তোকে বাধা দেবে না।

কেউ বাধা দেবে না তো? ব্যস, তাহলেই হল!

তবে খুড়ো, আমার নামের ব্যাপারে একটা আর্জি আছে তোমার কাছে।

বেশ তো, বল।

দেখ খুড়ো, পটে আঁকা ছবির মতন আমার রূপ ছিল বলে বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন পটসুন্দর। অথচ তোমরা আমার সেই সুন্দর নামটাকে ছাঁটকাট করতে করতে শেষে ওটাকে একেবারে পসু-তে এনে দাঁড় করিয়েছে। এটা কিন্তু আমার মোটেও পছন্দ নয়। আমি চাই যে আমার বাপ মায়ের দেওয়া পট সুন্দর নামেই আমাকে ডাকা হোক।

রহিম সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি পটসুন্দরের আর্জি মঞ্জুর করার জন্য জোর সুপারিশ করছি।

একথা শুনে খুড়ো উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন, আর্জি মঞ্জুর করা হল। এখন থেকে আমরা ওকে পটসুন্দর নামেই ডাকব।

অতি সহজে আর্জি মঞ্জুর হওয়ায় পটসুন্দরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রহিমের দিকে চেয়েও বিজয়ীর হাসি হাসল। কারণ, রহিম ওর অনেক দিনের বন্ধু যে!

রামলোচন খুড়ো বললেন, গণেশ, রহিম, পটসুন্দর, তোরা আর কথার মাঝে বাগড়া দিস নে। রাত বাড়ছে, শীত বাড়ছে, ঘরে বৌমারা একা রয়েছে।

গণেশ বলল, চিন্তার কিছু নেই, খুড়ো। আমাদের প্রত্যেকের ঘরেই মা, পিসি, খুড়ী, এঁরা রয়েছেন। তাছাড়া কাল রবিবার, খাজাঞ্চীখানা বন্ধ। আমার ছুটি।

নাও ভায়া, তোমার আখ্যান শুরু কর। বললেন রামলোচন খুড়ো।

আগন্তুক বললেন, তো শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণা সাবু খেল। আমার হাতে খেল। আর তা দেখে ফোকলা দাঁতে হেসে রমার মা বলল, মিতের হাতে সাগু খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে সেকথা আগে বললেই হত। শুধু শুধু অমন তিরিক্ষে মেজাজ করতে গেলে কেন দিদি?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণা চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে রমার মা আপন মনেই বলতে লাগল, যে বয়সের যা। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কারণে হাসে আবার অকারণেও হাসে। কারণে কথা বলে আবার অকারণেও কথা বলে। এরা কারণে চঞ্চল হয়, আবার অকারণেও চঞ্চল হয়। এদের মেজাজ এই গরম হল তো পরক্ষণেই আবার ঠাণ্ডা। আসলে এরা সব যৈবনের দিকে পা বাড়ায় কিনা, তাই।

কৃষ্ণা চুপ করে বসে রইল।

তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমার মা আবার শুরু করল, যদ্দিন যৈবন, তদ্দিনই সব। যৈবন গেল তো সব গেল। আর তাই তো রমার বাপ আমারে বলত, আদুরী, যৈবন থাকতে থাকতে সখ-আহ্লাদ সব মিটিয়ে নে। নইলে পরে পস্তাবি।

তো এতক্ষণ পরে কৃষ্ণা কথা বলল। তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে ও রমার মাকে জিজ্ঞাসা

করল, তা তুমি রমার বাবার কথামতো চলেছিলে তো? যৈবন থাকতে থাকতে তুমি খ-আহ্লাদ সব মিটিয়ে নিয়েছিলে তো?

বেদনার্ত কণ্ঠে রমার মা উত্তর দিল, আমার যেমন পোড়া কপাল! বলি তেমনটা মার হল কই, দিদি? গোটা যৈবনকালটা আর আমি মিনসেকে কাছে পেলাম কই? বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই রমা ভূমিষ্ঠ হল। আনন্দে সেদিন হাসলাম। আর তার ক'দিন পরেই মিনসে সঙ্গে গেল। আমি কাঁদতে বসলাম। তো সে কান্না আর শেষ লে কই! আজও আমি কেঁদে চলেছি, দিদি।

থাক, থাক, ওসব কথা থাক। তুমি অন্য কথা বল।

অন্য কথা আর কি বলব, দিদি? তবে হ্যাঁ, একটা সত্যি কথা বলি। এই দু'দিনের ধ্যেই তোমাদের দু'জনার ভাব-ভালবাসা বড় গাঢ় হয়ে উঠেছে! দেখলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে মনে হয় যেন তোমরা একজোড়া শুক সারি।

না, না, রমার মা, আমরা শুকসারি হতে চাইনে। ওরা বড় অকারণে দ্বন্দ্বে মাতে।

তবে না হয় চকাচকি।

না, না, তা ও নয়। চক্রবাক মিথুনের জীবনে নিত্য বিরহ জ্বালা। সারাদিন ওরা দু'জন একসঙ্গে কাটায়। আনন্দে, অনুরাগে মেতে থাকে। কিন্তু যেই না সন্ধ্যে হয় অমনি চক্রবাক ডানা মেলে। উড়ে যেয়ে বসে সে নদীর ওপারের এক অতিউচ্চ টবৃক্ষের সুউচ্চ শাখে। এপারে অশ্বত্থ শাখে বসে চক্রবাকী সকাতরে ডাকে। বলে, চক্রবাক, তুমি ফিরে এসো। অন্ততপক্ষে একটা রাতের জন্য তুমি আমার কাছে থাক। আমি বিরহ কাতর। তুমি আমার বিরহ জ্বালা দূর কর। আমাকে সুখী কর। আমাকে শান্তি দাও, প্রিয়।

ছোট্ট নদীর ওপার হতে চক্রবাক ওর অক্ষমতার কথা বলে। বলে, তা যে হবার নয়, প্রিয়ে! আমরা যে শাপগ্রস্ত। একত্রে নিশিযাপন আমাদের ভাগ্যে নেই। তোমার বিরহ জ্বালা আমি আমার অন্তরে অনুভব করি। প্রতিরাতে তোমা তরে জ্বলে পুড়ে মরি!

থাক, থাক। তবে আর তোমাদের চকাচকি হয়ে কাজ নেই, বাছারা। তোমরা বরং যেমন আছ তেমনই থাক।

না গো রমার মা, তুমি অমন কথা বোলো না। বিহঙ্গমীরূপে জন্ম নেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। তাই পরজন্মে আমি আর সখা দু'জনে মিলে একজোড়া চকোর চকোরী হব। সারাদিন আমরা দু'জন একসাথে নীল আকাশে ভেসে বেড়াব। আর নির্জন নিশীথে আমরা দু'জন একসাথে জ্যোৎস্না পানে পরিতৃপ্ত হব। সেই হবে আমাদের দু'জনের সুখের জীবন। শান্তির জীবন। সুন্দর জীবন।

তোমার বিচিত্র সব স্বপ্নের মধ্যে এটাও কী একটা স্বপ্ন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, তা বলতে পার। উত্তর দিল কৃষ্ণা।

রমার মা বলল, ওমা! এ আবার তোমার কেমন স্বপ্ন? এর মধ্যে আবার সুন্দর কোথায় পেলে, দিদি? সারাদিন তোমরা দু'জনে আকাশময় উড়ে বেড়াবে আর রাত্তির বেলায় চাঁদের আলোয় পেট ভরাবে। তা এর মধ্যে আবার সুন্দর কী দেখলে তুমি?

আর এতে সুখই বা কী আর শান্তিই বা কোথায়? ওসব তো কাব্যিকথা। ওতে পেট ভরে না, দিদি। আর পেট না ভরলে সুখশান্তির দেখা মেলে না। সুন্দরও ধরা দেয় না। পেট ভরে খেতে পেলে তবেই না ওদের সাক্ষাৎ মেলে!

হঠাৎই বাস্তব এসে সমুখে দাঁড়াল। স্বপ্নভঙ্গ হল। যাদব আর জলিল তাঁবুতে ঢুকে বলল, দিদি ভাইরা এইবেলা তোমাদের বাক্স-প্যাঁটরা সব গুছিয়ে নাও গো। খাওয়া দাওয়ার পর তাঁবু গোটানো হবে। আমরা সব বননসিপুরে রওনা হব। ওখানে পোদ্দার বাবুদের বাড়িতে আমরা দিন তিনেক থাকব। দু'রাত্তির পালা হবে।

কৃষ্ণার দিয়ে চেয়ে জলিল বলল, কৃষ্ণা দিদি, জ্বরে ভুগে ভুগে তোমার চোখের কোণে কালি পড়েছে। 'শরীলে' রক্ত কমে গেছে। চোখ মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তোমার কিছুদিন কুলেখাড়ার ঝোল খাওয়া দরকার। 'শরীলে' রক্ত আসবে। বলতো যোগাড় করে এনে দেব। ডোবার ধারে অনেক হয়।

তাই এনে দিস, ভাই। আমি ওকে ঝোল করে দেব। সত্যিই মেয়েটার 'শরীলে' রক্ত কমে গেছে। বলল রমার মা।

তো দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হয়ে গেল বাক্স-প্যাঁটরা গোছানোর কাজ। তারপর অস্থায়ী ডেরা ভাঙার পালা। কীলক উদ্ধার, গ্রন্থি উন্মোচন। তারপর দণ্ড উৎপাটন অন্তে পাট করা হল তাঁবুগুলো। ভাঁজ করা হল জীর্ণ সতরঞ্চিগুলো। তারপর প্রত্যেকে তার নিজের নিজের বাক্স-প্যাঁটরা তুলে দিল গরুর গাড়িতে। দলের সাজ-সজ্জার বাক্স, রঙ তুলির বাক্স, ঝুটো অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স, পট্ট করা তাঁবু, ভাঁজ করা সতরঞ্চি, রান্নার সরঞ্জাম, সবকিছুই স্থান পেল গোযানে। সবশেষে পড়তি বেলায় চরনসিপুরের মায়া কাটিয়ে ছ'টি গোযান তাদের দশাসই ছ'টি গর্ভে পুরো দলটাকে পুরে নিয়ে, ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে চলল বননসিপুরের দিকে।

চরনসিপুর থেকে বননসিপুর। বননসিপুর থেকে হিজলপুর। তারপর নারায়নপুর। সেখান থেকে মজিদপুর। পালা গাইতে গাইতে এইভাবেই একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এগিয়ে চলল দল।

এইভাবে চলতে চলতে, থামতে থামতে, পালা গাইতে গাইতে কেটে গেল প্রায় দুটি মাস। ততদিনে আমি দলেরই একজন হয়ে গেছি। কিন্তু আমার চিরদিনের উড়ো মনটা মাঝেমাঝেই আবার উসখুস করে উঠতে লাগল। সে দাঁড়ায় বসে নির্ধারিত দানাপানি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। সে বাঁধন কাটতে চাইল। সে ডানা মেলতে চাইল। আর ঠিক সেই সময়েই একদিন পড়ন্ত বেলায় আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। ম্যালেরিয়া। বাংলার ঘরে ঘরে যার অবাধ গতি। যার চোখ রাঙানিতে বাংলার মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন অধিকারীমশাই, ছুটে এল কৃষ্ণা। ছুটে এলেন ছোটরানী। ছোটরানী ততদিনে আমার দিদি হয়ে গেছেন। আমি তার ছোটভাই। আর কৃষ্ণা? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। সে আমার মন বুঝতে শিখেছে, আমি তার। কিন্তু আমার সেই পনের-ষোল বছর বয়সেই আমি এটুকু বুঝতে

পেরেছিলাম যে আমাদের এই কৈশোরের সম্পর্ক যতই নিবিড় হোক না কেন, যৌবনে আমরা দু'জন কোনদিনও একজোড়া শুকসারি, চকাচকি কিংবা চকোর চকোরীর মতো জীবনে প্রবেশ করতে পারব না। কেন না আমার জুটি কৃষ্ণা নয়, লক্ষ্মী। আমি এও বুঝতে পেরেছিলাম যে একদিন না একদিন আমার উড়ো মনটা একবার প্রবলভাবে ডানা ঝটপট করে উঠবেই উঠবে। আর সেদিন সে বাঁধন কাটবে। সে উড়ে যাবে। আর কৃষ্ণা পড়ে থাকবে এই রটন্তী অপেরাতেই। এখানে থেকে তাকে চিরদিন যাযাবরের জীবন-যাপন করতে হবে। দুর্জন দাসের মতো দুষ্ট লোকদের রুখতে তাকে চিরদিন বেগ পেতে হবে। নিজেকে রক্ষা করতে তাকে প্রতিদিন নানা কলাকৌশলের আশ্রয় নিতে হবে, এই তার বিধিলিপি।

জলিল এই তল্লাটেরই লোক। অধিকারীমশাই তাকে ডেকে বললেন, যাও, যতশীঘ্র সম্ভব দীনবন্ধু কবরেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি এসে দেখেশুনে ওষুধ দিন। দিন কাল ভাল নয়। ও যাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে তার ব্যবস্থা কর।

ডাক্তার, কবরেজের কোন্ প্রয়োজন? আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে। আপনি বরং আমার জন্য দু-তিন শিশি পাঁচনের ব্যবস্থা করুন। আমি তাতেই সেরে উঠব। কৃষ্ণা তো পাঁচন খেয়েই সেরে উঠেছে। আমি ওঁকে বললাম।

কৃষ্ণার কথা থাক। ওর ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কয়েকশিশি চাঁদ মার্কাতেই ওর কাজ হয়েছে। কিন্তু তোমার জ্বরটাও যে ম্যালেরিয়া তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনে, বাপু।

তো সন্ধ্যে বেলায় কবরেজমশাই এলেন। নাড়ি ধরলেন, ভুঁড়ি টিপলেন এবং নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে উনি রায় দিলেন, জ্বরটা ম্যালেরিয়া, ততসহ শ্লেষ্মার প্রাবল্য। ক'দিন ভোগাবে।'

কবরেজ মশাই ওষুধ-পত্তর দিলেন, পথ্যের ব্যাপারে বললেন এবং রোজ কিছু ফল খাওয়ার উপদেশ দিলেন। আবার ওই কমলাপুরের মতো অজপাড়াগাঁয়ে যে ফল সংগ্রহের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে, উনি সেকথা জানাতেও ভুললেন না। এবং সবশেষে উনি বললেন, শোন সূর্যকান্ত এ গ্রামে তুমি যে ফলটি সবসময় হাতের কাছে পাবে সেটি হল বাতাপি লেবু। বড় উপকারী ফল। ফলটি চাইলেই পাবে পয়সা লাগবে না এ গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই বাতাপি লেবুর গাছ আছে। পর্যাপ্ত ফলে। আর এ তল্লাটের কোন গৃহস্থ বাতাপি লেবু বিক্রি করে না। এমনিতেই বিলোয়। ওই ফলের রস কিঞ্চিৎ পরিমাণ লবণ সহযোগে রোগীকে দু'বেলা পান করাবে। ওষুধ-পত্তর যা দিয়ে গেলাম ঠিকমতো খাওয়াবে। আর সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি রেখ না। আশাকরি দিন দশেকের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

তা কবরেজমশাইয়ের ওষুধ ধরল। দিন দশেকের মধ্যেই আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু সেকী শুধু ওষুধের গুনে? আমার তা মনে হল না। এই দশদিনে এঁদের কাছ

থেকে যে যত্ন-আত্তি, যে সেবা-শুশ্রূষা, যে স্নেহ-ভালবাসা আমি পেলাম, আমার রোগ নিরাময়ে ওষুধের চেয়ে তার প্রয়োজন বড় কম ছিল না।

আমি আরোগ্য লাভ করলাম। কিন্তু আমি ভুলতে পারলাম না শেষ জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমার জন্য জলিল ভাইয়ের সেই লেবু সংগ্রহের কথা। আমি ভুলতে পারলাম না স্নেহময়ী রানীদিদির ওই ক'টা দিনের নিপুন হাতের যত্ন-আত্তির কথা। আমি ভুলতে পারলাম না কৃষ্ণার সেই প্রাণঢালা সেবা-শুশ্রূষার কথা।

আমার প্রতি এঁদের নিবিড় স্নেহ ভালবাসা, এঁদের পরম আত্মীয়তা বোধ আমার কৈশোর মনে এক বড় রকমের ছাপ ফেলল। এঁদেরকে আমার বড় আপনজন বলে মনে হল। কৃষ্ণাকে আমার বড় ভাল লেগে গেল। ফলে এই কটা দিনের ব্যবধানে যাত্রাদল সম্বন্ধে আমার ধারণাটা একেবারে বদলে গেল। ভাবলাম, একা একা আর যত্রতত্র ছুটে না বেড়িয়ে এঁদের সঙ্গে যাযাবরের মতো কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলে তো বেশ হয়!

তো অনেক ভেবেচিন্তে শেষে একদিন সকালে কৃষ্ণাকে আমি এক নির্জন ঝিলের ধারে নিয়ে গেলাম। আর তারপর ওকে আমি আমার মনের সব কথা খুলে বললাম।

তো আমার কথা শুনে কৃষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ও বড়দের মতো মুখ করে বলল, দেখ সখা, এই যাত্রাদলে তুমি পাকাপাকিভাবে থেকে গেলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তা তো আর হবার নয়। কারণ, মুখে তুমি যাই বল না কেন, তোমার ওই বাউণ্ডুলে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই যাত্রাদলে তুমি পাকাপাকিভাবে থেকে যাবে, এমনটা আমি ভাবতে পারি না।

একটু থেমে কৃষ্ণা আবার জ্ঞানীজনের মতো বলল, দেখ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোও ছুটে বেড়ায়। কিন্তু তারা ছোটে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আর তারা সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছোয় একটা নির্দিষ্ট পথে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু তোমার ছুটোছুটি তো বিশৃঙ্খল ছুটোছুটি, লক্ষ্যভ্রষ্টের ছুটোছুটি!

তুমি কখনো ছোটো তোমার রতনকাকার বাড়িতে, কখনো লাতিমাসির খোঁজে। কখনো তুমি ছোটো দূর গাঁয়ের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে। কখনো লেঠেলদের কাছে ছোটো লাঠিখেলা শিখতে। আবার কখনো ছোটো তুমি জেলেদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে। তো এমনিভাবে ছুটতে ছুটতেই তো হঠাৎ একদিন তুমি আমাদের মাঝে এসে পড়েছ।

কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণা আবার বলল, দেখ, যাত্রার মরসুম শেষ হয়ে গেছে। নেহাৎ আকাশে এবার তেমন মেঘের আনাগোনা নেই তাই বাবুদের অনুরোধে আষাঢ়ের প্রথম দিকের কয়েকটা দিনে দু'একটা পালা গাওয়া গেল। এটা কিন্তু নিয়ম নয়। নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠশেষে যাত্রার মরসুম শেষ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় সেই আশ্বিনে। মায়ের বোধনের শুভদিনে।

তো আমি বলি কী, মরসুম যখন শেষ হয়ে গেছে, ঘরের ছেলে এবার ঘরে

ফিরে যাও। ঘরে ফিরে যেয়ে লেখাপড়ায় মন দাও। কাজে-কামে মন দাও। দু'একটা পাশ দাও। তারপর নিজের কর্মক্ষেত্র নিজে বেছে নিও। আর সবশেষে একটা বিয়ে করে ঘোরতর সংসারী বনে যেও। তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।

আমার মঙ্গলচিন্তা আমাকেই করতে দাও। শোন, এই যাত্রাদলে আমি পাকাপাকি ভাবে থেকে যেতে চাই, বুঝলে?

বেশ তো, থেকে যাও। সূর্যকান্ত দাস মশাইকে বল সে কথা। এই যাত্রাদলে ওঁর কথাই তো শেষ কথা। উনি রাজী হলে থেকে যাও। তোমাকে তো উনি বেশ পছন্দ করেন।

কেন, তুমি আমাকে পছন্দ কর না?

না, করি না।

কিন্তু এই কিছুদিন আগে ও তো তুমি আমাকে এই যাত্রাদলে থেকে যেতে বলেছিলে।

তখন তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল, তাই বলেছিলাম।

এখন আমাকে আর তোমার প্রয়োজন নেই বুঝি?

না, নেই।

তাহলে এখন তোমার কাকে প্রয়োজন? ওই মাতাল দুর্জন দাসকে?

চুপ কর! সুজন মাতাল সে কথা সবাই জানে। কিন্তু ওর মতো সু-অভিনেতা যাত্রাজগতে ক'জন আছে বলতে পার?

শুনলাম ও নাকি তোমায় রাজরানী করতে চায়?

তুমি ঠিকই শুনেছ। সুজন আমাকে ওর জীবন সঙ্গিনী করতে চায়। ও আমাকে সুখ দিতে চায়, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চায়। ওআমাকে ঘর দিতে চায়, সন্তান দিতে চায়। এই মুহূর্তে পারবে তুমি আমাকে ওইসব দিতে? আছে তোমার সে ক্ষমতা?

কৃষ্ণার ছুড়ে দেওয়া রূঢ় প্রশ্নগুলো আমায় বড় আঘাত করল। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আসলে আমার কাছে ওগুলোর কোন উত্তর ছিল না। ছল ছল চোখে আমি তাই মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, লক্ষ্মী কে?

কৃষ্ণার এবারের প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম। চকিতে ওর মুখের পানে চেয়ে আমি মুখ নামিয়ে নিলাম।

কৃষ্ণা বলল, লক্ষ্মী ভাগ্যবতী। ওর ভাগ্যকে আমার ঈর্ষা হয়।

আমি মাথা তুললাম। কৃষ্ণার মুখের পানে চেয়ে ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লক্ষ্মীর কথা তুমি কী করে জানলে?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণা বলল, লক্ষ্মী তোমার সারা মন জুড়ে রয়েছে। সেখানে কৃষ্ণার কোন স্থান নেই।

কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না তো! লক্ষ্মীর কথা তুমি কী করে জানলে?

একদিন রাত্রে তোমার অসুখের বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল। সে রাত্রে বারবার শুধু তুমি তোমার মাকে ডেকেছিলে, আর লক্ষ্মীকে ডেকেছিলে। লক্ষ্মী ভেবে আমাকে

তুমি বারবার কাছে টেনে নিয়েছিলে। লক্ষ্মীর সব ইচ্ছা তুমি পূরণ করে দিতে চাইছিলে।

ব্যাপারটা ভুলে যাও। আমি আমার মত বদল করেছি। আমি তোমাকে চাই। লক্ষ্মীকে নয়। এই যাত্রাদলে আমি পাকাপাকি ভাবে থেকে যেতে চাই। আর তোমাকে আমি সব সময় আমার পাশে পেতে চাই। চিরদিনের মতো তোমাকে আমি আমার পাশে পেতে চাই।

আর লক্ষ্মী? ওর কী হবে?

লক্ষ্মীর বাবা বড়লোক। লক্ষ্মী ও বাড়ির একমাত্র মেয়ে। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ের পাত্রের অভাব হবে না।

তোমার মতো চঞ্চলমতি ছেলের মুখেই এমন কথা মানায় বটে! চাপাস্বরে বলল কৃষ্ণা কী বললে?

কিছু না। যাত্রার মরসুম শেষ হয়ে গেছে। এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও।

না, আমি ঘরে ফিরে যেতে চাইনে। আমি এখানেই থেকে যেতে চাই। আর তোমাকে আমি চিরদিনের মতো আমার পাশে পেতে চাই, বুঝেছ? গলা চড়িয়ে বললাম আমি।

আমি কিচ্ছু বুঝিনি। আমি কিচ্ছু বুঝতে চাইনে। আমি চাই তুমি ঘরে ফিরে যাও বুঝলে? কৃষ্ণাও গলা চড়াল।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ও আর ফিরেও চাইল না। ও চলে গেল। ওই নির্জন ঝিলের ধারে আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। হাজারো প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করে আসতে লাগল।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। নানান চিন্তা, নানান প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল। পাশেই অধিকারীমশাইয়ের তাঁবু। সেখান থেকে বিশেষ কায়দায় এবং বিশেষ যত্নে রক্ষিত ওঁর প্রিয় দেওয়াল ঘড়িটা চুলচেরা হিসাব কষে কষে দিবি সময় ঘোষণা করে চলেছিল। অথচ বিছানায় শুয়ে শত চেষ্টাতেও আমি আমার হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। আবার কোথায় যে গরমিল তাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। রাত বেড়ে চলেছিল।

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমার চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় রমেন খুব পাকাপাকা কথা বলত। রমেন বলত, নারী যখন মাতা তখন সে দেবী। তখন সে করুণাময়ী। সে কল্যাণময়ী। কিন্তু নারী যখন প্রিয়া, তখন সে ছলনাময়ী। সে রহস্যময়ী। সুতরাং প্রিয়ারূপ নারী থেকে সাবধান!

শুনেছি, মন মানুষের বন্ধু। আবার কখনও সেই শত্রু। মানুষের মন মানুষকে সুবুদ্ধি দেয়। আবার কখনও কুবুদ্ধি। কখনও মানুষকে সে সুপথে চালিত করে। আবার কখনও কুপথে।

তো অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমি আমার মনকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মন বলতো, গত দু'মাসের মেলামেশায় কৃষ্ণা কী আমার প্রিয়া হয়ে ওঠেনি?

আমার প্রশ্ন শুনে মন প্রথমে গাঁইগুই করতে লাগল। আমার প্রশ্নটাকে সে এড়িয়ে যেতে চাইল। শেষে সে আমতা আমতা করে বলল, দেখবন্ধু, স্ত্রী-চরিত্র বড় গোলমেলে হয়ে থাকে। ব্যাপারটা বড়ই ভজকট আর কি! আর সেই কারণেই স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে জ্ঞানীজনেরা পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ধান্দা খোঁজেন। আর বেশি চাপাচাপি করলে তখন তাঁরা সোজা উত্তরটাই দিয়ে থাকেন, "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

কিন্তু দেখ, কৃষ্ণা যে আমায় ভালবাসে সেকথা ও আমায় বারবার বলেছে। অন্য কেউ না জানুক, তুমি তো জান যে কতদিন কত নির্জন প্রান্তরে কৃষ্ণা আমার বাঁশীর সুরে গেয়েছে। আমার ঢোলকের তালে, নূপুর পায়ে ও নেচেছে। এই ক'দিন আগেও আমাকে ও এই যাত্রাদলে থেকে যেতে বলেছে। অথচ দেখ, আজ আমি যখন এই যাত্রাদলে পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে চাইলাম, ওই রহস্যময়ী নারী আমাকে ঘরে ফিরে যেতে বলল। আজ আমি যখন ওকে চিরদিনের জন্য আমার পাশে পেতে চাইলাম, ওই ছলনাময়ী নারী আমায় বড় কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করল। ও ওই ধনীপুত্র, পঁড় মাতাল দুর্জন দাসের প্রলোভনে সাড়া দিল। কেননা, ওই দুর্জন দাস নাকি ওকে জীবন সঙ্গিনী করতে চায়। সে নাকি ওকে সুখ দিতে চায়, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চায়, ঘর দিতে চায়, সন্তান দিতে চায়। একজন স্বার্থান্বেষী নারীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ওই মাতালটা পূরণ করে দিতে চায়।

আমার কথা শুনে মন বলে উঠল, কৃষ্ণা তো ঠিক কাজই করেছে, বন্ধু অতসব প্রার্থিব-প্রাপ্তি অগ্রাহ্য করে কোন্ নারীই বা তার ঠুনকো প্রেমকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় বল? তাছাড়া আসল ব্যাপারটা তো তুমিও বোঝ আর আমিও বুঝি যে ঘর ছাড়া, ছন্নছাড়া কৃষ্ণা এতদিন ধরে যে পরশ পাথর খুঁজে ফিরছিল, আজ তা সে পেয়ে গেছে। জানতো, ওই দুর্জন দাসের বাবা কিন্তু খুবই বড় লোক তো সেই অতবড় পয়সাওয়ালা লোকের বেটার পাশে তুমি? কি যে বল, বন্ধু!

কিন্তু তাই বলে কৃষ্ণা ওই মাতালটার সঙ্গে—?

মাতাল হতেও অনেক পয়সা লাগে, বন্ধু

একটু থেমে মন আবার বলল, আসল ব্যাপারটা কী জান, বন্ধু? আসল ব্যাপারটা হল, তুমি এখন তোমার ভুলের মাশুল গুনছ

ভুল? সে কী কথা! কী ভুল করলাম আমি?

ভুলটা করেছ তুমি তোমার অসুখের সময়। ভেবে দেখ। ব্যাপারটা একবার বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। তোমার অসুখের সময় কৃষ্ণা তোমার বড় কাছাকাছি এসে পড়েছিল। একান্ত আপন জনের মতো সে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিল। আর ঠিক তখনই তুমি তোমার অজান্তে ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়েছ আর ঠিক তখন থেকেই মূর্খের মতো তুমি কৃষ্ণাকে তোমার প্রিয়া বলে ভাবতে শুরু করেছ আর সেই জন্যই ওর প্রত্যাখ্যানে আজ তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ।

হ্যাঁ, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এখন আমি কী করি বলতো?

কী আবার করবে? বেরিয়ে পড়!

বেরিয়ে পড়ব! কিন্তু যাব কোথায়? এই মুহূর্তে আমার পক্ষে তো আর ঘরে ফেরা সম্ভব নয়!

নাইবা ফিরলে ঘরে। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলে যাও। ও কাজটা তো তুমি ভালই পার, বন্ধু!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! রাত পোহালেই বেরিয়ে পড়ব। যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলে যাব। মিথ্যা মোহের বশে এতদিন ধরে এই যাত্রাদলে পড়ে থাকাটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে। মূর্খের মতো কাজ হয়ে গেছে। তবে আর নয়। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

তো এইসব সাত-সতের ভাবতে ভাবতেই কখনও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙল অশ্বের হ্রেষারবে।

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। কানে এল পাশের তাঁবুতে পরাণ মণ্ডল অধিকারীমশাইকে বলছে, এঁজ্ঞে, মহেশবাবু, মহেশ উকিল এয়েচেন। তিনি আপনার খোঁজ করতিচেন। তেনার সঙ্গে আবার একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়েও রয়েছেন, এঁজ্ঞে!

মহেশ উকিল আমার খোঁজ করছেন? বলিস কি রে, পরাণ! চল, চল, শিগ্‌গীর চল। দীনের দুয়ারে হস্তীর পদার্পণ! এযে বড় ভয়ের কথা রে, পরান! অধিকারী মশাই ছুটে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এগিয়ে যেয়ে তাঁবুর আড়ালে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলাম, অধিকারীমশাই অত্যন্ত সমীহ করে উকিলবাবুকে ওঁর তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেলেন। আর তাঁবুর ভেতরে ঢুকেই উকিলবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, সূর্যকান্ত, তুমি কতবড় অন্যায় কাজ করেছ তা জান? তুমি যা করেছ তা রীতিমতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ! কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে অথবা মেয়েকে জোর করে আটকে রাখলে তোমার কী ধরনের সাজা হতে পারে সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে?

আজ্ঞা, আমি তো কাউকে জোর করে আটকে রাখিনি, স্যার।

আলবৎ রেখেছ। একশোবার রেখেছ। হাজার বার রেখেছ। গত দুমাস ধরে তুমি তাকে জোর করে আটকে রেখেছ। তোমার নামে আমি মামলা করব। তোমাকে আমি জেলের ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়ব। আমার নাম মহেশ উকিল!

আজ্ঞা, তা আপনি পারেন, স্যার। আপনার মতো, জাঁদরেল উকিল এ তল্লাটে যে আর কেউ নেই, তা আমরা জানি, স্যার।

জান যদি তবে এমন অন্যায় কাজ করেছ কেন? কেন আমার এক আত্মীয়কে তুমি গত দুমাস ধরে জোর করে আটকে রেখেছ?

আজ্ঞা, আপনার কোন্ আত্মীয়কে আমি আটকে রেখেছি তা ঠিক বুঝতে পারছি নে। তবে দয়া করে যদি তার নামটা একবার বলেন তো এখুনি তাকে আমি—।

াড়াও। দাঁড়াও। নাম ধাম সব পরে হবে। আগে তুমি তোমার অপরাধের গুরুত্বটা র বুঝতে চেষ্টা কর।

তো উকিলবাবু তর্জনী উঁচিয়ে আস্ফালন করে অধিকারীমশাইকে তাঁর অপরাধের ত্ব বোঝাতে সচেষ্ট হলেন। এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিলে আইনের কোন া এবং কোন উপধারা বলে তাঁকে জেলের ঘানি টানতে বাধ্য করা যাবে সে য়ে উনি বোঝাতে লাগলেন।

আর ওদিকে উকিলবাবুর কণ্ঠ নিনাদে বিহ্বল হয়ে ময়দানের সব ক'টি তাঁবু হতে ভনেতা-অভিনেত্রীগন একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলেন।

অন্যদিকে চেয়ে দেখলাম, লক্ষ্মী ফিটন হতে নেমে দু'এক পা এগিয়ে আসতেই গ ছুটে যেয়ে ওর দু'টি হাত চেপে ধরল। তারপর বলল, এসেছ, সই! আমি নতাম তুমি আসবে।

এসেছি ম'নে! জলিল ভাইয়ের হাতে তোমার খত পেয়ে আমি পড়িমরি করে ট এসেছি, সই! পাছে এখানকার কর্তাব্যক্তিরা ওকে ছাড়তে না চান, তাই আমার কল মেসোমশাইকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তোমাকে যে আমি কী বলে াবাদ দেব, তা আমার জানা নেই, সই। গত দু'মাস ধরে আমরা ওকে কত খুঁজেছি, ন্তু কোন হদিসই করতে পারিনি।

ওদের দু'জনের 'সই' সম্বোধন শুনে আমি অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম, জন অপরিচিতা নারী দেখা হওয়া মাত্র কেমন দু'জনে দু'জনার সই বনে যায়। ত তাড়াতাড়ি ওরা দু'জনে দু'জনার সঙ্গে মিশে যায় গয়লা বাড়িতে দুধে-জলেও য় বা এত তাড়াতাড়ি মিশ খায় না। অথচ দু'জন পুরুষের মিশে যাওয়াটা কতই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

দেখলাম, কৃষ্ণা লক্ষ্মীর হাত ধরে মহিলা তাঁবুতে নিয়ে গেল। দু'জনে সতরঞ্চির পরে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল তারপর লক্ষ্মী আক্ষেপ করে কৃষ্ণাকে তে লাগল, আমার দুঃখের কথা আর কী বলব, সই! ভাগ্যদোষে সেই শৈশব ল হতেই আমি এই অদ্ভুত ছেলেটির কাছে বাঁধা পড়ে গেছি। তো তুমিই বল, নারী তার শৈশব কাল হতেই কোন চঞ্চল মতি, বাউণ্ডুলে এবং ভবঘুরে পুরুষের ছে বাঁধা পড়ে যায়, সারা জীবনে সে কী আর সুখশান্তির মুখ দেখতে পায়?

কৃষ্ণা বলল, তুমি অমন করে ভাবছ কেন, সই? আজবাদে কাল যখন ওই ঝকঝকে শোরটি একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ হয়ে তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবে, তখন ও তোমায় র দেবে। তোমার বর হয়ে ও তোমায় ঘর দেবে, সন্তান দেবে, সুখ শান্তি সব দেবে। ই দু'মাসে আমি ওকে যতটুকু বুঝেছি, তাতে আমি বলতে পারি, ওর মনটি একেবারে নো-সোনা। আর ওর সেই সোনা-সোনা মনটি জুড়ে শুধু তুমিই বিরাজ করছ। খানে অন্য কোন নারীর স্থান নেই। তুমি ভাগ্যবতী। স্বামীর নিখাদ প্রেম তোমার গ্যে রয়েছে। আর স্বামীর নিখাদ প্রেম পেলে কোন্ নারী আর দুঃখে ডরায় বল?

জানিনে সই, আমার ভাগ্যে কী আছে। এমন অদ্ভুত মানুষকে নিয়ে আমি কো সুখে ঘর করব। কতটা মানিয়ে নিতে পারব। কতটাই বা মানিয়ে চলতে পার

একটু থেমে লক্ষ্মী আবার বলল, আমার ঠাকুমা কী বলেন জান? উনি বলে বিয়ের পরে নতুন সংসারে যেয়ে বউদের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর, নন সবাইকে আপন করে নিতে হয়। যে যেমনই হোক না কেন, বউদের মানিয়ে নি হয়। সব্বাইকে নিয়ে মানিয়ে চলতে হয়। এটাই আমাদের পরম্পরা। আমাদের বিয়ে যে ভেঙে যায় না, সেটা ওই মানিয়ে নেওয়া আর মানিয়ে চলার মহাগুনের জন্যই

ঠাকুমা বলেন, আমরা আমাদের পরম্পরা থেকে সরে আসতে পারিনে। কেননা নদীর ধারার মতোই ওটা প্রত্যেকটি পরিবারের ধারা। গোটা সমাজের ধারা। যুগ যু ধরে ওটা একই ভাবে বয়ে চলেছে। চলতে চলতে ওটা নিয়ম হয়ে গেছে। আর নিয় কখনো বদলায় না। বহতা নদীর মতোই ওটা আপন বেগে বয়ে চলে। বয়েই চলে

আচ্ছা বলতো সই, সব দায় কী শুধু মেয়েদের? সব দায় কী শুধু বউদের

উনি বলেন, ভেবে দেখ, একদিন বিবাহ নামক এক শুভ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুমি এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ। পতিসাথে তুমি এক নতুন পরিবারে প্রবে করেছ। সেই পরিবারে তুমি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছ। তো, যে পরিবারে তু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছ, সেই পরিবারের দায় তো তোমায় বহন করতেই হবে তবে এ দায় বড় পবিত্র দায়। এ দায় বড় সম্মানের দায়।

ঠাকুমা আরও বলেন, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ। আজকের নতুন বউটিই যে আগা দিনগুলোতে মা, শাশুড়ী, ঠাকুমা এবং পরিবারের সর্বময় কর্ত্রীরূপে বিরাজ করবেন।

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, আজও মনে পড়ে বিদায় বেলায় কৃষ্ণা সেদি চোখের জলে ভেসেছিল। আমাদের দু'জনকে ও তাঁবুর আড়ালে ডেকে নি গিয়েছিল। আর তারপর আমাদের দু'জনের চার হাত এক করে দিয়ে ও আমা বলেছিল, সখা, আমার সইকে তুমি সুখে রেখ। তাহলেই আমি সুখী হব। তোমাদে সুখেই আমার সুখ।

একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বলেছিল, এ জীবনে হয় তো তোমাদের সঙ্গে আমা আর দেখা হবে না। তবুও তোমাদের দুজনকে আমি চিরদিন মনে রাখব। ভগবানে কাছে চিরদিন আমি তোমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করে যাব।

সুজনকে নিয়ে তুমিও সুখে থেকো। ওদের অনেক টাকা। আশাকরি ও তোমাকে সুখে রাখবে। বলেছিলাম আমি।

তুমি কী সত্যিই ভেবেছ যে ওই দুর্জন দাসের হাতছানিতে আমি সাড়া দেব ওর প্রস্তাব আমি মেনে নেব? সুখের আশে আমি মরীচিকার পেছনে ছুটব? তা হ না, সখা। সারা জীবনে যদি আমার আইবড় নাম নাও ঘোচে তবুও আমি ওই উচ্ছৃ মাতালটার গলায় মালা দেব না। এই তুমি জেনে রাখ।

কিন্তু তুমি যে আমায় বলেছিলে—।

বাধা দিয়ে লক্ষ্মী বলল, ও তোমায় কিচ্ছু বলেনি। আসলে ও যা বলেছে তুমি তা
ঝতে পারনি। তোমরা, পুরুষরা না বোঝ মেয়েদের মুখের ভাষা, না বোঝ তাদের মনের
ধা। তোমরা মেয়েদের বোঝ তোমাদের মতো করে। আর তাতেই বাধে যত গোল।

ওদিক থেকে লক্ষ্মীর উকিল মেসোমশাই হাঁক ছাড়লেন, কইরে, তোদের হল?
ই বেলা বেরিয়ে পড়, মা। বিকেল বেলার আবার আমার ক'জন মক্কেল আসবেন
ড়িতে। ছুটির দিন বলে কী আর আমার রেহাই আছে!

ওই, মেসোমশাই ডাকছেন! এবার আমাদের বিদায় দাও, সই।

চোখের জল মুছে কৃষ্ণা বলল, হ্যাঁ, এসো তোমরা।

একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমি। তারপর এগিয়ে যেয়ে আমরা
টনে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, কৃষ্ণা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই হা
মাদের বিদায় জানাচ্ছে।

ঝাঁকুনি দিয়ে ফিটন চলতে শুরু করল উকিলমেসোমশাই বললেন, একটু জোরে
লা, জাফর। ওদিকে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

জাফরের চাবুকের ঘায়ে ফিটন ছুটে চলল। মনটা আমার হুহু করে কেঁদে উঠল।
চোখ জলে ভরে গেল। গলার কাছে দলা পাকানো কান্নাটা বাইরে বেরিয়ে আসার
ন্য মাথা কুটতে লাগল।

ফিটন ছুটে চলল। আমার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল ক্রন্দন-রতা কৃষ্ণা
পসা হয়ে গেল জলিল ভাই, রমার মা, রানীদিদি, অধিকারী মশাই সহ সকল
ভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেল রটন্তী অপেরার মাথা উঁচু
রে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত তাঁবুগুলো।

একটু থেমে আগন্তুক আবার বললেন, লক্ষ্মী আমায় যতই অবুঝ ভেবে থাকুক
কেন, ঘরছাড়া, ভাগ্যহীনা কৃষ্ণার চোখের জলের মধ্য দিয়ে সেদিন আমি বুঝতে
রছিলাম ওর ঘা-খাওয়া মনের কথা, ওর অন্তরের ব্যথা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম
র চাওয়ার কথা। আমি অনুভব করেছিলাম ওর না-পাওয়ার ব্যথা।

আসলে মানুষ যা চায়, তা পায় না। যা পায়, সে তা চায় না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম,
টাই মানুষের ভবিতব্য। আর এই নিয়ম, এই ভবিতব্যের খাস তালুক সর্বব্যাপী। কিন্তু
বুও মেলে দু'একজন ব্যতিক্রমীর সন্ধান। আর তারাই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য।

আগন্তুক চুপ করলেন। সেই নিঝুম নিশীথে আশপাশের ঝোপ জঙ্গল হতে
নারকম কীট-পতঙ্গের একটানা রব ভেসে আসতে লাগল। আর তা শুনে মনে
তে লাগল যেন অদূরেই কোথাও কারা সব বড় কষ্টে একটানা আর্তনাদ করে চলেছে।
ই সময় শীতে কাতর একটা রাস্তার কুকুর হঠাৎই একবার সজোরে আর্তনাদ করে
ঠেই চুপ করে গেল। ব্রজপুর গ্রামপ্রান্তের গল্পের আসরে স্তব্ধতা নেমে এল।

একটু পরে রামলোচন খুড়ো আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন, তা ভায়া, কৃষ্ণার
থে তোমার সেই কী শেষ দেখা? না—।

হ্যাঁ, কৃষ্ণার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আর কখনও ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। রটন্তী অপেরার ধুলি-ধূসরিত প্রান্তরে সেদিন সকালেই সমাধি হয়েছিল আমার অবুঝ প্রেমের।

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, যদিও লক্ষ্মী সেদিন ওর উকিল মেসোমশাইকে সঙ্গে নিয়ে ওই রটন্তী অপেরা থেকে আমাকে প্রায় জোর করেই তুলে নিয়ে এসেছিল, তবুও বহুদিন ধরে আমার মনটি কিন্তু পড়েছিল ওই রটন্তী অপেরাতেই। আর যদিও সেদিন থেকে কৃষ্ণা চলে গিয়েছিল আমার চোখের আড়ালে, আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তবুও আমার হৃদয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে ও বিরাজ করেছিল চিরদিন।

কৃষ্ণাকে আমি পেতে চেয়েছিলাম চিরদিনের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি পাইনি কোনদিন। তবুও আমার হৃদয়েব মাঝে কৃষ্ণা ছিল চিরদিন।

আগন্তুক চুপ করতেই সর্বজ্ঞমশাই গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, এ এক মন্দ কিশোরের অনৈতিক প্রেম কথা। এক চঞ্চলমতি, বাউণ্ডুলে এবং অকালপক্ক কিশোরের অবাঞ্ছিত প্রেম কথা। এইরূপ অনৈতিক এবং অবাঞ্ছিত প্রেম কখনই প্রশয়যোগ্য, সমর্থন যোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য নহে.

সর্বজ্ঞমশাইয়ের মন্তব্য শুনে রামলোচন খুড়ো বললেন, দেখ, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যৌবনের পথে পা বাড়ায়। এই বয়সে এরা যৌবনের পদধ্বনি শুনতে পায় বড় মধুব সেই ধ্বনি!

মধুপানে ভল্লুক চপল হয়, চঞ্চল হয়। তখন তার টালমাটাল অবস্থা। এই বয়সের ছেলেমেয়েরাও যৌবনের মধুর ধ্বনি শুনতে পায়। সেই মধুর ধ্বনি শুনে এরা চপল হয়, চঞ্চল হয়। এদের অবস্থাও তখন ওই ভল্লুকের মতো হয়। এবং তখন এদের নৈতিক, অনৈতিক, বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত জ্ঞান লোপ পায়। তাই এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ওইসব দোষ-ত্রুটিগুলো অগ্রাহ্য করা যায়, মার্জনাও করা যায়।

পটসুন্দর বলল, খুড়ো, তোমাদের ওইসব কুট-কচাল এখন বন্ধ কর। তারপর আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে বলল, নতুন খুড়ো, এবারে তুমি তোমার ভূতের গল্প শুরু কর। ভূতের গল্প না শুনে কিন্তু আমি আসর ছাড়ছি না।

পটসুন্দরের কথা শুনে আগন্তুক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর উনি আসরের উদ্দেশ্যে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আগেই বলেছি যে শুধু ভূতের গল্প নয়, আপনাদের কাছে আজ আমি কিছু মানুষের কথাও বলতে এসেছি.

একটু থেমে উনি আবার বললেন, দেখুন, আসলে কৃষ্ণার সম্বন্ধেই এখনও আমার সবকথা বলা হয়নি। ওর সম্বন্ধে আমার আরো কিছু বলার আছে। ওর সম্বন্ধে আমি আরো কিছু বলতে চাই।

।। প্রথম পর্ব সমাপ্ত।।

## দ্বিতীয় পর্ব

আগন্তুকের কথা শুনে রামলোচন খুড়ো বললেন, তা বেশ তো। তাহলে তোমার কৃষ্ণার কথাই আগে শেষ কর। তারপর অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাবে।

তখন আগন্তুক বললেন, রটন্তী অপেরা পর্ব অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণাও চিরতরে চলে গিয়েছিল আমার চোখের আড়ালে। এরপর নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছিল দীর্ঘ সতেরটি বছর। তারপর হঠাৎই একদিন ঘটে গিয়েছিল এক অদ্ভুত ঘটনা। তো সেই অদ্ভুত ঘটনার কথাই এখন বলছি আমি, শুনুন।

ঘটনাটি ঘটেছিল রাস্তার মাঝে। মধ্য আষাঢ়ের এক মেঘে ঢাকা বৈকালে।

অনতিদূরের এক রথের মেলার কারণে সেদিন রাস্তায় নেমেছিল মানুষের ঢল। মেঘে ঢাকা আকাশ মাঝে মাঝেই হুঙ্কার ছাড়ছিল। আসন্ন ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে মেলা ফেরত মানুষজন ছুটে চলেছিল যে যার গন্তব্যের পানে। রাস্তার অপর দিক থেকে আমিও ছুটে চলেছিলাম আমার বাড়ির পানে। তো সেই পরিবেশেই হঠাৎ আমার নজর পড়ল রঙিন তাঁত-শাড়ি পরা এক শ্যামলা সুদর্শনা কিশোরীর প্রতি। কিশোরী একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণবের হাত ধরে ত্রস্তপদে ছুটে চলেছিল তার গন্তব্যের পানে। ওই কিশোরীকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেয়ে আমি ওদের দুজনের পথ রোধ করে দাঁড়ালাম। তারপর আশ্চর্য হয়ে ওই কিশোরীকে আমি প্রশ্ন করলাম, কৃষ্ণা, তুমি এখানে?

আমার প্রশ্ন শুনে কিশোরী অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ওই অবাক হওয়া দৃষ্টির পানে চেয়ে আমি আবার ওকে প্রশ্ন করলাম, আমায় তুমি চিনতে পারলে না, কৃষ্ণা? আমি দীপক! তোমার সখা!

আমার কথা শুনে পাশ থেকে প্রৌঢ় বৈষ্ণব মুচকি হেসে বললেন, তুমি ভুল করছ, দাঠাকুর। ও কৃষ্ণা নয়। ওর নাম কাবেরী। ও আমার মেয়ে।

না, না, তা হতে পারে না। আমি ভুল করিনি। এ কৃষ্ণা। নাম বদলে দিলেই মানুষ বদলায় নাকি?

প্রৌঢ় বৈষ্ণব এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, জানিনে দাঠাকুর, কে তোমার কৃষ্ণা। আর তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কি। তবে এ তোমার কৃষ্ণা নয়। এ কাবেরী। আমার আর ফুলমালার মেয়ে, কাবেরী।

বৈষ্ণবের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ওই কিশোরীর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। তা দেখে বৈষ্ণব বললেন, সরে দাঁড়াও, দাঠাকুর। আমাদের পথ ছাড়। আকাশের অবস্থা আজ ভাল নয়। ঝড়বৃষ্টি এল বলে!

বৈষ্ণবের কথা শুনে আমি ম্লানমুখে সরে দাঁড়ালাম। ওঁদের পথ করে দিলাম। কিন্তু বৈষ্ণব এগোলেন না। উনি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। কোন্ এক হিসাব মেলাতে প্রয়াসী হলেন। তারপর উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন, আচ্ছা দাঠাকুর বলতো, কৃষ্ণা তোমার কে? সে কি তোমায় ছেড়ে কোথাও চলে গেছে?

কৃষ্ণা আমার কেউ নয়, গোঁসাই। তবুও কৃষ্ণা আমার অনেক কিছু। কৃষ্ণা আমার অনেকখানি। জানিনা সে আজ কোথায় আছে। তবে তোমার মেয়ে কাবেরীর চেহারার সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। তাই আমি ভুল করেছি। যাক, আমায় ক্ষমা কর, গোঁসাই। আমি চলি।

ওঁদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে বৈষ্ণব আমায় ডাকলেন। বললেন, শোন দাঠাকুর, শোন।

আমি কয়েক পা পিছিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড়ালাম।

উনি আমার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা দাঠাকুর বলতো, কতদিন আগে কৃষ্ণার সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে?

আমি মনে মনে হিসাব কষে উত্তর দিলাম, তা প্রায় সতের বছর হবে।

তখন তোমার কৃষ্ণার বয়স কত ছিল?

তা হবে, পনের-ষোল।

এখন কাবেরীর বয়সও প্রায় ষোল বছর হল। বললেন বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের কথায় আমার চমক ভাঙল। আমি হাতজোড় করে বললাম, আমায় ক্ষমা কর, গোঁসাই। আমার ভুলই হয়েছে। কৃষ্ণা যেখানেই থাকুক না কেন সে আজ যৌবন উত্তীর্ণা। তাই কাবেরী কৃষ্ণা হতে পারে না। ওর চেহারাটা কৃষ্ণার মতো। হঠাৎ দেখে তাই আমি ভুল করেছি। আচ্ছা, আমি চলি।

ভুল করেছি বুঝে আমি সসঙ্কোচে এগিয়ে গেলাম কিন্তু পেছন থেকে বৈষ্ণব আবার আমায় ডাকলেন। বললেন, যেও না দাঠাকুর, যেও না। তোমার সাথে মোর কথা আছে গো!

বৈষ্ণবের ডাক শুনে আমি আবার ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর ওঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কী হল?

উনি বললেন, আকাশে আজ যা মেঘের ঘনঘটা তাতে এই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ কথা কওয়া যাবে না। তারপর বললেন, শোন দাঠাকুর এখান থেকে ক্রোশ দুয়েক দূরে সোনাঝরাগ্রামে আমার বাস। একেবারে ছোটগাঙের তীরে। তুমি বরং একদিন বৈকালে আমার পর্ণকুটীরে তোমার পায়ের ধুলো দাও। সোনাঝরা গ্রামের সকলেই রাইচরণ দাসের পর্ণকুটীর চেনে খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধে হবে না। সময় করে এসো একদিন। প্রাণভরে কথা কওয়া যাবে।

একটু থেমে রাইচরণ আবার বললেন, আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে, এক ঝড়-বাদলের রাতে কৃষ্ণা নামে এক যুবতী আমার পর্ণকুটীরে আশ্রয় নিয়েছিল। হতে পারে সেই যুবতীই হয়তো তোমার হারিয়ে যাওয়া কৃষ্ণা।

রাইচরণ আর দাঁড়ালেন না। জয় নিতাই বলে উনি নিজের পথ ধরলেন। কাবেরী বাক হয়ে একবার আমার মুখের পানে চেয়ে ওর বাবাকে অনুসরণ করল।

আগন্তুক চুপ করলেন। পাশ থেকে রামলোচন খুড়ো বললেন, সোনঝরা গ্রাম! ঃ, বেড়ে নাম তো হে, ভায়া! তা গিয়েছিলে নাকি সেই সোনাঝরা গ্রামে? পেয়েছিলে কি সেথায় তোমার হারিয়ে যাওয়া সোনার সন্ধান?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম আমি সেই সোনাঝরা গ্রামে। পরদিন বিকেলেই। গ্রামে ঢুকে ইচরণ দাসের ভদ্রাসন খুঁজে পেতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি।

তো আমায় দেখে রাইচরণ বেশ খুশি হলেন। বললেন, এয়েচ দাঠাকুর? এসো, সো। তোমায় দেখে বড় খুশি হলাম। গরিবের পর্ণকুটীরে সত্যিই তাহলে তোমর ায়ের ধূলো পড়ল?

ধুলো আর পায়ে লাগল কোথায়, গোঁসাই! ও দ্রব্য আর আছে নাকি কোথাও!

তা যা বলেছ, দাঠাকুর। রাস্তার তাবৎ ধুলো আজ ক'দিন হল কাদা হয়ে বসে াছে।

আর বড় ভক্ত শ্রেণির হয়েছেন তেনারা। পথিকের চরণস্পর্শ পেলে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন। বলেন, চরণ ছাড়া হব না কিছুতেই। আমি যোগ করলাম।

আমার কথা শুনে রাইচরণ মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

দেখলাম, বড় মনোরম পরিবেশে রাইচরণের বাস। প্রায় বিঘে খানেক জমির ওপর ওঁর ভদ্রাসন। পাশেই ছোট গাঙ। ছোট গাঙের দুই তীর সবুজে সবুজে ছয়লাপ। ঠিক ছবির মতো। জমির একধারে সামনা-সামনি দু'খানা ঘর। কাঁচা ভিটে। বাঁশের খুঁটি। কাদা-লেপা বেড়া। খড়ে-ছাওয়া চাল। বড্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বড্ড ছিমছাম। একখানা ঘরের মাঝ বরাবর পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে। তাতে নিজেদের বাস। অন্য ঘরখানায় প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। জমির অন্যধারে আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা বাতাপি লেবুর গাছ। ফুলবাগান, কলাবাগান। কী নেই রাইচরণের বাস্তু ভিটেয়! মায় এককোণে একটি ডোবাও রয়েছে দেখলাম। তো সেদিকে চেয়ে রাইচরণকে বললাম, হোতায় যেয়ে একবার চেষ্টা করি। যদি এঁদের চরণ ছাড়া করতে পারি।

আমার কথা শুনে বৈষ্ণবী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন, অমন দুঃসাহস কোরো না, দাঠাকুর। এঁটেল কাদায় পা পিছলোলে ডোবায় পড়ে হাবুডুবু খাবে। অমন কাজও কোরো না। সবুর কর। আমি তোমার জলের ব্যবস্থা করছি।

তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈষ্ণবী এক গাড়ু জল নিয়ে এসে দাওয়ার ধারে নামিয়ে দিয়ে বললেন, নাও দাঠাকুর, এই জলে পা ধোও। তারপর একখানা পরিষ্কার গামছা আমার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই নাও গামছা।

একি আদেশ কর, ঠাকরুন! তোমার দেওয়া জলে পা ধুয়ে শেষে আমি পাতকী হব

তুমি অতিথি। নারায়ণ। ওতে দোষ নেই। তবে যদি সঙ্কোচ হয়, আগে ক' জল মাথায় ছিটিয়ে নাও। তারপর পা ধোও। পাতকী হবে কেন! বললেন রাইচর

তো রাইচরণের কথা মতো তেমনই করা গেল। তারপর গামছায় হাত-পা মু ফুলমালা বৈষ্ণবীর দেওয়া আসনে বসা গেল।

চেয়ে দেখলাম, দাওয়ায় এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাবেরী। পরনে রঙিন তাঁ শাড়ি। একেবারে হুবহু কৃষ্ণা। সতের বছর আগে দেখা সেই রটন্তী অপেরার কৃষ পরম কৌতুহল ভরে কাবেরী আমার দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ চোখা-চোখি হ নিমেষে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বৈষ্ণবী বললেন, যা তো মা, ঠাকুর ঘরে যেয়ে একখানা রেকাবিতে কিছু প্র এনে অতিথির সামনে দে। আর এক গেলাস জলও নিয়ে আসিস অমনি।

তো কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবেরী একখানা রেকাবিতে কিছু ফল, মিষ্টি আর এ গেলাস জল এনে আমার সামনে নামিয়ে দিল। তারপর সে আবার ঠাকুর ঘরে ফি গেল।

নাও দাঠাকুর, প্রসাদ পাও। বললেন বৈষ্ণবী।

আমি একটু ফল আর মিষ্টি কপালে ছুঁইয়ে মুখে দিলাম। বৈষ্ণবী বললেন, গোঁসাইয়ে মুখে আমি সব শুনেছি। এবার সত্যি করে বলতো দাঠাকুর, কৃষ্ণা তোমার কে?

হ্যাঁ, দাঠাকুর, কৃষ্ণার সম্বন্ধে বল। ওর সম্বন্ধে সব কথা শোনার জন্য আমরা উৎসুক! বললেন বৈষ্ণব।

ওঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে আমার কৈশোরের সেই ফেলে আসা দিনগুলে কথা আবার আমায় স্মরণ করতে হল। রটন্তী অপেরাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগু সংক্ষেপে ওঁদের দুজনকে বলতে হল।

আমার কথা শুনে বৈষ্ণবী বললেন, এ তুমি কেমন কথা শোনালে, দাঠাকু আমরা তো ভেবেছিলাম কাবেরী তোমারই মেয়ে। কিন্তু এখন দেখছি—।

একী কথা বল, ঠাকরুণ! কাবেরী আমার মেয়ে হতে যাবে কেন? ও তো তোমা মেয়ে! বৈষ্ণব ঠাকুরের মুখে কাল তো আমি তেমনই শুনলাম!

না দাঠাকুর, না। কাবেরীকে আমি গর্ভে ধারণ করিনি। ও আমাদের পালিতা ক কৃষ্ণা ওর গর্ভধারিণী মা

কৃষ্ণা কাবেরীর গর্ভধারিণী মা! বল কী ঠাকরুণ? তাহলে কাবেরীর বাবা কে? ত পরিচয় কী?

জানিনে দাঠাকুর। আমরা তা জানিনে। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন রাত্রে আ কাবেরীর বাবার পরিচয় জানতে পারিনি।

বৈষ্ণবীর কথা শুনে আমি বিস্ময়বোধ করলাম।

একটু পরে বৈষ্ণবী বললেন, শোন দাঠাকুর। আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আ ঝড়-বাদলের এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। ত

মাঝরাত। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় ঘা পড়ল। একবার নয়, দু'তিনবার। এত রাতে কে গো দরজায় ঘা দাও? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

বাইরে থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে ছিল ঝড়ের দাপট। ফলে স্ত্রীলোকটির কথা স্পষ্টভাবে কিছু বুঝতে পারলাম না আমরা।

যাহোক, তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে মালসার আগুনে গন্ধক কাঠি ধরে হ্যারিকেন জ্বাললাম। তারপর দরজা খুলে দেখি চৌকাঠের কাছে জবজবে ভিজে অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক যুবতী। যুবতী ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে। আমরা দুজনে ধরাধরি করে ওকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পারলাম, যুবতী আসন্নপ্রসবা! গোঁসাইকে বললাম সেকথা। আমার কথা শুনে গোঁসাই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। আমি গোঁসাইকে পাশের ঘরে চলে যেতে বললাম। ও পাশের ঘরে চলে গেল। আমি যত শীঘ্র সম্ভব যুবতীর গা থেকে ভিজে কাপড়চোপড় সব খুলে নিলাম। তারপর আমি আমার শুকনো কাপড়-চোপড় ওকে পরিয়ে দিলাম। এরপর মালসার আগুনে আমি ওকে সেঁক করতে লাগলাম। ঘন্টাখানেক গরম সেঁক দেওয়ার পর যুবতীর জ্ঞান ফিরে এল। ঘরে কিছুটা দুধ ছিল। গোঁসাই সেটুকু গরম করে দিল। আমি ওকে দুধটুকু খাইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর যুবতী চোখ মেলে চাইল। ও ঘরের এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। বুঝতে চেষ্টা করল, ও এখন কোথায়।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে মা? এ দুর্যোগের রাতে কোথা থেকে এসেছ?

যুবতী ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, আমার নাম কৃষ্ণা। আমি আশ্রয়হীনা।

তোমার স্বামীর নাম কি? তিনি কোথায় থাকেন?

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

থাক, থাক। ওসব পরে শোনা যাবে। ওকে এখন বিশ্রাম করতে দাও। এই বলে গোঁসাই পাশের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর একসময় কৃষ্ণা আমায় জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন গ্রাম গো?

আমি ওকে আমাদের গ্রামের নাম বললাম।

ও আবার অমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তুমি হুতোমপুর চেন?

কেন চিনব না! আমাদের পাঁচবাড়ি মেগে খেতে হয়। মাধুকরীর অন্নে আমাদের পেট চলে। আশেপাশের সব গ্রাম-গঞ্জই আমাদের চেনা, মা।

তবে আমার একটা উপকার কর। রাত পোহালেই একবার হুতোমপুর গ্রামে যাও। ওই গ্রামের খেয়ালী নদীর তীরে দীপক রায় নামে একজনকে পাবে। ওই নামে যদি ওকে কেউ না চিনতে পারে, তবে তাকে বাড়ভুলে দীপক নাম বোলো। ওই নামেই ওর অধিক পরিচিতি। যত শীঘ্র সম্ভব ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো। ওকে আমার বড় প্রয়োজন।

তিনি কী তোমার স্বামী?

ঘাড় নেড়ে কৃষ্ণা বলল, না।

তবে? তবে তিনি তোমার কে হন?

কৃষ্ণা সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। চোখ বুজে শুয়ে রইল।

একটু পরে চোখ খুলতেই আমি পুনরায় ওকে বললাম, কৃষ্ণা, তুমি তোমার স্বামীর পরিচয় দাও। তোমার গর্ভস্থ সন্তানের পিতার পরিচয় দাও। যার পরিচয়ে তোমার সন্তান পরিচিত হবে, তার কথা বল। কিন্তু কৃষ্ণা চুপ করে রইল। নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল।

খানিক বাদে কৃষ্ণা নিজেই মুখ খুলল। ওর মুখ থেকে আমি কিছু কিছু কথা জানতে পারলাম। কিন্তু তার মধ্যে ওর স্বামীর পরিচয় ছিল না। ওর গর্ভস্থ সন্তানের পিতার পরিচয় ছিল না।

একটু পরে বৈষ্ণবী বললেন, সে রাত্রে কৃষ্ণা আমাকে সব কথা খুলে বলেনি। আর সে সময়ও ও পায়নি। কারণ সেই রাত্রিই ওর কালরাত্রি হয়েছিল। তবে আজ, এতকাল পরে, তোমার কথার সঙ্গে কৃষ্ণার সে রাত্রে বলা কথাগুলো মিলিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে কৃষ্ণা কোন নিষ্ঠুর পুরুষের লালসার শিকার হয়েছিল। ওকে বলাৎকার করা হয়েছিল। আর সেই নিষ্ঠুর পুরুষটি অন্য কেউ নয়। সে ওই সখের নট, ধনীপুত্র, পাঁড় মাতাল দুর্জন দাস।

বৈষ্ণবীর কথা ক'টি আমার কানে গরম সীসের মতো প্রবেশ করল। আমি মুখ নীচু করলাম। বৈষ্ণবীর সমুখে আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

আষাঢ়ের আকাশে মেঘ ছিলই। সহসা সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। গর্জন করতে লাগল। বিজলী হানতে লাগল। বৈষ্ণবী আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে আজকের রাত্রিটা বড় দুর্যোগপূর্ণ হবে। কী যে হয়েছে আমার, দাঠাকুর! সেই কালরাত্রির পর থেকে সব দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিই আমার কাছে এক বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয়। আমি ঘুমোতে পারিনে। জেগে থাকি।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বয়। শন্ শন্ আওয়াজ ওঠে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। বাঁশের খুঁটি, খড়ের চালের ঘর একটু একটু দুলতে থাকে। ক্যাঁচ, ক্যাঁচ, ক্যাঁচ আওয়াজ করে। চালের বাতায় দড়িতে বাঁধা টিমটিমে হ্যারিকেনটা আপন মনে দোল খায়। বন্ধ ঘরে আলো-আঁধারি খেলা করে। আমার কানে এক অপার্থিব শব্দ ভেসে আসে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কৃষ্ণা যেন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে অনুনয় করছে। বলছে, আমার মেয়েটাকে একটু দেখেশুনে রেখো, গো। ও যেন একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। ও যেন একটু শান্তিতে থাকতে পায়।

অমন রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নে। আমি জেগে বসে থাকি, দাঠাকুর।

আমার শয্যার একপাশে কাবেরী অঘোরে ঘুমোয়। পাশের ঘরে গোঁসাইয়ের নাক ডাকে। আকাশ বিজলী হানে। কড়্ কড়্ কড়্ আওয়াজ করে। মুহূর্তের তরে ঘরের

ভেতরটা আলোয় ভেসে যায়। আর সেই মুহূর্তের আলোর বন্যায় কখনও কখনও আমি এমনও দেখতে পাই যে কৃষ্ণা ওর মেয়ের শিয়রে বসে রয়েছে। বড় করুণ চোখে ও ওর ঘুমন্ত মেয়ের মুখের পানে চেয়ে বসে রয়েছে।

তো তুমিই বল, দাঠাকুর। অমন রাত্রে কি ঘুম আসে? আমি ঘুমোতে পারিনে। আমি জেগে বসে থাকি।

তবে বাইরের ওই অপার্থিব শব্দ শুনে বা কৃষ্ণার ওই মুহূর্তের অলৌকিক উপস্থিতি দেখে আমি কিন্তু ভয় পাইনে, দাঠাকুর। আমি শান্ত হয়ে বসে থাকি। মনে মনে কৃষ্ণনাম জপ করি। বাইরে বৃষ্টি ঝরে। আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে।

বৈষ্ণবী চুপ করলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আমি বৈষ্ণবীকে বললাম, আচ্ছা ঠাকরুন, তুমি বলছ যে সেই দুর্যোগের রাতে কৃষ্ণার কাছ থেকে তোমরা ওর স্বামীর পরিচয় জানতে পারনি। কিন্তু সে রাতে তোমরা ওকে যেমন দেখেছ এবং ওর কাছ থেকে তোমরা যতটুকু শুনেছ তাতে কী তোমাদের মনে হয়নি যে কৃষ্ণা বিবাহিতা?

না, দাঠাকুর। সে রাতে কৃষ্ণার শরীরে আমরা এয়োতির কোন চিহ্নই দেখতে পাইনি। আর সে রাতে আমরা ওর মুখ থেকে যতটুকু শুনেছি, আর আজ আমরা তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে আমি বলতে পারি যে কৃষ্ণা অবিবাহিতা ছিল।

ওই পাপিষ্ঠ, দুরাত্মা দুর্জন দাস শত প্রলোভনেও মেয়েটাকে টলাতে না পেরে শেষে বল প্রয়োগ করেছিল। আর সেই নক্কারজনক ঘটনাটা ঘটেছিল তুমি অপেরা থেকে চলে আসার কিছুদিন পরেই।

ঘন মেঘে ছেয়ে থাকা আকাশ সমানে তর্জন-গর্জন করে চলেছিল। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছিল। সেদিকে চেয়ে বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, অঘটন ঘটে যাওয়ার কয়েকমাস পরে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই কৃষ্ণার শরীরে গর্ভবতীর লক্ষণ দেখা দেয়। আর বিপদ বুঝে পাপিষ্ঠটাও একদিন অপেরা ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। এবং তখন থেকেই শুরু হয় কৃষ্ণার ঘোর দুর্দিন। অপেরায় ওকে চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এবং শেষে একদিন ওর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে ওকে অপেরা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

অপেরা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর কৃষ্ণা ওর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়। কিন্তু সেখানে গেয়ে ও শুনতে পায় যে কয়েকদিন আগে ওর অন্ধ বাবা মারা গেছেন। একথা শোনার পর কৃষ্ণা বড় অসহায় বোধ করে। ও কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এই পোড়া দেশে কোন কুমারী কন্যা গর্ভবতী হলে তার যে কী দশা হয়, তা তো তুমি জান দাঠাকুর!

যাহোক, গ্রামের বাড়িতে কৃষ্ণার দূরসম্পর্কের এক বিধবা পিসি থাকতেন। তিনিই ওর অন্ধ বাবার দেখাশোনা করতেন। পিসী কিছুদিন কৃষ্ণাকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর গ্রামের মাতব্বরেরা একদিন জোর করে কৃষ্ণাকে গ্রাম থেকে বের করে দেন।

এরপর কৃষ্ণা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফেরে। আশ্রয়ের আশায় ও কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়িতে যায়। কিন্তু ওর ওই অবস্থা দেখে কেউ ওকে আশ্রয় দেয়নি। কোথাও ওর আশ্রয় মেলেনি। কেউ ওকে বলেনি দু'টো সহানুভূতির কথা। কেউ জানতেও চায়নি, দোষটা আসলে কার।

তারপর থেকে কৃষ্ণার ঠিকানা হয় পথ। আশ্রয় হয় পথিপার্শ্বের গাছতলা।

একটু থেমে বৈষ্ণবী বললেন, বড় ব্যথা বুকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে! বড় ব্যথা বুকে নিয়ে কৃষ্ণা চলে গেছে, দাঠাকুর!

একটু থেমে বৈষ্ণবী আবার বললেন, সেদিন শেষ রাত্রে কৃষ্ণার প্রসব বেদনা ওঠে। এবং ভোর বেলায় ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই কৃষ্ণা মারা যায়। সেই মাতৃহারা সন্তানই এই কাবেরী। জন্মের পর থেকে আমরাই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। কাবেরী আমাকে মা বলে জানে এবং গোঁসাইকে বাবা।

বৈষ্ণবী চুপ করলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আমি বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ঠাকরুন, কৃষ্ণা মারা যাওয়ার পর তোমরা কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টাই করনি?

ঘাড় নেড়ে বৈষ্ণবী বললেন না, দাঠাকুর। আমরা তা করিনি। আসলে আমি ত পারিনি। গোঁসাই অবশ্য তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু আমি ওকে বাধা দিয়েছিলাম। আমি ওকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে মানা করেছিলাম।

গোঁসাইকে তুমি বাধা দিয়েছিলে! আমার সঙ্গে দেখা করতে মানা করেছিলে! কিন্তু কেন?

লোভ দাঠাকুর, লোভ। লোভ আমার নারী হৃদয়ে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলত। সে আগুনের জ্বালা ছিল, কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সেই লোভই আমাকে অবশ করেছিল। আমাকে সে বিবশ করেছিল। আমি লোভের বশবর্তী হয়েছিলাম।

বৈষ্ণবীরও লোভ?

হ্যাঁ দাঠাকুর। বৈষ্ণবীরও লোভ। সারাজীবন ধরে আমি আমার রাধাবল্লভজীর চরণ সেবা করেছি। কিন্তু তবু ও আমি লোভমুক্ত হতে পারিনি। আমি নির্লোভ হতে পারিনি। লোভ আমার নারীহৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল।

একটু থেমে বৈষ্ণবী বললেন, প্রসব বেদনা ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণা বুঝতে পেরেছিল যে ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ও আর বাঁচবে না। তাই প্রসবের আগে ও আমায় মিনতি করে বলেছিল যে ওর যদি কিছু হয়ে যায় তবে ওর সন্তানকে যেন আমি তোমার হাতে তুলে দিই। এবং তুমি যেন ওর সন্তানকে তোমার মনের মতো করে মানুষ করে তোল। তোমার'পরে ওর অগাধ আস্থা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণার সেই শেষ মিনতি আমি রক্ষা করতে পারিনি। ওর সন্তানকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারিনি। কেননা আমি নির্লোভ হতে পারিনি।

দাঠাকুর, আমি নিঃসন্তান। একজন নিঃসন্তান নারীর সন্তানের জন্য যে কী অদম্য লোভ থাকে তার অন্তরে তা আমি তোমায় কেমন করে বোঝাই! তুমি যে পুরুষ! নারীর অন্তরের জ্বালা তুমি বুঝবে কেমনে?

দাঠাকুর, সন্তান লাভের আশায় আমি অনেক ডাক্তার কবরেজ করেছি। অনেক তাবিজ-কবজ পরেছি। দেবতার থানে ধর্না দিয়েছি। দরগায় মানত করেছি। রাধাবল্লভজীর সমুখে মাথা কুটেছি। কিন্তু সবই আমার বিফলে গেছে। আমার সন্তান লাভ হয়নি। আর আমার বুকের আগুনও নেভেনি।

একটু পরে বৈষ্ণবী বললেন, সেদিন ভোরবেলায় কৃষ্ণা মারা গেল। আমি ওর ফুলের মতো সুন্দর, নিষ্পাপ আর গঙ্গা জলের মতো পবিত্র সন্তানটাকে বুকে তুলে নিলাম। আর কী বলল দাঠাকুর, মুহূর্ত মধ্যে আমার বুকের আগুনটা নিভে গেল। আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল। আর আমার মনে হল, আমার ধর্ণা, আমার মানত আমার মাথা কোটা কোন কিছুই বিফলে যায়নি। কোন কিছুই ব্যর্থ হয়নি। আমি যা চেয়েছিলাম, তা পেয়ে গেছি। আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছি। আমি সন্তান লাভ করেছি। এ সন্তান আমার। আমিই এর মা।

একটু থেমে বৈষ্ণবী বললেন, কাবেরীকে সন্তান রূপে পেয়ে আমার বুকের আগুনটা নিভে গেছে। আমার বুকটা জুড়িয়ে গেছে, দাঠাকুর। কিন্তু একটা অপরাধ বোধ, একটা অন্যায় বোধ সেই থেকে রয়ে গেছে আমার মধ্যে। আজ ষোল বছর ধরেই ওই বোধটা রয়ে গেছে আমার মনের মধ্যে। কারণ কৃষ্ণার শেষ মিনতি আমি রক্ষা করতে পারিনি। ওর সদ্যোজাত সন্তানকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারিনি। অন্যায়টা আমার সেখানেই। অপরাধ বোধটাও আমার সেই কারণেই।

আমি আমার রাধাবল্লভকে বলি, হে রাধাবল্লভ, হে বিশ্ববিধাতা, হে ভাগ্যবিধাতা তুমিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কর। আমার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রাও তো তুমিই। আমার বুকের আগুনটা নেভাতে যেয়ে আমি যে অন্যায় কাজ করেছি, তা তো করেছি আমি তোমার ইচ্ছায়। তবে আর এতে আমার দোষটা কোথায়? আমার অন্যায়টা কোথায়?

তোমার ইচ্ছা ছাড়া কুটোটাও নড়ে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষও তোমার ইচ্ছায় চলে বলে, হাসে, কাঁদে। তোমার ইচ্ছাতেই মানুষ ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় কাজ করে। আমিও তো মানুষ।

আমি বলি, হে রাধাবল্লভ, সারাজীবনে আমি যদি কিছুমাত্র ভাল কাজ করে থাকি, তা করেছি আমি তোমার ইচ্ছায়। আবার যদি কিছু মন্দ কাজ করে থাকি, তাও করেছি আমি তোমার ইচ্ছাতেই। সে কারণে আমার সকল ভাল, আমার সকল মন্দ, আমার সকল ন্যায়, আমার সকল অন্যায়, আমার সকল পূণ্য, আমার সকল পাপ আমি তোমাতে সমর্পণ করে তোমার চরণে শরণ নিলাম। আমায় তুমি ক্ষমা কর প্রভু।

কিন্তু প্রভুর চরণে সর্বস্ব সমর্পণের পরেও তাঁর কৃপা লাভে আমি ব্যর্থ হয়েছি,

দাঠাকুর। আর সেই কারণেই একটা সূক্ষ্ম অপরাধ বোধ আজও রয়ে গেছে আমার মধ্যে।

রাইচরণ দাওয়ার এককোণে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। এবারে বৈষ্ণবী চুপ করতেই উনি গুন গুন করে গেয়ে উঠলেন, ও আমার গৌরচাঁদের বাজারে, নিতাই চাঁদের বাজারে, একমন হলে সেই যেতে পারে—। তারপর গান থামিয়ে উনি বললেন, শোন গো বোষ্টমী, ধর্মকথা শোন, ভারতকথা শোন।

দেখ, কৌরব সভায় দুষ্ট দুঃশাসন যখন কৃষ্ণার বস্ত্র হরণে লিপ্ত ছিল, কৃষ্ণা তখন একহাতে নিজ অঙ্গের বস্ত্র সামলাচ্ছিলেন আর অন্য হাত উর্ধ্বে তুলে তিনি বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকছিলেন, তাঁর লাজ রক্ষা করার জন্য, তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু বিপদভঞ্জন মধুসূদন কৃষ্ণার সে ডাকে সাড়া দেননি। কৃষ্ণার লাজ রক্ষা করার জন্য, তাঁকে বিপদ থেকেউদ্ধার করার জন্য তিনি এগিয়ে আসেননি। কিন্তু কৃষ্ণা যখন দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে আকুল হয়ে কৃষ্ণকে ডাকলেন, তাঁর ওপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল হলেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে সমর্পণ করলেন, তখন কিন্তু কৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অস্থির হয়ে ছুটে এলেন, এবং আকাশ মার্গ হতে বিবিধ বস্ত্র সম্ভার দানে কৃষ্ণার লাজ রক্ষা করলেন। দুঃশাসন তথা দুষ্ট কৌরবগণের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন।

তো তাই বলছি বোষ্টমী, তোমার ডাকে ওই পান্ডবজায়া পাঞ্চালীর মতো আকুলতা আছে তো? ব্যাকুলতা আছে তো? কৃষ্ণপদে নিজেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে পেরেছ তো? কৃষ্ণকৃপা লাভ করতে হলে ওই ভাবটা যে একান্তই প্রয়োজন, বোষ্টমী।

রাইচরণের কথা শুনে বৈষ্ণবী ফুলমালা বললেন, তুমি যেমন বলছ, তেমনভাবে আর আমি আমার রাধাবল্লভজীকে ডাকতে পারলাম কই? তাঁর শ্রীচরণে আমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনই বা কোথায়? চিরটাকাল আমি একহাতে আমার রাধাবল্লভজীর সেবা করে চলেছি আর অন্য হাতে আমি এই সংসার সামলাচ্ছি। ফলে আমি আর পাঞ্চালী হতে পারলাম কই?

আমি পাঞ্চালী হতে পারলাম না। কারণ, আমার কাছে আমার রাধাবল্লভজী যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য আমার এই ছোট্ট সংসার, আমার স্বামী, আমার সন্তান। আমার কাছে ঈশ্বরও সত্য আবার তাঁর সৃষ্ট এই জগৎও সত্য।

তবে তোমার সহধর্মিণী হয়েও আমি তোমার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারলাম না তোমার পথের পথিক হতে পারতাম না। তোমার মতো কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ হতে পারলাম না। সে দুঃখ আমার রয়েই গেল।

তবে তুমি এগিয়ে যাও গোঁসাই। তাঁর তরে তোমার অগাধ ভক্তি আছে। তাঁর তরে তোমার আকুলতা আছে। ব্যাকুলতা আছে। তাই তুমি এগিয়ে যাও। তাঁর সাথে মিলন আসে তুমি দ্রুত এগিয়ে যাও। এবং এই মৃত্যুপূর্ণ সংসার সাগর হতে তুমি মুক্তি পাও।

আর আমি? আমি এইভাবে জনমে জনমে তাঁর খেলুড়ের ভাবে দিন কাটাই। তিল

তিল করে তাঁর পানে এগিয়ে যেতে প্রয়াস পাই। আমার মতো মায়াবদ্ধ মেয়েমানুষের এই ভাল, গোঁসাই।

ফুলমালার কথা শুনে রাইচরণ বললেন, আমরা দু'জন আলাদা হয়েও আলাদা নয় গো, বোষ্টমী। আমরা দুজন এক। মিলেমিশে একাকার। আমাদের এক মন, এক প্রাণ। আমাদের এক পথ, এক সাধনা, এক সিদ্ধি। আমার সুখদুঃখ তোমার সুখদুঃখ। তোমার সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ।

আর শোন গো, বোষ্টমী। কৃষ্ণ ভক্ত, বিষ্ণু ভক্ত কখনও নির্বোধ হয় না। চিনি নিজে তার স্বাদ জানে না। সে স্বাদ গ্রহণে অপারগ। সে রসাস্বাদনে বঞ্চিত। যে চিনি খায় সেই তার স্বাদ জানে। রসাস্বাদনের আনন্দও সেই উপভোগ করে। রসাস্বাদনের আনন্দে সে অভিভূত হয়। সে বিহ্বল হয়। সে ধন্য হয়।

আর তাই আমরা মুক্তি চাই না গো, বোষ্টমী। মুক্তি নয়। রসাস্বাদন। আমরা চিনি হতে চাই না গো, বোষ্টমী। আমরা চিনি খেতে চাই।

রাইচরণ চুপ করলেন। আমি বললাম, দেখ গোঁসাই তোমাদের ওইসব উচ্চমার্গের চর্চা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। ওইসব আমার কাছে এক ধোঁয়াশা বলে বোধ হচ্ছে। তাই দয়া করে তোমরা দুজনে নীচে নেমে এসো। আর আমি বাস্তবের আলোয় তোমাদের দুজনের মুখ দেখি। তোমাদের দুজনকে আমি চিনতে চেষ্টা করি।

আমার কথা শুনে ওঁরা দুজন লজ্জিত হলেন। এবং বৈষ্ণবী আমার পানে চেয়ে বললেন, কিছু মনে কোরো না, দাঠাকুর। মাঝে মাঝে আমি উল্টোপাল্টা বলে ফেলি।

তারপর উনি বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেখ, কৃষ্ণার শেষ মিনতি আমি রক্ষা করতে পারিনি। আর সেই কারণেই আমি সরাসরি তোমার কাছে দোষী। তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করলেই আমি আমার অপরাধ থেকে মুক্তি পাব।

বৈষ্ণবী চুপ করলেন। একটু পরে আমি বৈষ্ণবীকে বললাম, আচ্ছা ঠাকরুন, তুমি বলছ যে কৃষ্ণার শেষ মিনতি রক্ষা না করার কারণে তোমার অপরাধ হয়েছে। আর সেই কারণেই তুমি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু ঠাকরুন, কোন পুরুষ মানুষ এক সদ্যোজাত সন্তানকে মানুষ করে তুলেছে, এমন অদ্ভুত কথা তুমি শুনেছ কোনদিন? ওটা পুরুষমানুষের কাজ নয়। ওটা নারীর কাজ। ওটা তোমাদের কাজ। তোমরাই পার মাতৃস্নেহে ওদের মানুষ করে তুলতে। আমরা পারিনে।

মৃত্যুর আগে কৃষ্ণা আমার হাতে ওর সন্তানকে তুলে দেয়ার জন্য তোমাকে মিনতি করেছিল। কারণ ও ভেবেছিল যে ততদিনে আমি লক্ষ্মীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। আমার হাতে ওর সন্তানকে তুলে দিলে লক্ষ্মীই তাকে মাতৃস্নেহে মানুষ করে তুলবে। এমনটা ভেবেই কৃষ্ণা তোমাকে অমন মিনতি করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তো অমনটা ঘটেনি। আমি তো তখনও বিয়েই করিনি।

সুতরাং তুমি বুঝতেই পারছ যে সেদিন যদি তুমি কৃষ্ণার ওই সদ্যোজাত সন্তানকে আমার হাতে তলে দিতে, তবে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে আবার তোমার কোলেই তুলে

দিতাম। আমি তোমাকেই অনুরোধ করতাম ওর সন্তানকে মানুষ করে তুলতে। সে কারণে কৃষ্ণার শেষ মিনতি রক্ষা না করায় তোমার কোন অপরাধ হয়নি, কোন পাপও হয়নি। বরং এক মাতৃহারা অসহায় সন্তানকে মাতৃস্নেহে মানুষ করে তুলে তুমি অগাধ পুণ্যের কাজ করেছ। কিন্তু তবুও যদি আমি ক্ষমা করলে তুমি তোমার তথাকথিত অপরাধ থেকে মুক্তিলাভ করবে বলে ভেবে থাক, তবে হে পুণ্যবতী, তোমার মনস্তুষ্টির কারণে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।

আমার কথা শুনে বৈষ্ণবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি স্মিতহাস্যে বললেন, তুমি যখন ক্ষমা করেছ তখন আর আমার ভাবনা কিসের! এবারে আমার রাধাবল্লভজীও আমায় ক্ষমা করবেন। এবং আমি আমার অপরাধ থেকে মুক্তিলাভ করব। রাধাবল্লভজী তোমার মঙ্গল করুন, দাঠাকুর। এইকথা বলে বৈষ্ণবী রাধাবল্লভজীর উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম করলেন।

কথায় কথায় বেলা গেল। কয়েক পশলা ভারী বর্ষণের পরে মেঘমুক্ত আকাশ তখন হাসছিল। আষাঢ়ের বিলম্বিত সূর্য পাটে বসার তোড়জোড় করছিল। আকাশের দিকে চেয়ে আমি রাইচরণকে বললাম, বেলা যায়। এবার আমায় বিদায় দাও, গোঁসাই।

পাশ থেকে বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করলেন, এত তাড়া কিসের? বলি, বউকে ভয় পাও নাকি?

না, বউয়ের ভয়ে নয়। ছেলেটা যাতে আমার মতো বাউন্ডুলে হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

মুচকি হেসে বৈষ্ণবী বললেন, তা ভাল। আজ তাহলে যাও। তবে মাঝে মাঝে এসো কিন্তু। আমাদের টানে না হয় না-ই এলে। তোমার কৃষ্ণার ওই স্মৃতিটুকুর টানেই এসো। তুমি ওর পিতৃপ্রতিম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আসব। তোমাদের সকলের টানেই আসব। তোমরা সকলেই যে আমার আপনজন।

কিন্তু সেই যে সেদিন 'আসব' বলে বৈষ্ণব পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম, তারপর পাঁচ-ছ' মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও আমি আর একবার তাদের কাছে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারিনি। আসলে চাষীর ফসল যতদিন মাঠে থাকে ততদিন তার নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না। আত্মীয়-কুটুম্বিতাও শিকেয় ওঠে। আমিই বা তার ব্যতিক্রম কিসে। বাবা গত হওয়ার পর আমাকেও যে সংসারী হতে হয়েছিল। বাধ্য হয়েই হতে হয়েছিল। নইলে সংসারটা যে ভেসে যেত।

মনে পড়ে, মনে বড় দুঃখ পেয়ে কৃষ্ণা একদিন আমায় যাত্রাদল ছেড়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিল। ঘরে ফিরে যেয়ে লেখাপড়ায় মন দিতে বলেছিল। কাজে-কামে মন দিতে বলেছিল। দু'একটা পাশ দিতে বলেছিল। তারপর নিজের কর্মক্ষেত্র

জেকেই বেছে নিতে বলেছিল। আর সব শেষে একটা বিয়ে করে ঘোরতর সংসারী
নে যেতে বলেছিল। তাতেই ও আমার মঙ্গল দেখতে পেয়েছিল।

আসলে বাউন্ডুলেপনা ছেড়ে কৃষ্ণা সেদিন আমায় আর পাঁচজন মানুষের মতো
ামাকেও একজন সাধারণ মানুষ হতে উপদেশ দিয়েছিল। একজন সাদামাটা সাধারণ
নুষ। যে মানুষ স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সুখ দুঃখ, হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে জীবনের পথ
রিক্রমা করে। সেইরকম একজন সাদামাটা সাধারণ মানুষ।

কিন্তু যাত্রাদল ছাড়লেও কৃষ্ণার সেই উপদেশ আমি মেনে চলিনি। আর শুধু
ষ্ণার কেন, জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আমি কারো উপদেশই মেনে চলিনি। খেয়াল-
শি মতো চলেছি। উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেছি। নির্বোধের মতো চলেছি। আর ওইভাবে
লতে চলতেই কিছু পেয়েছি। কিছু হারিয়েছি। তবে আমি নিজে হারিয়ে যাইনি। নিজে
ষ হয়ে যাইনি। আর হারিয়ে যে যাইনি, শেষ হয়ে যে যাইনি সে শুধু লক্ষ্মীর জন্য।
মৃতালক্ষ্মীর জন্য। সে আমায় হারিয়ে যেতে দেয়নি। শেষ হয়ে যেতে দেয়নি।
তদিন পেরেছিল সে আমায় আগলে রেখেছিল। ঠিক ফণী যেমন মণিরে আগলায়।

আসলে লক্ষ্মীকে আমি বড় সহজে পেয়েছিলাম। বোধহয় সেই কারণেই ওর মূল্য
ামি বুঝতে পারিনি। বুঝতে চেষ্টাও করিনি। আমার জীবনে ওর গুরুত্ব কতখানি, ওর
নিবার্যতা কতখানি তাও আমি ভেবে দেখিনি। সেই শৈশবকাল থেকেই ওকে আমি
হজলভ্য জিনিসের মতো হেলাফেলা করে এসেছি।

কিন্তু আমার জীবনের দ্বিতীয় এবং শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে আমি লক্ষ্মীর গুরুত্ব এবং
নিবার্যতা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমার
বনের কৃতকর্মের ফল তখন ফলতে শুরু করেছিল। আর আমার পায়ে তা বেড়ির
তো আটকে গিয়েছিল। কারণ ওটাই ছিল আমার ভবিতব্য।

আসলে আমার জীবনটা হল কতকটা ওই নির্বোধ হাউই-এর মতো। নির্বোধ হাউই
যমন আগুপিছু না ভেবে সীমাহীন নিকষ কালো আকাশ পাড়ি দিতে যায়, আর তার
ই নির্বুদ্ধিতার জন্যই ওই সীমাহীন আকাশেই ঘটে তার জীবনের পরিসমাপ্তি, আমার
বনটাও কতকটা তেমনই।

যাহোক, অঘ্রাণে পাকা ফসল ঘরে ওঠার পর মাঝে মাঝেই মনটা আমার আনচান
রে উঠছিল। সোনাঝরায় যেয়ে কৃষ্ণার আমানতকে একবার দেখে আসতে ইচ্ছা
রছিল। কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না। কেননা গোলাভরা পাকা
সলেরও যে একটা টান আছে। আর সেই টানের গোপন কথা, গোপন বৃত্তান্ত
ুমাত্র চাষীই জানে, চাষীই বোঝে। অন্য কেউ নয়।

তো ওই দোটানায় পড়ে যখন শুধু সময়ই অতিবাহিত হচ্ছিল, কাজের কাজ কিছু
ছিল না, ঠিক তখনই একদিন সকালে পেলাম ফুলমালা বৈষ্ণবীর চিঠি। এক হাটুরের
তে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। গোটা গোটা হাতের লেখা। তিনি লিখেছেন—

দাঠাকুর,

সেই যে সেদিন আসব বলে চলে গেলে, আর ফিরলে না। খোঁজখবরও করলে না। আমাদের না হয় ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার কৃষ্ণার স্মৃতিকে তুমি ভুললে কেমনে!

যাহোক, এদিকে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটায় ভয়ের গন্ধ পাচ্ছি। আমরা দুটি মেয়েমানুষ তাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি।

গোঁসাই চিরটা কালই আত্মভোলা মানুষ। তার কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ। সে সংসারে থেকেও নেই। মাসখানেক হল সে কীর্তনিয়ার দল নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। কবে ফিরবে জানিনে। এখন কোথায় আছে তাও জানিনে। এ রকম পরিস্থিতিতে তোমাকে আমাদের বড় প্রয়োজন। পথ চেয়ে বসে রইলাম। পত্রপাঠ চলে এসো।

ইতি—

ফুলমালা দাসী

তো বৈষ্ণবীর কাছ থেকে অমন একখানা চিঠি পেয়ে আমি মনের উৎকণ্ঠা রাখতে পারিনি। আর তাই পরদিন বিকেলেই আমি যেয়ে হাজির হয়েছিলাম সো গ্রামে। আর ওখানে যেয়ে আমি যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম এবং যে সব সঙ্গে আমি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলাম, সে সব কথাই বলছি শুনুন।

সোনঝরা গ্রাম। গ্রামের শেষপ্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে এক ছোট্ট নদী। লোকেরা বলে ছোট গাঙ।

ছোটগাঙ তীরবর্তী অঞ্চল নলখাগড়া আর গাঢ় অরণ্যে বেষ্টিত। স্থানে অরণ্যবেষ্টিত জলাশয়। ঝিল, বিল, ডোবা। মাঝে মধ্যে অরণ্য পরিষ্কার করে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম। ছোট ছোট জনবসতি। চাষী, কাঠুরে এবং মৎস্য আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

গাঢ় অরণ্য। স্থানে স্থানে ছোটবড় জলাশয়। ঝিল, বিল, ডোবা। শীতভর হাজারো পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। বড় বাহারে তাদের রঙরূপ। বড় তাদের নাম। তারা চকাচকি, শোলবউ, মানিকজোড়, কাজল, মরাল আর পান তারা কানঠুসী, কানঠুটি, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, নাকতা, পরাল আর খৈরী। আরো কত নাম। তাদের আরো কত প্রজাতি। ওইসব পরিযায়ী পাখির কলকা সারা বনাঞ্চল তখন মুখরিত হয়ে থাকে। আর সেইসব বাহারে পাখিদের নিধন শীতের অতিথিদের নিধন কল্পে সখের শিকারীরা শীতভর দাপিয়ে বেড়ায়। অরণ অরণ্যে। জলাশয় হতে জলাশয়ে।

সখের শিকারীরা তখন ধ্বংসে মাতে ঝিলে, বিলে, ডোবায়, অরণ্যে, বালিয়া প্রকৃতির রঙরূপের ধ্বংসেই তাদের আনন্দ।

ছোট্ট নদী, ছোট গাঙ। দুইপার তার অরণ্যে ঘেরা। মনে হয় যেন অরণ্যের বেড়া। তীর বরাবর বালিয়াড়ি। লম্বা ফিতের মতো চিকচিকে বালিয়াড়ি।

তো সেই ছোটগাঙের এপারটা হল রায়রায়ানদের জমিদারী। আর ওপারটা রায়বর্মনদের।

রায়রায়ানদের বিশাল জমিদারী। বনেদী বংশ। এরা প্রজাবৎসল। বৈষ্ণব পরিবারের বাস রায়রায়ানদের জমিদারীর একেবারে শেষ প্রান্তে। ছোট গাঙের তীরে।

এপারের রায়রায়ানদের তুলনায় ওপারের ওরা ছোট জমিদার। কিন্তু দাপট খু-উ-ব। প্রজা নিপীড়নে ওদের জুড়ি মেলা ভার। ওরা প্রচুর লেঠেল পোষে। লোকে বলে জমিদার প্রতাপ রায়বর্মণের ডাকাতের দলও আছে। ওরা ডাকাতি করে।

ওরা ডাকাতি করে। জলে এবং স্থলে। রাতে এবং দিনে। বড় গাঙে এবং গাঙ তীরবর্তী হাটে-বাজারে। তবে জমিদারী থেকে দূরে। বহুদূরে। অতিদ্রুতগামী ছিপে চড়ে।

লোকে বলে ওদের দলের ডাকাতগুলো কালো পোষাক পবে। মুখে ভুসো কালি মাখে। কপালে সিঁদুর লেপে। চোখগুলো লাল। টকটকে লাল। হাতে খোলা তলোয়ার। ওরা মানুষের ত্রাস।

তো সেই জমিদার প্রতাপ রায়বর্মণের গোটা পাঁচেক মেয়ে আর একটি মাত্র ছেলে। ছেলের নাম পলাশ। মেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়েছে ছেলেটারও। একবার নয়। দু'বার।

কিন্তু পলাশের জমিদারীতে মন নেই, বিষয়-আশয়ে টান নেই। ওর মন পড়ে থাকে লাঠি খেলায়, তলোয়ার খেলায়, বন্দুক চালনায়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ও তলোয়ার খেলে, বন্দুকের নিশানা ঠিক করে আর লেঠেলদের সঙ্গেও লাঠি খেলে।

ইদানীং পলাশের শিকারের দিকে ঝোঁক হয়েছে। আজকাল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শিকারে বেরোয়। ছোট গাঙের ওপারে। কখন-সখন সেতু পার হয়ে চলে আসে এপারে।

তখন শীতকাল। দুপুরবেলা। সোনঝরা গ্রামের সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। হঠাৎই বন্দুকের শব্দে সেই স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সহস্র বিহঙ্গের ভীত আর্তনাদে নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশের ছন্দ পতন ঘটল। একটি হত পরিযায়ী পক্ষী রাইচরণের আঙিনায় এসে আছড়ে পড়ল।

ছোট গাঙে স্নান সেরে এসে, এক কাপড়ে এলোচুলে ঠাকুর ঘরে বসে মালা গাঁথছিল কাবেরী। দুটি মালা। একটি শ্রীকৃষ্ণের এবং অপরটি শ্রীরাধিকার জন্য। মালা গাঁথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় ওই বন্দুকের শব্দ। এবং পরক্ষণেই এক হত পক্ষীর পতন শব্দ শুনে চকিতে ও ঠাকুর ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। আর বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমেই ওর নজরে পড়ল আঙিনার মাঝখানে পড়ে থাকা এক শ্বেতশুভ্র পক্ষীর রক্তমাখা নিথর দেহের প্রতি। এহেন দৃশ্য দেখে ও আঁতকে উঠল। এবং সঙ্গে

সঙ্গে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ঈস্! কোন্ সে নিঠুর আততায়ী আজ এমন অঘটন ঘটাল! বৈষ্ণবের আঙিনায়। রাধাবল্লভজীর অভয়াঙ্গনে। কোন্ সে হৃদয়হীন নিষাদ এই পবিত্র অঙ্গনকে করল অপবিত্র। সে কী মানুষ না পিশাচ!

অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল পলাশ। স-সঙ্কোচে। ধুতিপরা, সাদামাটা বাঙালির বেশে কাবেরী চুপ করতেই এগিয়ে এল সে। তারপর বিনম্রভাবে বলল, আমিই সেই হৃদয়হীন নিষাদ। তবে মানুষ, নহি পিশাচ। অজান্তে করেছি অপরাধ। দন্ড দাও। মাথা পেতে নেব। কিন্তু সুন্দরী, তার আগে তোমার কথা বল। কে তুমি? কোথা তোমার ঘর? এই নগন্য পল্লীতে তুমি বড় বেমানান!

এই পবিত্র পল্লীই আমার জন্মভূমি। আমার মাতৃভূমি। এই আমার ঘর। পরম বৈষ্ণব রাইচরণ এবং পরম বৈষ্ণবী ফুলমালার কন্যা আমি। কাবেরী আমার নাম।

বৈষ্ণব কন্যা তুমি? এ কী কথা বল! এ যে গোবরে পদ্মফুল সম!

যা হোক, আমি পলাশ। ছোট গাঙের ওপারে আমার বাস। কিন্তু তোমা হেন সুন্দরী এ তল্লাটে দেখি নাই আর। তবে সুন্দরী আছে অনেক। তাদের কেউ ফর্সা কেউ শামলা। কেউ কালো। কিন্তু তারা কেউই তোমা-সম নয়। তুমি অনন্যা।

হে সুন্দরী, তুমি ফর্সা নও। আবার কালোও নও। নেহাৎ শামলাও নও তুমি তোমার দেহবরণ উজ্জ্বল-শ্যাম। তোমার দেহবর্ণে আমি পরিমিত কৃষ্ণ এবং নীলের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করছি। আর তোমার ওই উজ্জ্বল শ্যামবরণ দেহ হতে প্রতিনিয়ত মৃদু আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাই তুমি সুতনু। তুমি সুপ্রভা।

হে সুন্দরী, তুমি দীর্ঘাঙ্গী। সুনয়না। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। পীন পয়োধরা। গুরু নীতম্বিনী এবং সুকেশী। তুমি সদ্যস্নাতা। তোমার বন্ধনহীন দামাল কেশগুচ্ছ হেলায় তোমার গুরুনিতম্ব অতিক্রম করেছে। তুমি অতীব সুরূপা। তুমি অনন্যা

একটু থেমে পলাশ আবার বলল, হে সুন্দরী, আমি বুঝতে পারছি নে, তোমার এই অপরূপ রূপের তুলনা আমি কার সঙ্গে করি। কালিদাসের যক্ষপত্নী? শেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা? নাকি মহাভারতের যজ্ঞোত্থিতা কৃষ্ণার সঙ্গে? তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তুমি নারীরত্ন। তুমি তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সুখস্পর্শাঙ্গী নারী।

কাবেরী এতক্ষণ অবাক হয়ে পলাশের মুখের পানে চেয়ে ওর কাব্যকথা শুনছিল এখন পলাশ চুপ করতেই কাবেরী বলল, হে গাঙপারবাসী, তোমার অতি প্রশস্তিতে আমার ক্ষুদ্র নারীহৃদয় একযোগে উদ্বিগ্ন, কম্পিত এবং উদ্বেলিত হচ্ছে। তুমি অপরিচিত হওয়ায় আমি তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত নই। আমি শুনেছি, নিজ উদ্দেশ্য সাধন মানসে পুরুষ সর্বদা অকুণ্ঠভাবে নারীর রূপ বর্ণনা করে তাকে আপ্লুত করে থাকে। সে কারণে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার জন্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত। এবং তোমার সম্যক পরিচয় লাভের জন্যও আমার সমান আগ্রহ।

কাবেরী চুপ করতেই পাশ থেকে এগিয়ে এল চাঁপা। সে এগিয়ে এসে বলল, ওঁর পরিচয় আমি দিচ্ছি, সই।

উনি আমাদের কুমার। ছোটকর্তা। পলাশ। রাঙা পলাশ। ওঁর মনটিও রাঙা পলাশের মতোই। উনি আমাদের জমিদার প্রতাপ রায় বর্মনের একমাত্র পুত্র। কলকাতায় থেকে উনি লেখাপড়া সেরেছেন। এই বছর দুয়েক হল পাশ দিয়ে উনি দেশে ফিরেছেন।

কিন্তু সই, ওঁর মনটা বড় উড়ো উড়ো। শিমূল তুলোর মতো। জমিদারীতে মন নেই। বিষয়-আশয়ে টান নেই। কারণ, জীবনে উনি যা চেয়েছেন তা পাননি। যা পেয়েছেন তাও উনি চাননি।

চাঁপার কথা শুনে পলাশ আশ্চর্য হল। এবং সে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি প্রগল্‌ভ বালিকা? আমার মনের নাগাল তুমি পাও কেমনে?

ঈশ্! আমি বালিকা? আমি ষোড়শী। আমি চাঁপা। চাঁপা ফুলের মতোই আমি সুবাস ছড়াই চারদিকে। আমি ধীবর দলপতি রসরাজ মল্লবর্মনের কন্যা। আমায় তুমি চেন না?

তাই বল! এবারে তোমায় চিনেছি। তুমি মউ-রাণী। ষোড়শী-রাণী তুমি। ধীবরপল্লীর শত যুবক তোমার হুলে হয়েছে ব্যথিত, জর্জরিত। তাদের কেউবা বাউরা বনেছে উত্তেজক মউ পানে। আবার কেউ বা ঘর ছেড়েছে, জলে ভেসেছে ঘর বাঁধবার আশে। তুমি ভাঙতে পার। জুড়তে জান। তুমি বালিকা নও। ষোড়শী। এবারে তোমায় চিনেছি।

পলাশের কথা শুনে চোখ ঠেরে, মুচকি হেসে চাঁপা বলল, আমার সই তোমার উদ্দেশ্য জানতে চাইছে। ওকে তোমার উদ্দেশ্য জানাও, কুমার।

কিন্তু তার আগে তোমার লোকজনদের বল এই হত পক্ষীটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। আর জল দিয়ে স্থানটিকে পরিষ্কার করে দিতে। মা মাধুকরী থেকে ফিরে এলে অনর্থ হবে।

অতঃপর পলাশের চোখের ইশারায় ওর লোকজন এসে হত পক্ষীটিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ডোবা থেকে জল এনে ওরা স্থানটিকে পরিষ্কার করে দিল।

কাবেরী মনে মনে ভেবে দেখল, কুমারের অন্যায় কর্মের জন্য ওকে তিরস্কার করা হয়েছে। এটা উচিত কর্ম। কিন্তু অতিথি আপ্যায়নও তো উচিত কর্ম। গৃহস্থের ধর্ম। সুতরাং সেটাও তো করা চাই। এসব ভেবে কাবেরী ঘর থেকে একখানা আসন এনে, দাওয়ার ধারে পেতে দিয়ে পলাশকে বসতে অনুরোধ করল। পলাশ আসনে বসল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান ভবিতব্য, ঈশ্বরের সৃষ্ট দুজন সুন্দর মানব মানবীকে নিয়ে তার ক্রিয়া শুরু করে দিল।

আর সেই জন্যই কাবেরী আসনে উপবিষ্ট পলাশের পানে চেয়ে ওর রূপে মুগ্ধ হল। এবং ও মনে মনে বলল, আমি যদি সুন্দরী হই তবে তুমিই বা অসুন্দর কিসে? আমি যদি অনন্যা হই তবে তোমারই বা অনন্য হতে বাধা কোথায়? আমি যদি সুরূপা, সুপ্রভা হই তবে তুমিও যে সুরূপ, সুপ্রভ। আমি যদি সুখ স্পর্শাঙ্গী হই তবে তোমার

স্পর্শও যে যেকোন নারীরই কামনার ধন। তোমা হেন সুন্দর পুরুষ আমিও যে আর দেখি নাই, হে সুজন!

কাবেরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে পলাশ মুখ তুলে ওর পানে চাইল তারপর ও বলল, তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। তুমি কি বিশেষ কিছু চিন্তা করছ সুন্দরী?

কাবেরী চকিতে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, কই, না তো! আমি ভাবছিলাম তুমি পরিশ্রান্ত। তুমি পিপাসার্ত। তাই—।

কাবেরী অচিরাৎ ঘরে যেয়ে একটা ছোট পাথরের বাটিতে কয়েকখানা বাতাস আর এক গেলাস ঠান্ডা জল এনে পলাশের সম্মুখে ধরল। পলাশ একখানা বাতাস মুখে দিয়ে জলপান করল। তারপর ও বলল, আমার উদ্দেশ্য জানার আগে আমার সম্বন্ধে তোমার আরো কিছু জানা উচিত, সুন্দরী।

আমার নাম কাবেরী।

হ্যাঁ, কাবেরী। দেখ, আমার জীবনের পথ বড় বন্ধুর। আর সেই অতি বন্ধুর পথে আমি নিঃসঙ্গ। একেবারে নিঃসঙ্গ। আর তাই আমি বিমর্ষ। আমি বিষণ্ন। আমি উদভ্রান্ত

পলাশের কথা শুনে কাবেরী বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে ফেল তাতে তোমার নিঃসঙ্গতা ঘুচবে। আর সঙ্গের উপসর্গগুলোও দূর হবে। শিক্ষিত সুদর্শন জমিদার পুত্রের তো আর পাত্রীর অভাব হবে না!

বিয়ে আমি করেছি কাবেরী। একবার নয়, দু'বার। পিতৃ আজ্ঞায়, জমিদারীর স্বার্থে কিন্তু তাতে আমার মন ভরেনি। আমার নিঃসঙ্গতা ঘোচেনি। কারণ ওদের কেউই আমার প্রিয়া হতে পারেনি। তাই আমার বিমর্ষ মন আজও গুমরে কাঁদে একজন মনের মানুষের জন্য।

পলাশের কথা শুনে কাবেরী অবাক হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইল। আর মনে মনে বলল, ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল!

একটু থেমে পলাশ আবার বলল, হ্যাঁ, পিতৃআজ্ঞায় আমি অনেক আগেই দু-দুটে বিয়ে করেছি।

আমার প্রথমা স্ত্রী একজন ধনীর দুলালী। নাম সৌদামিনী। আমার বয়স যখন চৌদ্দ বছর আর সৌদামিনীর দশ, তখনই আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু সৌদামিনী আমাকে কোন সন্তান দিতে পারেননি। তিনি বন্ধ্যা। শাস্ত্রে আছে বন্ধ্যা স্ত্রীকে দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়। তাই পিতৃআজ্ঞায় আমি শাস্ত্রবচন অনুসরণ করেছি। আমি আমার বন্ধ্যা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছি। তিনি এখন তাঁর পিত্রালয়ে।

আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম সুশীলা বালা। জমিদার তনয়া। প্রসবকালে তিনি মারা যান। মাতৃহারা বিলাস এখন ওর ঠাকুমা এবং জনাসাতেক পরিচারক-পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে বড় হচ্ছে।

পলাশের কথা শুনে কাবেরী অবাক হল। এবং ও বলল, আচ্ছা কুমার, তোমার

স্ত্রীকে কি আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়? অন্ততপক্ষে বিলাসের মুখ চেয়ে। মা-ছেলেটা তাহলে মা পেত। অন্যদিকে তোমার স্ত্রীও স্বামী সেবার সুযোগ পেতেন। না কাবেরী, তা সম্ভব নয়। আমার পিতা তা হতে দেবেন না। তিনি এখন র্বাহের মন নিয়ে 'উপযুক্ত' সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর তাছাড়া সৌদামিনীও এ পারে একেবারেই নিঃস্পৃহ।

সত্যিই কুমার, তোমার জীবনের পথ বড়ই বন্ধুর। আর তাই তোমার জীবনটাও সমস্যা সঙ্কুল। তবে সমাধানের পথও ওই একটিই। একজন সুপাত্রী দেখে আবার য় করা।

একটু থেমে কাবেরী আবার বলল, কুমার, তুমি এমন এক কন্যাকে বিয়ে কর যে তার ভালবাসা দিয়ে তোমার মন ভরিয়ে দেবে। তোমার নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে । তোমার প্রিয়া হবে। আর বিলাসকেও সে আপন সন্তানের মতো কাছে টেনে ।

কাবেরীর কথা শুনে চাঁপা বলল, তুই যেমন বলছিস, তেমন কন্যা ভগবান খুব ই গড়েন রে, সই!

হ্যাঁ, খুবই কম গড়েন। আর তাই অনেক সন্ধানের পরও সে কন্যার দেখা মেলে । কিন্তু তবুও দেখা মেলে। একদিন না একদিন দেখা মেলে। আর আমার মনে আজ আমি সেই কন্যার দেখা পেয়েছি, চাঁপা।

সত্যিই তুমি সেই কন্যার দেখা পেয়েছ, কুমার? কে সেই ভাগ্যবতী? কোথা ?

কিন্তু কুমার চাঁপার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সে চুপ করে বসে রইল।

তা দেখে চাঁপা আবার বলল, উত্তর দাও কুমার। কে সেই ভাগ্যবতী কন্যা? কোথা ঘর?

কিন্তু কুমার কোন উত্তর দিল না। তবে একটু পরে সে স্বগতোক্তি করল,

তার রূপ হেরি মন বলিল, শতদল কলি। / তার তিরস্কারে ঝরিল সুধা, মন হইল পাসার্ত অলি। / তার আপ্যায়নে চাতক মন হেরিল বরষা। / তার দরদীয়া হৃদি মনে গাইল আশা।

কুমারের স্বগতোক্তি শুনে চাঁপা অবাক হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল কার তরে তোমার এই স্বগতোক্তি? তুমি কার কথা বলছ, কুমার?

কুমার উত্তর দিল, সমুখে মোর শতদল কলি, আমি পিপাসার্ত অলি। / সে যে ধারা, আমি চাতকের পারা।

কুমারের উত্তর শুনে চাঁপা এবারে ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, । প্রেমে পড়লে ছেলেরা কবি হয়ে যায়। তুমি প্রেমে পড়ে গেছ। আমার সইয়ের একেবারে প্রথম সাক্ষাতেই।

তারপর চাঁপা বলল, তোমার সমুখে সই শতদল কলি। / তার তরে তুমি হলে

পিপাসার্ত অলি। / মোর সই বরষার ধারা। / তার পানে চেয়ে তুমি চাতকের পা
কি, ঠিক বললাম তো কুমার?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, চাঁপা। আমি তোমার সই কাবেরীর কথাই বলছি।

কিন্তু এ যে এক নিষ্ঠুর কাব্যিকথা! এ যে এক নিষ্ঠুর ঠাট্টা!

না চাঁপা, না। এ কাব্যকথা নয়। এ ঠাট্টাও নয়। এ সত্য। এ বাস্তব। কাবে
আমরা স্বপ্নে দেখা কন্যা। কাবেরীকেই আমি আমার জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে চা

কুমারের মুখ থেকে অমন খোলামেলা প্রস্তাব শুনে চাঁপা অবাক হল। আর কা
তা শুনে পরম আশ্চর্য বোধ করল। সে দু'পা পিছিয়ে যেয়ে দরজার কপাট ধ
দাঁড়িয়ে রইল। ওরা হতবাক। ওরা দু'জনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ ওরা তিনজনেই বাকশূন্য হয়ে রইল। কারো মুখে কোন কথা নাই

একটু পরে পলাশ বলল, দেখ চাঁপা, তোমার সই আমার উদ্দেশ্য জানার জ
বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। তাই আমি আমার উদ্দেশ্য জানালাম। আশা করি আ
সৎ উদ্দেশ্য জানার পর এখন তার উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে। আর তার দরদী মন, দ
হৃদয় দিয়ে আমার মনঃকষ্টও সে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

একটু থেমে পলাশ বলল, একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করে, জী
সঙ্গিনী করে তাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে পারে। আমিও তোমার সইকে সেই
সম্মানই দিতে চাইছি।

কিন্তু তবুও আমার অযাচিত প্রস্তাবে যদি ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, অ
অভব্যতা, তবে তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি এখন আসি।

পলাশ আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল

পলাশের প্রস্তাবে কাবেরী বুঝিবা সম্বিত হারিয়েছিল। এখন পলাশকে চলে যে
দেখে সে সম্বিত ফিরে পেল। এবং সে পলাশকে বলল, যেও না কুমার, যেও
ফিরে এসো।

কাবেরীর আহ্বানে পলাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখের পানে চাইল। কাবেরী ব
কুমার তোমার মনঃকষ্ট আমি সম্যক্ উপলব্ধি করেছি। আর তোমার প্রস্তাবে ধৃ
বা অভব্যতাও প্রকাশ পায়নি। বরং তোমার সরল মনের কথাগুলো তুমি সোজাভ
বলেছ বলে আমার তা ভাল লেগেছে। তবে হঠাৎ তোমার ওইরকম একটা প্র
শুনে আমি অবাক হয়েছি, বিহ্বল হয়েছি, লজ্জিতও হয়েছি। তবে বিশ্বাস কর কু
আমি একটুও ক্ষুব্ধ হইনি।

একটু থেমে কাবেরী বলল, আমাকে তোমার ভাল লেগেছে জেনে আমি
হয়েছি। কিন্তু তোমার আমার মধ্যের বিরাট ব্যবধানের কথা চিন্তা করে আমি দুঃ
পেয়েছি, কুমার।

দেখ, তোমাদের উঁচু তলার সমাজ-সংসার, তোমাদের মান-মর্যাদা, তোমা
আভিজাত্য, তোমাদের অহংবোধ তোমার আমার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি ক

রেখেছে। সেই ব্যবধানের দুই পারে দাঁড়িয়ে আমরা দু'জন দু'জনকে জানতে পারি, বুঝতে পারি, দু'জন দু'জনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। ব্যস্, ওই পর্যন্তই। কিন্তু সেই ব্যবধান অতিক্রম করে আমরা দু'জন দু'জনের কাছাকাছি হতে পারিনে। আমরা দু'জন দু'জনকে আপন করে পেতে পারিনে। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি বল তো, কুমার?

কাবেরী চুপ করতেই চাঁপা বলল, আমার সই তো আর কিছু মিথ্যে বলেনি, কুমার। আমার সইকে তোমার ভাল লেগেছে। এতে ও খুশি হয়েছে। আমিও খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা অতিক্রম করে দু'জন দু'জনের কাছে আসা, দু'জন দু'জনকে আপন করে পাওয়া, তা তো আর সম্ভব নয়। কারণ তোমার বাবা-মা, তোমার আপনজনেরা তা হতে দেবেন না কিছুতেই।

একটু থেমে চাঁপা আবার বলল, আসলে বিয়ে-সাদিটা সমানে সমানেই মানায় ভাল। অন্যথায় অনর্থ ঘটে। আর এক্ষেত্রে অনর্থ ঘটাবেন তোমার বাবা-মা, তোমার আপনজনেরা। হয়তো বা তারা আমার সইয়ের প্রাণসংশয়ও করে তুলবেন!

তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি কুমার, মাধুকরীর অন্নে যে পরিবার প্রতিপালিত হয়, সেই পরিবারের কন্যাকে ভালবাসা তোমার মানায় না। কারণ অমন অসম ভালবাসার কোন পরিণতি নেই। অমন অসম ভালবাসা কোনদিন পরিণয় অবধি গড়ায় না।

চাঁপা চুপ করতেই কুমার বলল, দেখ চাঁপা, ভালবাসা ভালবাসাই। ভালবাসা কখনও উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র মানে না। আর পরিণতিহীন ভালবাসার পথে আমি পা বাড়াইনি। আমার ভালবাসার লক্ষ্য পরিণয়।

আর আজ থেকে কাবেরীকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি নিলাম। আমার প্রাণ দিয়েও ওকে আমি রক্ষা করব। এই আমি কথা দিলাম।

তবুও আমার আরো কিছু বলার আছে, কুমার। দেখ, আমার সইয়ের রূপ আছে, গুণ আছে, দরদী মন আছে। কিন্তু তোমাদের উঁচু তলার মানুষ যে সামাজিক মর্যাদা চান, যে বংশকৌলীন্য চান, আমার সইয়ের তা নেই। তো সামাজিক মর্যাদাহীন, বংশকৌলীন্যহীন আমাদের এই রূপবতী, গুণবতী কন্যাকে কী তোমার বাবা মা তাঁদের পুত্রবধূরূপে মেনে নেবেন? আমার সই কী তোমাদের উঁচুতলার সমাজ-সংসারে ঠাঁই পাবে?

না। তাঁরা মেনে নেবেন না। তোমার সইকে তাঁরা তাঁদের পুত্রবধূরূপে মেনে নেবেন না। আর বনতুলসীর রাজপ্রাসাদেও তার ঠাঁই হবে না।

কিন্তু চাঁপা, আমি তো তোমার সইকে মেনে নিচ্ছি। আমার স্ত্রীরূপে আমি তো তাকে আমার বুকে ঠাঁই দিতে প্রস্তুত আছি। রাজপ্রাসাদের চেয়ে সে ঠাঁই কী কিছু কম?

কিন্তু ভেবে দেখ কুমার। তোমার পরিবারের সকলের অমতে তুমি আমার সইকে পরিণয় সূত্রে বাঁধতে চাইছ। এতে তোমার পরিবারের সকলেই তোমার প্রতি রুষ্ট হবেন। সবাই তোমাকে অপরাধীর আসনে বসাবেন। আর এই অপরাধের জন্য তোমার পিতা হয়তো তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, চাঁপা। আমার মতো অবাধ্যপুত্রকে তিনি ত্যাজ্য পুত্রই করবেন।

বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ, কুমার। বনতুলসীর রাজপাট ছেড়ে, কপর্দকহীন পরিবারের এক কন্যার হাত ধরে তুমি পথে নামতে চাইছ। ব্যাপারটা একবার ভাল করে ভেবে দেখ!

এতে ভাববার কিছু নেই, চাঁপা। প্রজা নিপীড়নের রাজপাট, তস্কর বৃত্তির রাজপাট, মদগর্বের রাজপাট আমার প্রয়োজন নেই। ও সব আমি ঘৃণা করি। একজন সাধারণ মানুষ হয়ে আমি শান্তিতে থাকতে চাই। আমি সুস্থভাবে বাঁচতে চাই। আমি প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

তুমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে জন্মেছ কুমার।

পলাশ কোন কথা না বলে দাওয়ার ধারে পাতা আসনে এসে বসল।

তখন কাবেরী দু'পা এগিয়ে এসে দাওয়ার খুঁটি ধরে পলাশের পাশে দাঁড়াল। তারপর নিম্নস্বরে ও পলাশকে বলল, চাঁপা তো ঠিকই বলেছে, কুমার। বড্ড বেশি ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি বনতুলসীর রাজপাট ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াতে চাইছ। কিন্তু কেন বল তো? এদেশে কি সুন্দরী কন্যের এতই আকাল পড়েছে যে সামাজিক মর্যাদাহীন, বংশ কৌলীন্যহীন, কপর্দকহীন পরিবারের এক কন্যের হাত ধরে তুমি একেবারে পথে এসে দাঁড়াতে চাইছ?

তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই, কাবেরী। তবে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তাই তোমাকে পাওয়ার জন্য আমাকে যতদূর যেতে হয়, আমি যাব।

কিন্তু আমার জন্য তোমার কোন ক্ষতি হোক এ আমি চাইনে। আমার জন্য তুমি বনতুলসীর জমিদারী থেকে বঞ্চিত হও, এও আমি চাইনে, কুমার।

তখন চাঁপা এগিয়ে এসে বলল, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। এখন তোমরা দু'জনেই চুপ কর।

তারপর ও পলাশের দিকে চেয়ে বলল, কুমার, পাখি মারার জন্য তুমি সেই সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরেছ। অনেক পাখি মেরেছ। এবার ঘরে ফিরে যাও। ঘরে ফিরে ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা কর। তারপর যা হয় দেখা যাবে। তোমার স্বপ্নে দেখা কন্যে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

অগত্যা সাঙ্গপাঙ্গ সহ এক বোঝা প্রাণহীন পাখি নিয়ে পলাশ বনতুলসীর উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

পলাশ দলবল নিয়ে চোখের আড়াল হতেই কাবেরী চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সই, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে কুমারের মতিগতি কিছু বদলাবে বলে তোর মনে হয়?

না। তেমন আশঙ্কা নেই।

তাহলে কী হবে রে, সই?

কী আবার হবে। ভাল লাগলে ঝুলে পড়বি।

ভাল তো লেগেছে, সই। বড্ড ভাল লেগেছে। অমন সুন্দর সুপুরুষকে কার না ভাল লাগে। আর অমন করে চাইলে কে না ধরা দেয়। কিন্তু কথা হল, কুমার যে আগেই—

দু'টো বিয়ে করেছে? তাতে কী হয়েছে, শুনি? রাজা-গজারা অমন দুটো তিনটে বিয়ে করেই থাকে। রাজা দশরথ তো তিন-তিনটে বিয়ে করেছিলেন। ওতে দোষের কিছু নেই। তোর রাস্তা তো পরিষ্কার রয়েছে। তোর ভাবনা কী?

একটু থেমে চাঁপা বলল, কুমারের প্রথম বউটা বাঁজা। দশ বছরেও একটা বাচ্চা বিয়োতে পারেনি। অতএব মেয়াদ শেষে সে বাতিল হয়ে গেছে। আর পরের টা বিয়োনোর পর-পরই সঙ্গে গেছে। সুতরাং তোর রাস্তা একেবারে সাফ্।

কিন্তু আমার কেমন ভয় করছে রে, সই। আমিও যদি একদিন মেয়াদী হয়ে যাই। বাতিল হয়ে যাই। তখন?

দূর! মেয়েমানুষ হয়ে বাচ্চা বিয়োতে পারেনি এমন ঘটনা ক'টা ঘটে শুনি? ও ভয় তুই করিস নে, সই।

আসরের পেছনে বসে সর্বজ্ঞ মশাই মাঝে মাঝেই উসখুস করছিলেন। বোধহয় উনি কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু রামলোচন খুড়োর আপত্তির কথা চিন্তা করে উনি নিজেকে সংযত করছিলেন। তবে এবারে আর উনি নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। তাই কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করে উনি বললেন, কিছু আপত্তিকর দেশজ, অসংস্কৃত ভাষা পরিহার করিয়া শুদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর ভাষায় উপাখ্যান পরিবেশন করার কথা চিন্তা করা হউক। অন্যথায় আমাকে অত্র আসর ত্যাগ করিবার কথা চিন্তা করিতে হইবে।

সর্বজ্ঞ মশাইয়ের কথা শুনে খুড়ো বললেন, গ্রাম বাংলার মহিলা মহলে যে ভাষা প্রচলিত, আগন্তুক চাঁপার মুখ দিয়া তাহাই পরিবেশন করিয়াছে। এবং উহা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অতএব আসর ত্যাগের বাসনা আপাততঃ পরিত্যাগ করা হউক।

তারপর আগন্তুকের দিকে চেয়ে খুড়ো বললেন, তুমি চালিয়ে যাও, ভায়া।

অতএব আগন্তুক শুরু করলেন। তো একটু থেমে চাঁপা আবার বলল, ওসব শাস্ত্র-টাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র। আসলে কুমারের প্রথম বউটা বাতিল হয়েছে ওর বাবার প্ররোচনায়। স্বার্থের কারণে। কারণ জমিদার প্রতাপ রায় বর্মণ মানুষটা হলেন অর্থ পিচাশ। তবে কুমার তেমন নয়। আর সবাই তেমন হয়ও না।

এই দেখ না, আমাদের পাড়ার ফটিক হালদারের বউটা বাঁজা। বিয়ের বিশ বছরেও ওর একটা বাচ্চা হয়নি। কিন্তু কই, ফটিক হালদার তো ওর বউকে ত্যাগ করেনি। জোড়া ভাঙেনি। ওরা দু'জনে দু'জনকে কত ভালবাসে। ফটিক ভোরবেলায় উঠে খ্যাপলা জালে মাছ ধরে আনে। আর ওর বউ পারুল মাথায় করে সেই মাছ বাজারে নিয়ে যেয়ে বিক্রি করে। ওরা ভাল আছে। ওরা সুখে আছে রে, সই।

একটু থেমে চাঁপা বলল, প্রথম দর্শনেই কুমার তোকে ভালবেসেছে। তোকে ওর ভাল লেগেছে। তাই ওর ভাল লাগার, ওর ভালবাসার দাম তোকে দিতে হবে।

তাছাড়া ভেবে দেখ, তোর মা তো ওই আধবুড়ো, হাড়কিপ্টে জনার্দন দাসের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চাইছেন। কারণ ওর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই খেয়ে পরে সুখে থাকবি, এই আশায়। কিন্তু ভেবে দেখ, খেয়ে পরে সুখে থাকাটাই কী সব? মানুষের মন বলে কী কিছু নেই?

আচ্ছা বলতো সই, ওই আধবুড়োটার সঙ্গে তোর বিয়ে হলে ওকে তুই মন থেকে মেনে নিতে পারবি কোনদিন? আমি জানি তুই তা পারবি নে। কোনদিনও পারবি নে অথচ তোকে ওর সতী-সাধ্বী স্ত্রী হয়ে ওর সঙ্গে তোর সারাটা জীবন কাটাতে হবে মেয়েমানুষের পক্ষে সেটা কতবড় বিড়ম্বনা বলতো?

তার চেয়ে কুমার ভাল। অনেক ভাল। কুমার সুদর্শন। কুমার পৌরুষের প্রতীক কুমার উচ্চশিক্ষিত। কুমার ঝকঝকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, প্রথম দর্শনেই কুমার তোকে ভালবেসেছে। তুইও কুমারকে ভালবেসেছিস। আর ভালবাসার জন্য পথেও নামা যায় রে, সই।

একটু থেমে চাঁপা আবার বলল, আসলে কুমার এখন ওদের রাজপরিবারের হাজারো নিয়ম-নীতি, হাজারো আদব কায়দার বেড়াজাল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর বাবার বজ্র-আঁটুনি ভেদ করে ও মুক্তি পেতে চাইছে। ওর বাবার বন্ধ খাঁচা ভেঙে ও খোলা আকাশে উড়তে চাইছে। তবে একা নয়। একজন মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ও উড়তে চাইছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ও স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেতে চাইছে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের স্বাদ পেতে চাইছে। আর কুমারের সেই মনের মানুষটি হচ্ছিস তুই। তোর ভাগ্যকে আমার হিংসে হয় রে, সই!

আগন্তুক চুপ করতেই পাশ থেকে রহিম বলল, নতুন খুড়ো, তোমার কুমারের ডায়লগগুলো কিন্তু নেদো ময়রার রাজপুত্তুরের ডায়লগের সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে

গতবছর দুগ্গাপুজোর সময় পাঁচঘড়ায় গেছিলাম নেদো ময়রার যাত্রাপালা শুনতে তো সেই পালার রাজপুত্তুরও রাজকন্যেকে ঠিক অমনি ভাবেই ডায়লগ দিচ্ছিল। তুমি সুন্দরী। তুমি দীর্ঘাঙ্গী। তুমি সুনয়না, পীন পয়োধরা, সুকেশী। তুমি হেনা, তুমি তেনা —।

রহিমের কথা শুনে রামলোচন খুড়ো বললেন, চেপে যা রহিম। সময় নষ্ট করিস নে। রাজপুত্তুরদের ডায়লগ সবসময়েই এক এবং অভিন্ন হয়ে থাকে। সব পুরোহিতই যেমন একই মন্ত্রে গণেশ বন্দনা করে থাকেন, সব রাজপুত্তুরও তেমনি একই ডায়লগে রাজকন্যেদের মন ভিজিয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে অমনটাই চলে আসছে।

তারপর আগন্তুকের দিকে চেয়ে খুড়ো বললেন, নাও ভায়া, তুমি শুরু কর।

আগন্তুক আবার শুরু করলেন। তো সেদিন সন্ধ্যে হতেই পলাশ যেয়ে হাজির হল ওর মামা বসন্ত চৌধুরীর কাছে। মামার সদ্য নির্মিত গাঙতীরের বাগানবাড়ি, বিদিশা কুঞ্জে।

**এই অসময়ে ভাগ্নের আগমনে মামা অবাক হলেন। এই স্থানে, এই সময়ে মামা-**াগ্নের একত্র উপস্থিতি যে একেবারেই অবাঞ্ছনীয়, অনভিপ্রেত, ভাগ্নের তা অজানা য। কিন্তু তবুও—।

মামা বসন্ত চৌধুরী হলেন শৌখিন লোক। কলকাতার মানুষ। ওখানে ওঁর বড় াপের লোহা-লক্করের কারবার আছে। এই ক'দিন হল উনি বনতুলসীতে এসেছেন র দিদি জামাইবাবুকে দেখতে, তত্ত্ব-তালাশ করতে। একটু ঘুরতে ফিরতে। একটু ামোদ-স্ফূর্তি করতে। এমনটা উনি প্রায়ই এসে থাকেন। এমনটা উনি প্রায়ই করে াকেন।

সন্ধ্যার আগমনে শৌখিন বাবু অভ্যাস মতো দামী বিলিতি মদে গলা ভিজিয়ে য়ে, আরাম কেদারায় চোখ বুজে বসে, গুন গুন করে একখানা ক্লাসিক গানের সুর াজতে শুরু করেছিলেন। পলাশ যেয়ে হাজির হয়েছে ঠিক সেই সময়েই।

কিন্তু **এমন অসময়ে বাগান বাড়ির মজলিস ঘরে** ভাগ্নের উপস্থিতি যে একেবারেই াবাঞ্ছনীয়, অনভিপ্রেত! কারণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হবেন াবুর পারিষদেরা। হাজির হবেন সঙ্গতকারেরা। হাজির হবে চাকর-বাকরেরা। আর াজির হবে বিদিশা। বাতাসে দামী আতর আর গোলাপ জলের খুশবু উড়বে। বিলিতি দের ফোয়ারা ছুটবে। রাত বাড়তে থাকবে। বিদিশার নাচেগানে মজলিস জমে উঠবে।

বিদিশা। মৃত পালান বাগদীর মেয়ে বিদিশা। ওর স্বামী হারান বাগদী দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ। কেউ জানে না সে এখনও বেঁচে আছে না মারা গেছে।

তবে বিদিশার এখন আর ওসবে কিছু যায় আসে না হারান বাগদী নিরুদ্দেশ ওয়ার পর প্রথম দিকে ওর দিনগুলো বড় কষ্টে কেটেছে। খাওয়া জোটেনি। পরা জোটেনি। হাত পাতলে ওকে কেউ দুটো পয়সাও দেয়নি উল্টে দূর দূর করে তাড়িয়ে য়েছে।

আর আজ? আজ বিদিশার দিন ফিরেছে। দেহে রঙ ধরেছে, জৌলুস বেড়েছে। াল্লা দিয়ে বাবুদের কাছে ওর চাহিদা বেড়েছে। ওর আকর্ষণে বাবুরা আজ বিদিশা ঞ্জে ছুটে আসে। নামী ঘরানার নৃত্য-গীতে বাবুদের ও মাতিয়ে তোলে। বাবুদের কাছে বিদিশার আকর্ষণ আজ অপ্রতিরোধ্য।

বাগদী পাড়ার বাসিন্দারা আজ সম্মুখে বিদিশার তোয়াজ করে ওর কাছে হাত াতে। কিন্তু পশ্চাতে ওকে তারা ঈর্ষা করে। ঘোঁট পাকিয়ে নিন্দা করে। ছি, ছি করে। বিদিশা সব জানে; সব বোঝে। কিন্তু ওসবে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

যাহোক, মজলিস শুরু হওয়ার আগেই ভাগ্নের মুখ থেকে মামা কাবেরী কাহিনীর াদ্যপ্রান্ত শুনলেন। এবং শুনে তিনি মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। কিন্তু তিনি মুখে লিলেন, দেখ ভাগ্নে, এ বড় জটিল কেস। ফুট আর রুটের জটিলতা। তুমি ফুট দেখে মাহিত হয়েছ। কিন্তু তোমার মাথার উপরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রথমেই রুটের সন্ধান রবেন। তাঁরা শেকড়ের সন্ধানে নামবেন। আর সন্ধান করে তাঁরা যা জানতে

পারবেন, তাতে তাঁরা হতাশ হবেন, নিরাশ হবেন, বিরক্ত হবেন। এবং খুব স্বাভা কারণেই তোমার আর্জি তাঁরা খারিজ করে দেবেন। এসব জানা কথা। সব বড় এমনটাই হয়ে থাকে।

শোন ভাগ্নে, তুমি যদি কোন ঝুপড়িতে জন্মগ্রহণ করতে, অথবা কোন বস্তি তোমাকে এই ফ্রুট আর রুটের জটিলতার সম্মুখীন হতে হত না। কারণ ওই ঝুপড়িতে আর বস্তিতে যারা জন্মগ্রহণ করে, ওখানে যারা বসবাস করে, তারা স সাধারণ মানুষ তাদের একটিই পরিচয়, তারা সাধারণ মানুষ। আর ওইসব স সাদাসিধে সাধারণ মানুষগুলো ফ্রুট দেখে সিদ্ধান্তে আসতেই অভ্যস্ত। রুটের স করাটা তাদের কাছে বিলাসিতা মাত্র।

কিন্তু ভাগ্নে, তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি জন্মেছ রাজপ্রাসাদে। তুমি জ রাজপরিবারে। আর প্রতিটি রাজপরিবারেরই কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কিছু আ কায়দা আছে। কিছু ঠাট-বাট আছে। রাজপরিবারের প্রত্যেককে সে সব মেনে চ হয়। প্রত্যেককে যে সব মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

একটু থেমে মামা বললেন, দেখ, তুমি রাজপরিবারে জন্মেছ, কিন্তু তুমি তো মাতামহের অনুপ্রেরণার অনুপ্রাণিত হয়েছ। তাঁর অনুপ্রেরণায় তুমি উচ্চশিক্ষিত হ এবং তুমি রুচিশীল।

তুমি জমিদার তনয়। কিন্তু জমিদার তনয় হয়েও তুমি সুরাপান করনি, জলসাঘ ত্রিসীমানায় যাওনি। বাঈজী নাচের আসর বসাওনি। খোলা তলোয়ার হাতে গঞ্জ ব'রনি। তুমি উচ্চশিক্ষিত, রুচিশীল এবং বুদ্ধিমান। আর সেই কারণেই এ পথে বাড়ানো তোমায় মানায় না।

একটু থেমে মামা আবার বললেন, দেখ, এই ফ্রুট আর রুটের জটিলতার কা সারা জীবনে আমার আর বিয়ে করাই হয়নি।

প্রথম যৌবনে যে মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছিলাম তার নাম কমলা। কম রূপ ছিল, গুণ ছিল, একটি কোমল হৃদয় ছিল। কিন্তু তার কোন পিতৃপরিচয় ছিল সে ছিল পিতৃপরিচয় হীনা। আর তাই আমি তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারি সামাজিক মর্যাদা দিতে পারিনি। তাকে আমি কোন সন্তান দিতে পারি নি। অথচ আমাকে সব দিয়েছে। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। আর আমি তাকে শুধু বঞ্চ করে দিয়েছি।

শেষে হতাশায়, অবসাদে, আত্মগ্লানিতে বেচারী কমলা আত্মহত্যা করেছে। আমি আমার চলার পথের দিশা হারিয়েছি। আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছি। মানুষের ব আমি চৌধুরী বংশের কুলাঙ্গার হয়ে গেছি।

তাই বলছি ভাগ্নে, এসব জটিলতার মধ্যে না যেয়ে একটু সংযত হও। এসব থে সরে দাঁড়াও। মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলে দাও।

মামার কথা শুনে ভাগ্নে বলল, কিন্তু মামা, আমার পক্ষে আর সরে দাঁড়ানো স

নয়। একেবারেই সম্ভব নয়। যত জটিলতাই দেখা দিক না কেন, কাবেরীকে আমার চাই। ওকে আমি সামাজিক মর্যাদা দিয়েই পেতে চাই। ওর প্রাপ্য সম্মান দিয়েই ওকে আমি গ্রহণ করতে চাই। আর দেখ মামা,-একটু আগে তুমি যে সব ফুট আর রুটের কথা বলছিলে না, ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, কোন মানুষই তার নিজের জন্মের জন্য দায়ী নয়।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু—। কিন্তু দিদি জামাইবাবু কি—।

বাধা দিয়ে ভাগ্নে বলল, ওঁরা এটা মেনে নেবেন না। কিছুতেই মেনে নেবেন না। উল্টে বাবা হয়তো আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবেন। বনতুলসীর জমিদারী থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন। এসবই আমি জানি। কিন্তু তবুও আমি সরে দাঁড়াতে পারব না। পিছু হটতে পারব না। কাবেরীকে আমার চাই-ই। আর এ ব্যাপারে সফল হতে আমি তোমার সহযোগিতা চাই।

চিরকালের ভাল ছেলে, বাবা মায়ের বাধ্য ছেলে পলাশের মুখে অমন বেপরোয়া কথাবার্তা শুনে মামা বসন্ত চৌধুরী পড়লেন মহাচিন্তায়। কিন্তু তিনি মুখে বললেন, ঠিক আছে ভাগ্নে, ঠিক আছে। তুমি যখন মনস্থির করেই ফেলেছ তখন আর—।

তবে ভাগ্নে, আমায় তুমি দু'টো দিন সময় দাও। একটু ভেবে চিন্তে দেখতে দাও। একটু খোঁজ খবর করতে দাও। তারপর দেখি কি করতে পারি। তুমি বরং কাল বিকেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

অতঃপর মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাগ্নে প্রাসাদের পথে পা বাড়াল।

* * *

সন্ধ্যার পরে গাঙপার হয়ে চাঁপা আবার গেল কাবেরীদের বাড়ি। উদ্দেশ্য কাবেরীর মায়ের সঙ্গে কথা বলা।

চাঁপা বড় মুখরা মেয়ে। ওকে আবার আসতে দেখে কাবেরীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। ও সোজা পাশের ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমন অসময়ে চাঁপাকে আসতে দেখে কাবেরীর মা অবাক হলেন। উনি চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার রে, চাঁপা? এত রাত করে এলি যে! কুটিশ্বরকে দেখছি না তো?

চাঁপা বলল, রাত কোথায় দেখলে মাসি? এই তো সবে সন্ধ্যে হল। কুটিশ্বরের রাত-পাহারা। ও রাজবাড়ি গেছে। আমি একাই এসেছি।

ওমা! একা এলি! তোর ভয় করল না?

কিসের ভয় মাসি, ভূতের? আমার ভূতের ভয় নেই।

ভূত ছাড়াও ভয় পাওয়ার মতো আরো অনেক কিছু আছে রে, চাঁপা।

হ্যাঁ, তা আছে। সাঁঝের শুয়োর, প্রভাতের মোষ। এদেরকে নাকি সমীহ করে পথ চলতে হয়। তা আমি চলি। তবে বুনো মোষের টিকিও দেখিনি কোনদিন। ওরা আদৌ

এ অঞ্চলে আছে কিনা তাও জানিনে। তবে বুনো শূয়োর আছে। একদিন সাঁঝবেলায় এক বিরাট দাঁতাল শূয়োরের মুখোমুখি পড়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তবে ছোট মিঞা আমার জন্য সময় নষ্ট করেনি। তাচ্ছিল্য ভরে একবার আমার দিকে চেয়ে মিঞা নিজের পথ ধরেছিল।

ওরা চারপেয়ে শত্তুর। ওদের হাত থেকে রক্ষে পাওয়া যায়। মেয়েমানুষের বড় ভয় দুপেয়ে শত্তুর থেকে। বাগে পেলে ওরা মেয়েমানুষকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়।

তা হতে পারে। তবে সব মেয়েমানুষ তো আর সমান নয়, মাসি। বদ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দুপেয়ে শত্তুর ধীবরপল্লীর মেয়ের কাছে এগোলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

কথা বলতে বলতেই চাঁপা পেট-কোমরে হাত দিল। তারপর হঠাৎই সেখান থেকে একখানা লকলকে ধার কাটারি বের করে বলল, এর এক কোপে যে কোন বদ মরদের গলা দু'ফাঁক করে দেওয়া তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়, মাসি। রাতবিরেতে যখন আমি একা একা ঘরের বার হই, এটা আমার সঙ্গে থাকে।

রাধামাধব, রাধামাধব! এ তুই কী ভয়ঙ্কর কথা বলছিস রে, চাঁপা! মেয়েমানুষ হয়ে শেষে তুই পুরুষমানুষের সঙ্গে লড়াই করবি নাকি?

তা দরকার হলে করব। আমার এই হাত দু'খানা কমললতা নয়, মাসি। এ হাতে আমি শুধু ভাত রাঁধিনে, জাল ফেলে মাছও ধরি। আবার দরকার হলে এ হাতে আমি কাটারিও চালাতে পারি। বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই পারি।

চাঁপার কথা শুনে মাসি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা হ্যাঁরে, তোদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?

হবে। বছরখানেক দেরী হবে। বিয়ের একটা খরচ আছে না! বাবা কুটিশ্বরের কাছে একশো এক টাকা কণে পণ চেয়েছেন। কুটিশ্বর এখনও পুরো টাকা জোগাড় করতে পারেনি।

তোর বাবা কণে পণ নেবেন?

হ্যাঁ, নেবেন। ধীবর দলপতির কন্যেকে ঘরে তুলতে গেলে কণে পণ দিতে হয়। ওটাই রেওয়াজ।

একটু পরে চাঁপা কাবেরীর মাকে জিজ্ঞাসা করল, তা মাসি, আমার সইয়ের বিয়েটা কবে দিচ্ছ? শুভ কাজটা সেরে ফেল তাড়াতাড়ি।

সবই তো বুঝিস চাঁপা! সেই কথায় বলে না, ঘর তুলতে দড়ি আর বিয়ে দিতে কড়ি। তা আগে কড়ির জোগাড় হোক। তারপর না বিয়ে।

একটু থেমে মাসি বললেন, জনার্দনের বড় হাতটান। ওর স্বভাবটাই অমন ধারা। নইলে কবেই বিয়েটা হয়ে যেত।

তা জনার্দন দাসকে কাবেরীর পছন্দ তো, মাসি?

ওমা! এ আবার কেমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলিস রে, চাঁপা? কনে নিজেই তার বর পছন্দ করবে নাকি! এমন কথা আমি বাপের জন্মেও শুনিনি বাছা!

পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে কাবেরী সবই শুনছিল। এবারে ওর অস্বস্তি বাড়ল।

একটু থেমে কাবেরীর মা বললেন, ওদের সংসারে তো মাত্র দুটি প্রাণী। বিধবা মা আর বেটা। সচ্ছল সংসার। ওখানে বিয়ে হলে কাবেরী সুখেই থাকবে।

কথা বলতে বলতেই কাবেরীর মা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ওঁর মনে পড়ল দুর্যোগের রাতগুলোতে কাবেরীর গর্ভধারিণীর অলৌকিক উপস্থিতি এবং তার অনুনয়ের কথা, 'আমার মেয়েটাকে একটু দেখেশুনে রেখো গো। ও যেন একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। ও যেন একটু শান্তিতে থাকতে পায়।'

কাবেরীর মা মনে মনে ভেবে দেখলেন, জনার্দনের হাতে পড়লে কাবেরী সুখেই থাকবে। শান্তিতেই থাকবে। আর তা হলে কাবেরীর গর্ভধারিণীর বিদেহী আত্মাও শান্তি পাবে। উনিও কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবেন। উনি মনে মনে বললেন, হে রাধাবল্লভ, তাই যেন হয়। কাবেরীকে যেন আমি ভালয় ভালয় জনার্দনের হাতে তুলে দিতে পারি।

কিন্তু কাবেরীর মায়ের ইচ্ছা ছিল একরকম আর রাধাবল্লভজীর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। আসলে মানুষের সকল ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন না। কেন যে করেন না সে কথা শুধু ভগবানই জানেন। অন্য কেউ নয়।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করল, সুখ বলতে কি দুবেলা পেট পুরে খাওয়া আর বছরে দুখানা নতুন শাড়ির কথা বলছ, মাসি?

হ্যাঁ তাই। আমাদের ঘরের মেয়েদের ওই ঢের। অনেকের ভাগ্যে যে ওটুকুও জোটে না।

তা হয়তো জোটে না। কিন্তু যাদের জোটে না তাদের সঙ্গে তুমি কাবেরীর তুলনা কোরোনা, মাসি। কাবেরী তাদের থেকে আলাদা। একেবারে আলাদা।

একটু থেমে চাঁপা বলল, কাবেরীর রূপ আছে, গুণ আছে, পেটে কিছুটা বিদ্যেও আছে। সযত্নে লালিত কন্যে তোমার সোনার প্রতিমে। তার সঙ্গে তুমি হাভাতে ঘরের কন্যেদের তুলনা কোরো না, মাসি।

দেখ মাসি, কাবেরী বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। তাই ওর পছন্দ-অপছন্দ তো থাকতেই পারে। তুমি তো আর আটবছরে গৌরীদান করছ না। তুমি এক সোমত্ত কন্যেকে সৎপাত্রে দান করতে চাইছ। তো দান করার আগে সেই সোমত্ত কন্যের মতামতটা একবার জানতে চাইবে না?

চাঁপার কথা শুনে মাসি অবাক হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর উনি বললেন, অমন সচ্ছল পরিবারে বিয়ে ঠিক করলাম, তাতেও মেয়ের অপছন্দ! আমাকে কি তোরা রাজপুত্তুরের সন্ধানে বেরোতে বলিস নাকি?

তুমি রাজপুত্তুরের সন্ধানে বেরোবে কেন, মাসি? তোমার সোনার প্রতিমে কন্যের জন্য রাজপুত্তুরই তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে।

আমায় আর হাসাস নে, চাঁপা। সব সোমত্ত কন্যেই অমন স্বপন দেখে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে রাজপুত্তুর আসবে তাকে নিতে।

ওটা সোমত্ত কন্যেদের যৌবনের স্বপন। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বাস্ত
বড় কঠিন। বাস্তব বড় কঠোর রে, চাঁপা।

দেখ মাসি, জনার্দন দাসকে কাবেরীর অপছন্দ এমন কথা কিন্তু আমি তোম
একবারও বলিনি। আমি বলছিলাম, তোমার সোমত্ত, সুন্দরী কন্যেকে পাত্রস্থ কর
আগে তার মতামতটা একবার জেনে নিতে।

ও, তাই বল বাছা! আমি ভাবলাম জনার্দনকে বুঝি কাবেরীর অপছন্দ। তা বেশ তে
ডাক কাবেরীকে। তোর সামনেই ওর পছন্দ-অপছন্দের কথাটা জেনে নেওয়া যাক।

মাসির কথা শুনে চাঁপা কাবেরীকে ডাকল। বলল, সই, একবার এঘরে আয় তে
তোর মা ডাকছেন।

কাবেরী কিন্তু ওঘর থেকে এঘরে এল না। কোন উত্তরও দিল না। ছলছল চো
ও পাশের ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল।

চাঁপা আবার কাবেরীকে ডাকল, কিন্তু কাবেরী এল না।

বারবার ডাকা সত্ত্বেও কাবেরী এঘরে এল না দেখে চাঁপা যেয়ে পাশের ঘরে ঢুক
ঘরে ঢুকে চাঁপা দেখল, আবছা আলোয় কাবেরী ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কাছে যেতে দেখল, কাবেরী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

চাঁপা কাবেরীর কাঁধে হাত দিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর ওর কা
কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ও ফিসফিস করে বলল, সই, বোকামি করিস নে। তোর মনে
কথা এই বেলা তোর মাকে খুলে বল। নইলে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে!

আমি জানি সই, কুমার যেমন তোকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছে, তুইও তেম
কুমারকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিস। চল, ও ঘরে চল. এই বেলা তোর মাকে
খুলে বল।

চাঁপা কাবেরীর হাত ধরে ওকে ওর মায়ের ঘরে নিয়ে গেল। তারপর ওকে
মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, বল সই, তোর পছন্দ-অপছন্দের কথা তে
মাকে বল। তোর মনের কথা তোর মাকে খুলে বল।

কিন্তু কাবেরী কোন কথা বলল না। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে আঁচল চাপা দি
ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর একসময় কান্না থামিয়ে ও ধরা গলায় ও
মাকে বলল, মা, তুমি আমায় ছোট থেকে বড় করেছ। বড় আদরে, বড় যত্নে তু
আমায় মানুষ করেছ। অভাবের সংসারেও তুমি আমায় কোনদিন অভাব বুঝ
দাওনি। কতদিন স্নেহভরে তুমি তোমার নিজের মুখের গ্রাস আমার মুখে তুলে দি
তুমি নিজে অভুক্ত থেকেছ, অর্ধভুক্ত থেকেছ। তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে জানি
মা।

মা, আমার নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই। আমার নিজের পছন্দ
অপছন্দ বলেও কিছু নেই। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমার পছন্দই আম
পছন্দ।

একথা বলে কাবেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর আঙিনা পার হয়ে যেয়ে ও ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল।

কাবেরীর মা বললেন, শুনলি তো চাঁপা, আমার সোমত্ত, সুন্দরী মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। ওর পছন্দ-অপছন্দের কথা।

হ্যাঁ, শুনলাম। রাত হল। এবার বাড়ি যাই, মাসি।

চাঁপা কাবেরীর মায়ের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর আঙিনা পার হয়ে যেয়ে ও ঠাকুরঘরে ঢুকল। ঠাকুরঘরে ঢুকে ও দেখল, কাবেরী রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের সম্মুখে বসে রয়েছে। অনিমেষে ও যুগল বিগ্রহের মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। ওর চোখ দুটি জলে ভেজা।

চাঁপা কাবেরীকে জিজ্ঞাসা করল, এ তুই কী করলি, সই? কুমারের কথাটা একবার তুই ভেবেও দেখলি নে?

কাবেরী ধরা গলায় উত্তর দিল, আমি আমার মায়ের মনে দুঃখ দিতে পারব না, সই। তাতে যা হয় হোক, যা ঘটে ঘটুক। আমি নিরুপায়।

কাবেরীর কথা শুনে চাঁপা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ও বলল, রাত হল। বাড়ি যাই। তবে ঠাণ্ডা মাথায় কুমারের কথাটা একবার ভেবে দেখিস তুই। ভেবে দেখিস তুই তোর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটাও। আমি তোর ভাল চাই। চলি সই।

* * *

পরদিন সকালে বিদিশা যখন বিদিশা কুঞ্জের সাজঘরে বসে নিজ দেহ থেকে গতরাতের মাখা রঙ আর কাজল তুলে ফেলতে সচেষ্ট ছিল, শেষ হয়ে যাওয়া রাতের কালিমা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল, বাবু বসন্ত চৌধুরী তখন সাজঘরে ঢুকলেন। এই অসময়ে বাবুকে সাজঘরে ঢুকতে দেখে বিদিশা অবাক হল। আশ্চর্য বোধ করল। ও ভাবল, রাতভর পালা শেষে বাবুর তো এখন ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু—। কোন অঘটন ঘটল নাকি? নিজেকেই প্রশ্ন করল বিদিশা।

সদ্য খোঁয়ারি ভাঙা বাবু বসন্ত চৌধুরী আরামকেদারায় বসে গা এলিয়ে দিলেন। হাই তুললেন। তুড়ি মারলেন। তারপর উনি বললেন, কয়েকটা কথা আছে রে, বিদিশা।

বিনুনি খুলতে খুলতে বিদিশা বলল, বেশ তো, বল।

কথাগুলো কিন্তু গোপন রাখতে হবে!

বিদিশা অবাক হয়ে বাবুর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার গো, শালাবাবু?

শালাবাবু বিদিশাকে আদ্যন্ত কাবেরী-কাহিনী শোনালেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পরিস্থিতিতে কী করা যায় বল তো?

বিদিশা বলল, আর যাই করো বাপু, মেয়েটির সব্বোনাশ কোরো না। ধম্মে সইবে না। জনার্দন দাসের সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। যদি পার একটা ভাল কাজ করো। ফুলমালা বোষ্টমীকে কিছু অর্থ দান করো। আর তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের দুজনের বিয়েটা দিয়ে দাও।

কিন্তু আমার ভাগ্নেটা যে—।

বাধা দিয়ে বিদিশা বলল, তোমার ভাগ্নের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না। হতে পারে না কারণ, ফুলমালা বোষ্টমীর মেয়ে কাবেরী হল আর এক কমলা। ও মেয়ের প্রেমে মজলে তোমার ভাগ্নের দশাও হবে ঠিক তোমারই মতো। ভবিষ্যতে একদিন তোমার মতোই তোমার ভাগ্নেও মাতাল হয়ে কাবেরীকে কাছে ডাকবে। আর বলবে, কাবেরী তোমায় আমি বরবাদ করে দিয়েছি। আমি নিজেও বরবাদ হয়ে গেছি। তারপর তোমার মতোই তোমার ভাগ্নেও মদ গিলে, হেঁচকি তুলে বলবে, বিশ্বাস করো কাবেরী, আমি এমনটা চাইনি। আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। আমি তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা মা—।

আঃ বিদিশা! এসব হেঁয়ালি রাখ। আসল কথাটা বল।

কেন, এতসব শোনার পরও তুমি আসল কথাটা বুঝতে পারলে না?

না। পারলাম না।

বাবুর কথা শুনে বিদিশা বলল, আসল কথাটা হল, তোমার কমলার মতো কাবেরীও পিতৃপরিচয়হীনা। ফুলমালা বোষ্টমী ওকে ছোট থেকে লালন-পালন করে বড় করেছে। কিন্তু বোষ্টমী ওর মা নয়। বোষ্টম ঠাকুরও ওর বাবা নয়। কাবেরী কানীন কন্যা। এক কুমারী মায়ের সন্তান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই ওর মা মারা যায়। কেউ জানে না কাবেরীর বাবা কে।

বিদিশার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে বাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর উনি বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র কেমন রে?

ভাল। খুব ভাল। মেয়েটি সভ্য। মেয়েটি নম্র।

দেখ শালাবাবু, আমি নিজে খারাপ হতে পারি। কিন্তু যে ভাল তাকে আমি ভাল বলি।

আর দেখতে শুনতে?

দেখতে শুনতেও ভাল। কাবেরী রূপসী। কাবেরী ষোড়শী। কাবেরী বিদ্যেবতীও বটে।

দেখ, ইস্কুলের বিদ্যেটা হয়তো কাবেরীর তেমন বেশি নয়। কিন্তু বোষ্টম ঠাকুরের কাছে ও নানান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছে। তাছাড়া বোষ্টমীর কাছে ও গানবাজনাটাও শিখেছে ভাল। আমার মতে কাবেরী একটি নারীরত্ন।

মেয়েটাকে একবার দেখাতে পারিস, বিদিশা?

খুব পারি।

কবে দেখাবি?

আজই চল না। দুপুরে স্নানের ঘাটগুলো যখন সুনসান থাকে, কাবেরী তখন ওদের বাড়ির কাছের ঘাটে স্নান করতে আসে। ঝোপের আড়াল থেকে তোমায় আমি দেখিয়ে দেব।

তাহলে এখন উঠি রে, বিদিশা। দুপুরে আবার দেখা হবে।

* * *

তো সেদিন ভরদুপুরে বসন্তবাবু আর বিদিশা গিয়ে দাঁড়ালেন স্নানের ঘাটের কাছেরই এক ঝোপের আড়ালে। স্নানের ঘাট তখন সুনসান। আশেপাশেও কেউ কোথাও নেই।

কাবেরী একা স্নান করছিল। গলাজলে দাঁড়িয়ে ও স্নান করছিল। বসন্তবাবু চুপ করে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাশে দাঁড়িয়ে রইল বিদিশা।

কাবেরী একা স্নান করছিল। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করছিল। তা দেখে বসন্তবাবু বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রচন্ড শীতেও মেয়েটি এত দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করছে কেন?

বিদিশা উত্তর দিল, কুমারী কন্যেদের উদ্ভিন্ন যৌবন তাদের দেহে জ্বালা ধরায় যে! অথচ সে জ্বালা জুড়োতে বেচারীরা পথ খুঁজে পায় না। এদিকে আবার চন্দন আর বেনার মূল বেটে দেহে স্নিগ্ধ প্রলেপ দেওয়ার দিনও অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। নিরুপায় কুমারী কন্যেদের এখন তাই দীর্ঘ সময় স্নান করেই দেহের জ্বালা জুড়োতে হয়।

এসব কী হেঁয়ালি করছিস রে, বিদিশা?

ওমা! হেঁয়ালি আবার করলুম কোথায়? দেহ থাকবে অথচ দাহ থাকবে না, তাও কী কখনো হয়?

না! তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে!

তোমার বোঝার দরকারও নেই। অপেক্ষা কর। খানিকবাদেই কন্যে উপরে উঠে আসবে।

তো দীর্ঘ স্নানান্তে কাবেরী একসময় পা টিপে টিপে উপরে উঠে এল। তারপর সন্তর্পণে ওর বুকের গামছাখানা ও খুলে নিল। সেটা নিংড়ে নিল। অতি সন্তর্পণে মাথা মুছল। গা মুছল। খোলা চুলগুলো মুছল। তারপর গামছাখানাকে ও আবার নিংড়ে নিল। এবারে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে ও চিতিয়ে দাঁড়াল। তারপর ও মাথাটাকে একটা ঝাঁকুনি দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর একঢাল কালো চুল ওর পেছনে ছড়িয়ে পড়ল। এবারে ও দু'হাতে মুঠো করে ধরা গামছাখানা দিয়ে ওর পেছনের চুল ঝাড়তে লাগল। একটা ছট্‌ছট্‌ আওয়াজ উঠল। ওর চিতিয়ে ওঠা বুকে একটা হিল্লোল জাগল। হিল্লোল জাগল ওর সারা দেহে।

এই পর্যন্ত দেখে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বসন্তবাবু চোখ বুজলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর স্বগতোক্তি করলেন—

বিষাদপ্য মৃতং গ্রাহ্যম্
অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নিচাদপুত্তমং জ্ঞানং
স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি।।

বিদিশা অবাক হয়ে বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কী হল গো শালাবাবু? চোখ বুজলে কেন? অমন ঘুরে দাঁড়ালে কেন? আপনমনে ওসব কী বলছ?

বিদিশার কথা শুনে বসন্তবাবু চোখ খুললেন। ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর বিদিশার দিকে চেয়ে উনি বললেন, এসব অনেককাল আগের কথা। রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার চাণক্য নামে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত চাণক্যশ্লোক-এ তিনি বলেছেন বিষেও অমৃত থাকলে তা গ্রহণ করবে।/কুস্থান থেকেও কাঞ্চন তুলে নেবে।/নীচের কাছেও জ্ঞানার্জন করবে।/নারীরত্ন দুষ্কুলে জন্মালেও তাকে গ্রহণ করবে।

বসন্তবাবুর কথা শুনে বিদিশা প্রশ্ন করল, তাই যদি হয় তবে তুমি কেন কমলাকে গ্রহণ করনি? সামাজিক মর্যাদা দিয়ে কেন ওকে তুমি ঘরে তুলে নাওনি? রূপে-গুণে তোমার কমলাও তো কিছু কম ছিল না, শালাবাবু!

বসন্তবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমি তা করিনি। আসলে আমি তা পারিনি। কারণ, আমি ভীরু ছিলাম। আমি কাপুরুষ ছিলাম। আমি সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। আর তাই আমি আমার বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বেপাড়ার এক পিতৃপরিচয়হীনা রূপসী কন্যাকে বিয়ে করার কথা আমি ওঁদের মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আমি চেষ্টা করেছিলাম। বার বার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি।

আমার বাবা-মায়ের সামনে দাঁড়ালেই এক অজানা ভয় আমার কণ্ঠরোধ করত। আমার আজন্ম সংস্কার আমার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করত। আমি পিছিয়ে আসতাম।

বিদিশা, আমি স্বীকার করছি, কমলার প্রতি আমি অন্যায় করেছি। ঘোরতর অন্যায় করেছি।

বসন্তবাবু চুপ করতেই বিদিশা বলল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না শালাবাবু। কাবেরী এই পথেই বাড়ি ফিরবে।

বাবু বললেন, তাহলে চল আমরা ওই নীলকণ্ঠ শিবের চাতালে গিয়ে বসি।

ওই পুরনো শিবমন্দির জঙ্গলে ঢাকা। ওর আশপাশে সাপ-খোপ আর খুঁটে শুয়োরের আড্ডা। ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। এখন বরং তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও সন্ধ্যেয় আবার কথা হবে।

নারে বিদিশা, প্রাসাদে ফিরলে চলবে না। ব্যাপারটা জরুরী। তোর সঙ্গে আমা

অনেক কথা আছে। নিরিবিলিতে বসা প্রয়োজন। চল, ওই মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসি জনে।

অতঃপর ওঁরা দুজনে জঙ্গলাকীর্ণ নীলকণ্ঠ মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসলেন। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর। ভরদুপুরেও সূর্যের আলো ওখানে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়নি। অগ্রহায়ণের হিমেল হাওয়া ওঁদের দুজনকে কাঁপিয়ে দিল।

বিদিশা বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলে ফুলমালা বোষ্টমীর মেয়ে কাবেরীকে?

ভাল। খুব ভাল। তোর কথাই ঠিক। কাবেরী রূপসী। কাবেরী ষোড়শী। কাবেরী নারীরত্ন।

তাহলে জনার্দন দাসের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিচ্ছ তো?

না রে বিদিশা, তা হয় না। ওই মধ্যবয়সী গুড়ের কারবারী জনার্দন দাসের গলায় এ রত্ন মানাবে না। বাঁদরের গলায় রত্নহার মনে হবে।

তা হলে? তাহলে কার গলায় মানাবে শুনি?

আমার ভাগ্নের গলায়। পলাশের গলায়। ওর গলায় এ রত্ন মানাবে ভাল।

বসন্তবাবুর কথা শুনে বিদিশার বুক কেঁপে উঠল। বিস্ময়ভরা চোখে ও বাবুর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাবেরীর সম্বন্ধে সব কথা শোনার পরেও তুমি একথা বলছ, শালাবাবু?

হ্যাঁ, বলছি। সব কিছু ভেবেচিন্তেই আমি একথা বলছি।

একটু থেমে বসন্তবাবু বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুই দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান শুনেছিস?

হ্যাঁ, শুনেছি।

তাহলে? শকুন্তলাও তো বারাঙ্গনা-কন্যা। ওর মা মেনকা স্বর্গের বারাঙ্গনা। তা সত্ত্বেও তো রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিয়ে করেছিলেন। ওঁকে রাজমহিষী করেছিলেন

কিন্তু যুগটা যে বদলে গেছে। বদলে গেছে এ দেশের সমাজ ব্যবস্থা। আজকের দিনের শকুন্তলারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশের অধিকার হারিয়েছে!

আচ্ছা দেখাই যাক না। আজকের দিনেও অন্ততপক্ষে একজন শকুন্তলা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে কিনা! রাজমহিষী হতে পারে কিনা!

না, তা পারবে না। তোমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। অথচ তোমার এই খামখেয়ালীর জন্য অকারণে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাবে।

তুই কী ভয় পাচ্ছিস বিদিশা?

হ্যাঁ, পাচ্ছি। তবে ভয় আমার নিজের জন্য নয়। তোমার বা তোমার ওই ভাগ্নেটার জন্যও নয়। আমি ভয় পাচ্ছি ওই অসহায় কাবেরীর জন্য।

একটু থেমে বিদিশা বলল, রাজাবাবুকে তুমি এখনও চেননি শালাবাবু। কোন বেনোজলকে উনি রাজপরিবারে ঢুকতে দেবেন না। ওঁর কানে এসব কথা উঠলে

কাবেরীকে উনি তুলে নিয়ে গিয়ে গুমঘরে ঢুকিয়ে দেবেন। আর তুমি নিশ্চয়ই জা যে, রাজা প্রতাপ রায়বর্মনের গুমঘরে ঢুকেছে অনেকে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে বেরি আসতে পারেনি একজনও।

গুমঘরে তোর বড় ভয়, তাই না রে বিদিশা?

হ্যাঁ, ভয়ই তো। অত্যাচারী রাজার গুমঘর হল পাতালপুরীর এক মৃত্যুগহ্ব একবার ওখানে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা যায় না।

একটু থেমে বিদিশা বলল, গুমঘর, বারুদঘর, অস্ত্রাগার, সিপাইবাড়ি, লেঠে ছাউনি, ওসব কথা শুনলেও আমার রক্ত হিম হয়ে যায়!

তুই মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস, বিদিশা। আমি কোন ঝুঁকি নেব না। তোদের রাজাবা কানে এসব কথা ওঠার অনেক আগেই আমি কাবেরী আর পলাশকে নিয়ে অনেক দূ চলে যাব। তোদের রাজাবাবুর নাগালের বাইরে চলে যাব। আর তারপর আমি নি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দুজনের বিয়ে দেব। এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম!

হঠাৎই বিদিশা চাপাস্বরে বলল, চুপ কর শালাবাবু, চুপ কর! মন্দিরের আড়া দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের কথাবার্তা শুনছে! ও নিশ্চয়ই রাজাবাবুর লোক!

বিদিশার কথা শুনে বসন্তবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মন্দিরের আশেপাশে খুঁ দেখলেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই দেখে উনি চিৎকার করে বললেন, দূর! তুই ভু দেখেছিস। এদিকে কেউ কোথাও নেই। আসলে রাজাবাবুর ভয়ের ভূত তোর গি তাড়া করেছে।

বসন্তবাবু ফিরে আসতেই বিদিশা বলল, আমি বাড়ি চললুম। তুমিও মহলে ফি যাও। এখানে আর একটি কথাও নয়।

বসন্তবাবুর ' তির অপেক্ষা না করেই বিদিশা চলে গেল। বাবু ক্ষুণ্ণমনে কিছুক্ষ মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তারপর উঠে গেলেন।

* *

বসন্তবাবু যাই বলুন না কেন, বিদিশা কিন্তু ভুল দেখেনি। ভুল বলেনি। ভু অনুমান করেনি।

দুপুরবেলায় জঙ্গলে ঢাকা নীলকণ্ঠ শিবের চাতালে বসে বসন্তবাবু যখন বিদিশ সঙ্গে কথা বলছিলেন, রাজাবাবুর গুপ্তচর কানাপরান তখন মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ি ওর একটা চোখ দিয়ে ও ওঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। ওর দু' কান দিয়ে ও ওঁ কথাবার্তা শুনছিল।

নিয়মমাফিক সন্ধ্যেয় রাজবাড়ি গিয়ে কানাপরান রাজাবাবুর কানে খবরটা তু দিল। কিন্তু খবরটা শুনে রাজাবাবু অবাক হলেন। উনি কানাপরানকে জিজ্ঞা করলেন, পরাণ, তুই ঠিক দেখেছিস, শালাবাবু নীলকণ্ঠ শিবের জঙ্গলে বসে ব বাইজীটার সঙ্গে সলা করছিল? মহিলা অন্য কেউ নয় তো?

কানাপরান হাতজোড় করে উত্তর দিল, আজ্ঞে না রাজাবাবু, মহিলা অন্য কেউ নয়। আমাদের শালাবাবু জঙ্গলে বসে ওই বিদিশা বাইজীর সঙ্গেই সলা করছিলেন।

আপনি তো জানেন হুজুর, আমার কোন খবর কখনও ভুল হয় না। আমার একটা চোখ দিয়ে আমি যা দেখি, আপনার অন্য লোকেরা তাদের দুটো চোখ দিয়েও তা দেখতে পায় না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের শালাবাবু ওই জঙ্গলে বসে বাইজীটার সঙ্গে সলা করতে গেল কেন? বাইজী-কুঠিতে বসে নয় কেন?

আজ্ঞে আমার মনে হয় হুজুর, বাইজী-কুঠির চাকর-বাকরদের মধ্যে যে আপনার কিছু লোক আছে, এটা ওঁরা অনুমান করতে পেরেছেন। আর সেই কারণেই ওঁরা কুঠিতে বসে সলা না করে ওই জঙ্গলে বসে সলা করছিলেন।

কানাপরানের কথা শুনে রাজাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর উনি বললেন, না, তা নয়! ব্যাপারটা অন্য কিছু!

যা হোক, তুই ফুলমালা বোষ্টমীকে চিনিস তো?

আজ্ঞে, ওকে সবাই চেনে হুজুর। বোষ্টমী গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। ওর গলাটা ভারি মিষ্টি।

ওর মেয়ে কাবেরীকে চিনিস?

আজ্ঞে, চিনি হুজুর। স্নানের ঘাটে ওকে দূর থেকে দেখেছি কয়েকদিন। মেয়েটি বেশ সুন্দরী।

মেয়েটিকে ভাল করে চিনে নে। ভাল করে চিনে রাখ। ওকে আমাদের প্রয়োজন হবে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রাজাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কানাপরান বলল, আজ্ঞে, বুঝেছি হুজুর।

জনার্দন দাসকে চিনিস তো?

আজ্ঞে চিনি হুজুর। রাজার হাটের মস্ত গুড়ের ব্যাপারী। গুড়ের ব্যবসা করে লোকটা অনেক পয়সা কামিয়েছে, কিন্তু স্বভাব-কঞ্জুস।

স্বভাব-কঞ্জুস ব্যাপারটা কি?

আজ্ঞে, এই স্বভাব-কঞ্জুস ব্যাপারটা হল গিয়ে; এই ধরুন, জনার্দন দাস বাড়িতে কোনদিন পেট ভরে ভাত খায় না। আধপেটা খায়। আবার ও কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গেলেও পেট ভরে না খেয়ে ওই আধপেটাই খায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, পেট ভরে খেলে নাকি ওর স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে। আর তার ফলে ভবিষ্যতে ওর ঘরে অনেক খাদ্যের অপচয় হবে। ওর অনেক পয়সার অপচয় হবে। স্বভাব ঠিক রাখার জন্যই নাকি ওর এই কৃচ্ছ-সাধন। এই আধপেটা খাওয়া!

আবার দেখুন হুজুর, জনার্দন দাসের অনেক পয়সা থাকলেও চিরটাকাল সে ওই আট-হাতি ধুতি পরে। কারণ জানতে চাইলে বলে—।

থাক। কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি। শোন। তুই কাল সকালে লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে দে, জনার্দন দাস যেন কাল দুপুরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

আজ্ঞে, কাল সকালেই আমি লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে দেব, হুজুর।

ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চোখ-কান খোলা রেখে চলবি। আর সব খবর ঠিক সময়মতো আমার কাছে পৌঁছে দিবি।

আজ্ঞে তাই হবে, হুজুর।

এখন যা!

কানাপরান হাতজোড় করে রাজাবাবুকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

সন্ধ্যেয় সাজঘরে বসে বসন্তবাবু বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুপুরবেলায় আমায় ছেড়ে তুই অমন পালিয়ে গেলি কেন রে, বিদিশা? আমার সঙ্গ কি তোর আর ভাল লাগে না? আমাকে কি তুই আর সঙ্গ দিতে চাস না?

না শালাবাবু, তুমি অমন কথা বোলো না। দুপুরবেলায় হঠাৎ ওই লুকিয়ে থাকা লোকটাকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই তোমার অনুমতি না নিয়েই আমি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না। আমায় তুমি অকৃতজ্ঞ ভেব না। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। আর চিরদিন আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।

একটু থেমে বিদিশা বলল, আমার সেই ঘোর দুর্দিনে তুমি আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান দিয়েছ। গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি আর সোনাদানায় ভরিয়ে দিয়েছ। আমার চারপাশে তুমি ঝি-চাকরের মেলা বসিয়ে দিয়েছ। ওস্তাদ রেখে তালিম দিয়ে আমায় তুমি নৃত্যগীতে নিপুণা করে তুলেছ। আমায় তুমি স্বাবলম্বী করেছ। আজ আমি একা চলতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস কর শালাবাবু, তোমাকে ছাড়া চলতে আমার মন চায় না।

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, তুমি আনন্দ পাও তাই আমি মজলিস করি, মেহফিল বসাই। তুমি আনন্দ পাও তাই আমি তোমার সঙ্গে 'দেশবিদেশে' ঘুরে নৃত্যগীতের আসর জমাই। এর পরেও কী বলবে, তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগে না. তোমাকে আমি সঙ্গ দিতে চাই না?

বিদিশার কথা শুনে বাবু কিছুক্ষণ চোখ বুজে, ঝিম মেরে বসে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বিদিশার দিকে চেয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল তো বিদিশা, তোকে আমি এত ভালবাসি কেন?

কেন? জানতে চাইল বিদিশা।

কারণ, তোর মাঝে আমি আমার কমলাকে খুঁজে পাই, সেই জন্য। তোর আচার-

ব্যবহার, তোর চলা-বলা, তোর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তুই প্রায়ই কমলা হয়ে উঠিস। আমার চোখে বিদিশা আর কমলা তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

একটু থেমে বাবু বললেন, দেখ, কমলাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি। সুখ, শান্তি কিচ্ছু না। অথচ ওকে আমি বরবাদ করে দিয়েছি। সে দুঃখ আমি ভুলতে পারিনে রে, বিদিশা।

একটু থেমে বাবু আবার বললেন, আচ্ছা বিদিশা, তোকে তো আমি সব দিয়েছি। বাড়ি, গাড়ি, টাকা-কড়ি সব। আচ্ছা, এসব পেয়ে তুই সুখী হয়েছিস তো? শান্তি পেয়েছিস তো? বাড়ি, গাড়ি, টাকা-কড়ি তোকে সুখ দিতে পেরেছে তো? শান্তি দিতে পেরেছে তো?

তারপর উনি বললেন, বিদিশা, যদি সুখী হয়ে থাকিস, শান্তি পেয়ে থাকিস তবে মদটা তুই ছেড়ে দে। মেয়েমানুষের মদ খাওয়া ভাল নয়!

একটু থেমে উনি আবার বললেন, আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি, বোতল বোতল মদ গিলে তুই বেসামাল হয়ে পড়িস। আবোল-তাবোল বকিস। অশালীন আচরণ করিস। কখনও বা দিগম্বরী রূপ ধারণ করিস। মেয়েমানুষের অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় রে, বিদিশা!

বাবুর কথা শুনে মুচকি হেসে বিদিশা বলল, নেশার ঝোঁকে এসব তুমি কী বলছ গো, শালাবাবু? বলি, মদ ছেড়ে দিলে আমি তোমার সেবা করব কেমন করে? তোমার মনোরঞ্জন করব কেমন করে? খালি পেটে যে ওসব হয় না! খালি পেটে বিয়ে-করা বউয়ের আচরণ করা যায়, সতীলক্ষ্মীর আচরণ করা যায়। কিন্তু তাতে তো তোমার মন ভরবে না। রাত কাটবে না। আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগবে না।

একটু থেমে বিদিশা বলল, শালাবাবু, আমি আমার জন্য মদ খাই না। আমি মদ খাই তোমার জন্য। আমি মাতাল হই তোমার জন্য। আমি অশালীন হই তোমার জন্য, কেননা, তুমি যে আমার জন্য অনেক করেছ, অনেক। তারই প্রতিদানে আমি মাতাল হয়ে আমার এই রূপ-যৌবন আমি তোমার পায়ে ঢেলে দিই। মদ ছাড়া একজন মেয়েমানুষের পক্ষে যে এসব করা সম্ভব নয় গো!

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, তুমি জানতে চাইছ আমার গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি আমাকে সুখ দিতে পেরেছে কিনা। শান্তি দিতে পেরেছে কিনা। আমি সুখী হয়েছি কিনা। আমি শান্তি পেয়েছি কিনা।

দেখ শালাবাবু, তোমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই।

কারণ, এক এক সময় আমার মনে হয় এইসব গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি আমায় সুখ দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। আমি সুখী হয়েছি। আমি শান্তি পেয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য, সুখে থাকার জন্য, শান্তিতে থাকার জন্য, এই ঐশ্বর্য অপরিহার্য। আর আজ আমার অনেক ঐশ্বর্য। আজ আমি ঐশ্বর্যশালিনী। এসব কথা ভেবে একটা আত্মতৃপ্তি আসে। একটা সুখের আমেজে, একটা শান্তির শীতলতায় মনটা তখন ভরে ওঠে।

একটু থেমে বিদিশা বলল, কিন্তু তবুও যে মাঝে মাঝে বুকের মাঝে একটা ব্যথা বাজে। একটা কাঁটা বেঁধে। মনটা তখন উচাটন হয়, অশান্ত হয়। আর তখন আমার কী মনে হয় জান? তখন আমার মনে হয়, এইসব গাড়ি, বাড়ি, টাকা-কড়ি আমায় সুখ দিতে পারেনি, শান্তি দিতে পারেনি। আসলে এসবে সুখ নেই। এসবে শান্তি নেই। সুখ-শান্তির ঠিকানা আছে অন্য কোথাও। অন্য কোনখানে।

তখন আমার কার কথা মনে পড়ে জানো? তখন আমার মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া ওই সরল সাদাসিধে দিনমজুর মানুষটার কথা। বড় বেশি করে মনে পড়ে তার কথা তার তরে তখন আমার পরান কাঁদে। তখন মনে হয়, ওই হারিয়ে যাওয়া দিনমজুর মানুষটা যদি একবার ফিরে আসত, তাহলে আমার এই ঐশ্বর্য আমি বাগদীপাড়ার হা-ঘরেদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। আর তারপর ওই দিনমজুর মানুষটার হাত ধরে আমি দূরে কোথাও চলে যেতাম। সেথায় একটা পাতার কুটির বাঁধতাম। এই অশুচি দেহ-মনের জন্য শাস্ত্রমতে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতাম। আর তারপর দ্বিতীয়বার আমি আমার বরমালা ওই দিনমজুর মানুষটার গলায় পরিয়ে দিতাম। তাকে নিয়ে একটা সত্যিকারের সুখের নীড় গড়তাম। একটা সত্যিকারের শান্তির নীড় গড়তাম। যে নীড়ের ঐশ্বর্য হত আমার গর্ভজাত কয়েকটা কচিকাঁচা। তাদের কল-কাললিতে, তাদের হাসি-কান্নায় আমাদের পাতার কুটিরে বইত আনন্দের বন্যা।

বাবু এতক্ষণ চোখ বুজে, ঝিম মেরে বিদিশার কথা শুনছিলেন। আর এসব কথা বলতে বলতে দুঃখে, বেদনায় বিদিশার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এখন বিদিশা চুপ করতেই বাবু চোখ মেলে বিদিশার দিকে চাইলেন। তারপর উনি বললেন, তুই মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছিস, বিদিশা। এসবের কোন মানে হয় না। আমাদের মতো মানুষের অমন আবেগপ্রবণ হওয়া মানায় না। আর তাছাড়া তুই ভেবে দেখ যে কিসে তোর প্রকৃত সুখ, কিসে তোর প্রকৃত শান্তি তুই তা-ই জানিস না। আর শুধু তোর কথাই বা বলি কেন, আসলে কোন মানুষই জানে না কিসে তার প্রকৃত সুখ, কিসে তার প্রকৃত শান্তি প্রকৃত সুখ-শান্তির ঠিকানা তাই মানুষের কাছে আজও অজানাই রয়ে গেছে।

একটু থেমে বাবু বললেন, থাক ওসব কথা, শোন, আজ বিকেলে আমার ভাগ্নে এসেছিল। কাবেরীর ব্যাপারে ওকে বললাম সব কথা। আমার নিজের সম্মতির কথাও বললাম ওকে। সব শুনে ও বেশ খুশি হল।

বিদিশা বলল, তোমার সম্মতির কথা, তোমার ভাগ্নের সম্মতির কথা না হয় জানা গেল। কিন্তু এ ব্যাপারে কাবেরীর সম্মতি আছে কিনা, সেটাও তো জানা দরকার। এতে কাবেরী খুশি কিনা সেটাও তো বোঝা দরকার। ওর মন না বুঝে এ ব্যাপারে আর এগিয়ো না বাপু। মেয়েদের মনের নাগাল পাওয়া অত সোজা ব্যাপার নয়!

ধর, কাবেরীর মায়ের পছন্দ করা পাত্তর ওই জনার্দন দাসকেই যদি কাবেরীর মনে ধরে থাকে, তাহলে তোমার খুশি আর তোমার ভাগ্নের খুশি কোন কাজে লাগবে, শুনি?

আর দেখো বাপু, কাবেরী যদি পলাশের ঘর করতে অসম্মত হয়, তবে যেন আবার জমিদারী মেজাজ দেখিয়ে মেয়েটাকে জোর করে তুলে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিও না। কারণ জোর করে কারো দেহ পাওয়া গেলেও তার মন পাওয়া যায় না। কথাটা মনে রেখো।

বিদিশার কথা শুনে বাবু বললেন, হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস, বিদিশা। কাবেরীব মন না জেনে আমাদের এগোনো উচিত হবে না। ওর মনটা আগে জানা দরকার।

ঠিক। তাহলে যাও কাবেরীর মনটা আগে জেনে এসো। তারপর অন্য কথা।

আমি যাব কাবেরীর মন জানতে? এসব তুই কী বলছিস, বিদিশা?

হ্যাঁ, তুমিই তো যাবে। তোমারই তো যাওয়া উচিত। হাজার হোক তুমি হলে পলাশের মামা।

তুই ঠাট্টা করিস নে, বিদিশা। মেয়েদের মন মেয়েরাই জানতে পারে। পুরুষরা নয়। এ ভারটা তাই তোকেই নিতে হবে মাইরি। তোকেই জানতে হবে কাবেরীর মনের কথা।

হ্যাঁ, নাচনেওয়ালী যাক কাবেরীর মন জানতে আর জমিদারের চর পিছু নিক তার হাঁড়ির খবর যোগাড় করতে। দুপুরের ঘটনায় আমার ভয় ধরে গেছে। ওসবে আর আমি নেই, বাপু!

দূর! তুই খামোখা ভয় পাচ্ছিস। নাচনেওয়ালীর বেশে তুই যাবি কেন? অন্যবেশে যাবি।

অন্যবেশে?

হ্যাঁ অন্যবেশে।

একটু থেমে বাবু বললেন, এক কাজ কর। তুই চুড়িওয়ালী সাজ। শুনেছি জোলাপাড়ার ঝি-বউরা কাঁচের চুড়ি বিক্রী করে। কালসকালে জোলাপাড়াতে লোক পাঠিয়ে কোন চুড়িওয়ালীকে ডেকে নিয়ে আয় তোর কুঠিতে। বলে পাঠাবি, তুই চুড়ি পরতে চাস। কাঁচের চুড়ি। তারপর চুড়িওয়ালী এলে ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে, ওর পোষাক আর চুড়ির ঝুড়ি নিয়ে তুই নিজে চুড়িওয়ালী সাজ। তারপর চুড়ির ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড় চুড়ি বেচতে। কাবেরীদের পাড়ায়। কি, বুঝলি আমার কথা?

হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু ধরা পড়লে?

ধরা পড়লে রাজাবাবু কী তোর মাথা কেটে নেবেন? ও ভয় করিস নে তুই। রাজাবাবু তাঁর শালাবাবুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের পথে যাবেন না। কিন্তু কেন যাবেন না জানিস?

কেন?

কেননা, তোদের রাজাবাবুর এতবড় রাজাসাজা সম্ভব হয়েছে এই অধমের স্বর্গীয় পিতা দেবেশ চৌধুরীর দাক্ষিণ্যে। কথাটা উনি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাননি।

দেখ বাপু, তোমরা রাজায় রাজায় যুদ্ধ করতে চাও কর। কিন্তু মাঝখানে পড়ে আমাদের মতো উলুখাগড়া যেন প্রাণে না মরে, সেটা দেখো।

বিদিশা তুই ভয় পাসনে। এগিয়ে যা। আমি আছি। আমি সবসময় তোর সঙ্গে আছি।

অতঃপর, পরদিন ভরদুপুরে চুড়িওয়ালী সেজে, চুড়ির ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে বিদিশা বাইজী হাজির হল কাবেরীদের আঙিনায়। তারপর হাঁক ছাড়ল, ওগো বোন, চুড়ি নেবে নাকি? ভাল কাঁচের চুড়ি আছে।

চুড়িওয়ালীর হাঁক শুনে ঘরের ভেতর থেকে বামাকণ্ঠ ভেসে এল, নাগো দিদি আমাদের কাঁচের চুড়ি দরকার নেই।

একবার বাইরে এসে দেখই না, বোন। ভাল চুড়ি, কেনা দামে দিয়ে যাব।

বললাম তো, দরকার নেই।

আহা, একবার বাইরে এসোই না! না হয় আজ বাকীতেই দিয়ে যাব। পরে পয়সা দিও।

এবারে ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রথমে চাঁপা তারপর কাবেরী। সমুখে চাঁপা, পেছনে কাবেরী।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চাঁপা চুড়িওয়ালীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ওর দু'চোখে সন্দেহের ছায়া।

চাঁপা এবারে দাওয়া থেকে আঙিনায় নেমে এল। ওর পেছনে কাবেরী।

চাঁপা চুড়িওয়ালীকে প্রশ্ন করল, কে তুমি?

বাইজী উত্তর দিল, কেন, চুড়িওয়ালী।

না, তুমি চুড়িওয়ালী নও। এ তল্লাটের সব চুড়িওয়ালীকে আমি চিনি। তুমি তাদের কেউ নও। আর তাদের কেউই তোমার মতো অমন সুন্দরী নয়।

আমি ভিনগাঁ থেকে এসেছি। আমায় তুমি চিনবে না, বোন।

তা অবিশ্যি হতে পারে। তা তোমার নাম কি?

আমার নাম? আমার নাম নূরজাহান।

কি বললে? নূরজাহান! জগতের আলো! তা তোমার নামটি বেশ মানিয়েছে ভাল সত্যিই তোমার দেহ আলোর ছটা ছড়াচ্ছে। তোমার দেহের ছটায়, তোমার বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গীমায়, তোমার যৌবনের লাস্যে, তোমার কুচযুগলের ঔদ্ধত্যে তুমি নূরজাহান বটে। হায়! আমি যদি পুরুষ হতেম তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেতেম!

থাক, হয়েছে। রঙ্গ রেখে এখন এসো। তোমাদের আমি চুড়ি দেখাই। চল, ওই দুধরাজ গাছের নীচের ঝিরঝিরে রোদে বসি আমরা।

অতঃপর ওরা তিনজন, দুধরাজ গাছের নীচে যেয়ে বসল। চাঁপা বলল, পর্দা হঠাও চুড়ি দেখাও।

বাইজী ঝুড়ির ওপরের কাপড় সরিয়ে দিয়ে ওদের চুড়ি দেখাতে লাগল।

কাবেরী বলল, ওই আয়না-বসা চুড়িগুলো বেশ!

তুমি নেবে এই চুড়ি? বেশতো, আমার পাশে সরে এসো। তোমায় আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু দাম?

দামের কথা পরে হবে। আগে পরতো।

বাইজী অনেক কসরত করে কাবেরীর দু'হাতে ছ'গাছা চুড়ি পরিয়ে দিল। তা দেখে চাঁপা বলল, তুমি তো চুড়িওয়ালী নও, দিদি! চুড়িওয়ালীরা অমন কসরত করে মেয়েদের হাতে চুড়ি পরায় না। সত্যি করে বল তো, তুমি কে?

বাইজী মুখ নীচু করে বলল, তাহলে তুমিই বল, আমি কে!

চাঁপা এবারে বাইজীর আরো কাছে সরে গেল। তারপরও বাইজীর থুতনিতে হাত দিয়ে ওর মুখখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। দেখে ও বলল, চেনা মুখ, চেনা মানুষ। আমি তোমায় চিনেছি! তুমি বিদিশা দিদি।

একটু থেমে চাঁপা ফিসফিস করে বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করল, কে পাঠিয়েছে তোমায়, কুমার?

কুমার নয়। কুমারের মামা বাবু বসন্ত চৌধুরী। উত্তর দিল বিদিশা।

ওদের দু'জনের কথাবার্তা শুনে কাবেরী ঝটিতে উঠে দাঁড়াল। দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর অবাক বিস্ময়ে ও বিদিশার দিকে চেয়ে রইল। এবং মনে মনে বলল, তাহলে এই সেই নষ্ট মেয়েছেলে! এই সেই রূপাজীবা, পরপুষ্টা, দেহপসারিনী বিদিশা বাইজী! এই নচ্ছার মাগীর রূপযৌবনের মোহেই বিদিশা কুঞ্জে নামে উন্মত্ত পুরুষের ঢল! ছি, ছি, ছি!

মুহূর্তমধ্যে কাবেরী ওর দু'হাতের ছ'গাছা আয়না বসা চুড়ি খুলে ফেলল। সেগুলো বাইজীর কোঁচড়ের মধ্যে ছুড়ে দিল। তারপর ত্রস্তপদে ছুটে যেয়ে ও ঘরে ঢুকে পড়ল।

বিদিশা এবং চাঁপা অবাক হয়ে কাবেরীর অবাক-করা-কান্ড দেখল।

কাবেরীর অবাক-করা-কান্ড দেখে বিদিশা ম্লান মুখে বলল, বসন্তবাবু আমায় পাঠিয়েছেন কাবেরীর মন জানতে। কাবেরী কাকে চায়, কার ঘর করতে চায়। পলাশের না ওই জনার্দন দাসের। কাবেরীর ব্যবহারই আমাকে ওর মনের কথা বলে দিল।

ঠিক আছে। যা দেখলাম, যা বুঝলাম বসন্তবাবুকে আমি ঠিক তাই বলব। এখন উঠি।

চাঁপা বলল, না দিদি, যেও না। শোন। তুমি যা দেখলে তাতে পলাশের প্রতি কাবেরীর মনোভাবের এতটুকু প্রতিফলন নেই। তুমি যা বুঝেছ তাও সঠিক নয়।

শোন দিদি, আমি যা বলি। আসলে কাবেরী পড়েছে এখন উভয় সঙ্কটে। কাবেরীর মা চান কাবেরীর বিয়ে জনার্দন দাসের সঙ্গে হোক। ওদের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তাও প্রায় পাকা। প্রথম থেকেই এ বিয়েতে কাবেরীর সম্মতি ছিল না। আবার অসম্মতিও

ছিল না। গ্রামবাংলার হাজারো কুমারীকন্যের মতোই এ বিয়েকে কাবেরী ওর ভাগ্যের লিখন বলেই মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন দুপুরে কাবেরীর সঙ্গে পলাশের দেখা হয়ে যাওয়ায় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই ওরা দুজন দুজনের প্রেমে পড়ল।

শোন দিদি। কাবেরী পলাশকে ভালবাসে। পলাশকে চায়। পলাশের ঘর করতে চায়। কিন্তু ওর মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে পলাশকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি। এদিকে কাবেরীর মা কাবেরী আর পলাশের মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বিন্দুবিসর্গও জানেন না। এই হল পরিস্থিতি।

দিদি, আমি ঠিক করেছি, আজ কালের মধ্যেই আমি কাবেরীর মাকে সব কথা খুলে বলব। এ ব্যাপারে ওঁর মতামত জানতে চাইব। তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। বসন্তবাবু এবং কুমারকে তুমি এসব কথা খুলে বোলো।

আর দিদি, কাবেরীর অশোভন আচরণের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ও যা করেছে, ভুল করে করেছে। কিছু না বুঝেই করেছে। বলো, কাবেরীকে তুমি ক্ষমা করেছ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিদিশা বলল, দেখ বোন, আমি নষ্টা, আমি দুঃশ্চরিত্রা এ কথা সবাই জানে। কিন্তু কেন আজ আমি নষ্টা, কেন আজ আমি দুঃশ্চরিত্রা সে কথা কেউ জানতে চায় না। শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য যে আমি আমার নারীত্বের সকল গরিমা হারিয়েছি, সে কথা কেউ বুঝতে চায় না। আমার নিয়তি যে আমাকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে, সে কথাটাই বা আমি মানুষকে কেমন করে বোঝাই বল!

একটু থেমে বিদিশা বলল, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, কাবেরীকে আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু দেখ বোন, এ দেশের দুস্থ পরিবারের কোন সুন্দরী কন্যা যদি কোন রাজরাজড়ার নজরে পড়ে যায় তবে সেই কন্যার ভাগ্যে দুঃখ আছে জেনো। এ সত্য চিরদিনের। এ সত্য চিরকালের। আমি জানি না কাবেরীর এই অসামান্য রূপ কাবেরীকে কোথায় নিয়ে যাবে। আমি জানি না রূপসী কাবেরীর নিয়তি কাবেরীকে নিয়ে কোন্ খেলা খেলবে।

একটু থেমে বিদিশা নিম্নস্বরে বলল, তোমাদের সতর্ক করার জন্য আমি কয়েকটি কথা বলছি, শোন। দেখ, একদিকে বাবু বসন্ত চৌধুরী প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি পলাশের সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে দেবেন। সুতরাং ছলেবলে কৌশলে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। আবার অন্যদিকে জমিদার প্রতাপ রায়বর্মনকে আমি যতদূর জানি, এ বিয়ে তিনি হতে দেবেন না। হয়তো বিয়ের আগেই তিনি তাঁর লোকজন দিয়ে কাবেরীকে অপহরণ করাবেন। এ বিয়ে বন্ধ করে দেবেন।

বিদিশার কথা শুনে চাঁপা শিউরে উঠল। সত্যিই তো, এ দিকটা তো ও একবারও ভেবে দেখেনি। উদ্বিগ্ন চাঁপা বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করল, এই পরিস্থিতিতে আমরা তাহলে কী করি বলতো? যে করেই হোক কাবেরীকে তো রক্ষা করতে হবে, দিদি!

তুমি ভয় পেও না, বোন। বাবু বসন্ত চৌধুরী এবং কুমারের দলবলের শক্তিও কম নয়। ওঁদের লাঠি, ওঁদের তলোয়ার, ওঁদের তীরধনুক, ওঁদের বন্দুকের শক্তিকে লেই ভয় পায়। কাবেরীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ওঁরা অবশ্যই করবেন।

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, কিন্তু তবুও একটা শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। জমিদার াপ রায়বর্মন মানুষটা বড়ই দাম্ভিক, নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ন। উনিও কিন্তু জ পিছু হটবেন না। উনিও শেষ দেখে ছাড়বেন।

বিদিশা চুপ করতেই চাঁপা ওর হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে বলল, এই ভয়ানক স্থিতিতে তুমি আমাদের পাশে থাক। তুমি আমাদের পথ দেখাও, দিদি।

দেখ, এদিকে বৈষ্ণব ঠাকুর বাড়ি নাই। আর বুদ্ধি দেওয়ার মতো, সঠিক পথে চালিত করার মতো তেমন কোন পুরুষমানুষও আমাদের পাশে নাই। আমাদের স্থাটা একবার ভেবে দেখ, দিদি।

আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি। তবে তোমাদের সুবুদ্ধি দিতে পারেন, সঠিক া পরিচালিত করতে পারেন, তেমন পুরুষমানুষ কি তোমাদের পাশে একজনও ?

হ্যাঁ, আছেন। তেমন পুরুষমানুষ মাত্র একজনই আছেন। হুতোমপুরের দীপক রায়। ক আমরা পাশে পাব। তিনি কাবেরীর পিতৃপ্রতিম।

পিতৃপ্রতিম! তুমি সঠিক জান, দীপকবাবু কাবেরীর পিতৃপ্রতিম মাত্র! তিনি কাবেরীর া নন!

বিদিশার কথা শুনে চাঁপা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তা দেখে িশা বলল, তুমি অবাক হলে, বোন? কিন্তু আমার কানে যে গুঞ্জন এসে পৌঁছেছে ত তো মনে হয় দীপকবাবুই কাবেরীর পিতা। কাবেরীর অবৈধ জন্মদাতা।

না, না, তা হতে পারে না। কাবেরীর মা কখনও মিথ্যে কথা বলেন না। কবাবু—।

বাধা দিয়ে বিদিশা বলল, কাবেরীর মা যে মিথ্যে কথা বলেন না, সে কথা আমিও ন। কিন্তু ওঁকে যদি মিথ্যে গল্প শোনানো হয়ে থাকে, তাহলে?

তবে ওসব সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার এখন সময় নাই। আর তার প্রয়োজনও ই। তোমরা দীপকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ কর। যত শীঘ্র পার। আশাকরি উনি মাদের সুপরামর্শ দেবেন, সুপথে পরিচালিত করবেন। কারণ, বিপদটা কাবেরীর। ব হাজার হোক উনি কাবেরীর—।

তাছাড়া আমি শুনেছি, দীপকবাবু একজন বড় লাঠিয়াল। তাই ওঁর পরামর্শ ছাড়াও া লাঠির শক্তি তোমাদের কাজে লেগে যেতে পারে। ভবিষ্যতের ভাবনাটা ভেবে া ভাল।

যাহোক, আমি এখন উঠি। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।

বিদিশা চুড়ির ঝুড়ি গুছিয়ে নিয়ে কাবেরীদের আঙিনা থেকে বেরিয়ে গেল। চাঁপা হাজারো চিন্তা মাথায় নিয়ে নির্জন আঙিনায় চুপ করে বসে রইল।

লোক মারফত জরুরী তলব পেয়ে পরদিন দুপুরবেলায় জনার্দন দাস কম্পিত হৃদয়ে রাজসমীপে হাজির হল। তারপর হাতজোড় করে ও রাজা প্রতাপ রায়বর্মার সমুখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে ধন্দ। ওর মনে দুঃশ্চিন্তা। চাপা উত্তেজনায় ওর কাঁপছিল।

রাজাবাবু তখন নিবিষ্টমনে সেরেস্তার খাতা-পত্তর দেখছিলেন। পাশে ঈষৎ ঝুঁকিয়ে নায়েব মশাই দাঁড়িয়েছিলেন। স্তব্ধ দুপুর। রাজবাড়ির অলিন্দ হতে মাঝে মা চড়াইপাখির কিচিরমিচির আর পায়রার বকবকম শব্দ ভেসে আসছিল।

রাজাবাবু তখন নিবিষ্ট মনে সেরেস্তার খাতা-পত্তর দেখছিলেন। খানিকবাদে মাথা তুললেন। তারপর জনার্দন দাসের দিকে চেয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা তুমিই সেই রাজার হাটের মস্ত গুড়ের ব্যাপারী?

রাজাবাবুর প্রশ্ন শুনে জনার্দন দাস কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞা, অমন দুর্মুখেরা বলে বেড়ায়, নিন্দুকেরা বলে বেড়ায়। ওসব কথায় আপনি কান দে না, হুজুর। আসলে আমি রাজারহাটের একজন অতি নগন্য গুড়ের কারবারী। সং আমার নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তাই গতবছরের খাজনাটা আমি এ দিয়ে উঠতে পারিনি। তবে—।

বাধা দিয়ে রাজাবাবু বললেন, বাকী খাজনা আদায়ের জন্য আমি তোমায় ডা করিনি। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।

একটু থেমে রাজাবাবু জনার্দনকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম ফুলমালা বোষ্টম মেয়ে কাবেরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা হয়ে রয়েছে। তাহলে বি করছ না কেন?

স্বয়ং রাজাবাবুর মুখ থেকে ওর নিজের বিয়ের কথা শুনে জনার্দন অবাক ও ঢোক গিলে বলল, আজ্ঞা, পাকা কথা এখনও হয়নি, হুজুর। তবে কথাবার্তা খানি এগিয়েছে আর কি।

একটু থেমে জনার্দন বলল, আসলে বিয়ের একটা খরচ আছে তো। বে ঠাকরুন এখনও সেটা যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে কি।

একটু থেমে জনার্দন আবার বলল, ঠাকরুণ আমার মায়ের হাতেপায়ে ধরে স আদায় করেছেন। যৎসামান্য বরপণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তাই—। নইলে নামগোত্রহীনার পানিগ্রহণ কে করতে চায়, হুজুর?

জনার্দন থামতেই রাজাবাবু বললেন, শুনেছি মেয়েটি রূপসী, শাস্ত্রজ্ঞা সুকণ্ঠীও।

আজ্ঞা, আপনি যথার্থই শুনেছেন, হুজুর। বিয়েতে সম্মত হওয়ার এটাও একটা কারণ বটে।

বিয়েতে সম্মত হওয়ার অন্য কারণটা তাহলে নিশ্চয়ই বোষ্টমীর যৎসামান্য বরপণের প্রতিশ্রুতি?

রাজাবাবুর কথা শুনে জনার্দন একচিলতে চাতুর্যের হাসি হাসল। এবং হাত কচলাতে কচলাতে, গদগদ কণ্ঠে ও বলল, আপনার বুদ্ধিমত্তার তুলনা হয়না, হুজুর!

বেশ। তাহলে আর দেরী না করে চটপট বিয়েটা করে ফেল। এটাই আমার ইচ্ছা।

ওর নিজের বিয়ে ত্বরান্বিত করতে হঠাৎ রাজাবাবুর ইচ্ছার কারণটা জনার্দন বুঝতে পারল না। ফলে ও আবার অবাক হল। কিন্তু ওর সম্মুখে যে হঠাৎই একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে সেটা বুঝতে ওর একটুও অসুবিধে হল না। এবং সুযোগটা যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ভেতর থেকে ও একটা তাগিদও পেল।

সুতরাং হাত কচলাতে কচলাতে জনার্দন রাজাবাবুকে বলল, আজ্ঞা, অনেক বাক্-বিতন্ডার পরে মাতব্বরেরা এ বিয়েতে সম্মতি প্রদান করেছেন। গ্রামের মাতব্বরদের সন্তুষ্ট করতে এ বিয়েতে তাই যথেষ্ট ভোজনের আয়োজন করতে হবে। আর ওই দক্ষিণার ব্যাপারেও কার্পণ্য করা উচিত হবে না, হুজুর। তাই বলছিলাম আর কি—।

রাজাবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা?

আজ্ঞা, এই হাজার একটাকা হলেই কাজটা ভালয় ভালয় নেমে যাবে ভাবছি আর কি।

বল কী হে! হাজার একটাকায় তো অমন একগন্ডা বিয়ে নামিয়ে দেওয়া যায়!

হুজুর যথার্থই অনুমান করেছেন। হাজার একটাকায় অমন এক গন্ডা বিয়ে নামিয়ে দেওয়া যায় বটে। কিন্তু স্বয়ং রাজামশাই যে বিয়ের উদ্যোক্তা সে বিয়েতে কিঞ্চিৎ জাঁকজমক না হলে চলে না! কারণ, লোকনিন্দার একটা ব্যাপার আছে না! তাই বলছিলাম আর কি—।

জনার্দনের কথা শুনে রাজাবাবু মনে মনে বললেন, বেটা মহাধড়িবাজ! কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ না করে উনি নায়েব মশাইকে বললেন, জনার্দন দাসকে হাজার একটাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর বিয়েটা যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় সেদিকে নজর রাখুন।

নায়েবমশাই রাজাবাবুকে নিম্নস্বরে বললেন, যে আজ্ঞে। তারপর চোখের ইশারায় উনি জনার্দনকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

* * *

রূপসী চুড়িওয়ালীর বৃত্তান্ত ছাড়া কানা পরান সেদিন আর অন্য কোন খবরই যোগাড় করতে পারেনি। সুতরাং সন্ধ্যায় রাজসমীপে হাজির হয়ে ও সেই বৃত্তান্তই নিবেদন করল। আর তা শুনে রাজাবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ওই রূপা ধোপানীর সঙ্গেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি! সারাটা দিন তুই তো ওই পদ্ম জুলীর

আশেপাশেই ঘুর ঘুর করেছিস আর রূপার সঙ্গে গল্প করেছিস। অন্য খবর তুই আর যোগাড় করবি কেমন করে, শুনি?

রাজাবাবুর ধমক খেয়ে কানা পরান মাথা নীচু করল। ওর বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ কর্ম ওই রাজাবাবুর পেয়ারের গুপ্তচর ফটিক সমাদ্দারের। বেটা সারাটা দিন ছাতা বগলে করে এ রাজ্যের এবং পাশের রাজ্যের হাটে মাঠে ঘাটে চক্কর দেয় আর দিনান্তে বেটা সব খবর রাজাবাবুর কানে তুলে দেয়! এর এটা বিহিত না করতে পারলে আর চলছে না দেখছি!

কানা পরান ভেবে দেখল, ধরা যখন পড়েই গেছি তখন অন্যায়টা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। সুতরাং ও রাজাবাবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে আমার অন্যায় হয়ে গেছে, হুজুর। তারপর ও গলা নামিয়ে বলল, আসলে রূপার মায়ের ধুম জ্বর। তাই ভাবলাম ওর অসুস্থ মায়ের খবরটা একবার নেওয়া উচিত তাই—।

কানা পরানের সাফাই শুনে রাজাবাবু ঈষৎ গলা চড়িয়ে বললেন, রূপা ধোপানী সুন্দরী তাই ওর অসুস্থ মায়ের খবর নেওয়াটা তোর উচিত বলে মনে হল। পারুল জেলেনী সুন্দরী তাই ওর পচা মাছ ও কেমন হুহু করে বিক্রী হয়ে যায়, সেই খবরটা যোগাড় করা তোর উচিত বলে মনে হয়। নূরজাহান চুড়িওয়ালী সুন্দরী তাই আজ ভরদুপুরে তুই ওর পিছু নিয়েছিলি। দেখছি বনতুলসীর তাবৎ সুন্দরীর খবর নেওয়াটা তোর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটু থেমে রাজাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি তোকে বনতুলসীর সুন্দরীদের খবর যোগাড় করার জন্য নিয়োগ করিনি। আমি তোকে নিয়োগ করেছি এ রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর সঠিক সময়ে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এ রাজ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর সেই ঘটনার কুশীলবরা হল আমার শালাবাবু বসন্ত চৌধুরী, কুমার পলাশ, বিদিশা বাইজী এবং ফুলমালা বোষ্টমীর কন্যা কাবেরী। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুই ওই ঘটনার ওপর নজর রাখবি। এবং ঠিক সময়মতো তুই সব খবর আমার কাছে পৌঁছে দিবি। আগামী কয়েকদিনের জন্য এটাই হল তোর আসল কাজ। এখন যা।

কানা পরান হাতজোড় করে রাজাবাবুকে বলল, আজ্ঞা, আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, হুজুর।

* * *

সেদিন রাত্রে রাজা প্রতাপ রায়বর্মন পুত্র পলাশ, পৌত্র বিলাস এবং বড় জামাতা বিষ্ণুপদ সামন্তকে নিয়ে রাত্রের আহার সমাধা করছিলেন। রন্ধনশালার পাচক এবং

পরিচারক-পরিচারিকারা ওঁদের নানাপ্রকার সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করছিল। রানী সুমিত্রা দেবী খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবেশন বিষয়ে তদারক করছিলেন।

রাজা প্রতাপ রায়বর্মন বড় জামাতাকে বললেন, শোন বিষ্ণুপদ। রুদ্রপুরের পাখিরাচর এবার ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে বলে খবর এসেছে। ওই চরের দখল নিতে হবে। তুমি সর্দার ফজর আলি এবং অন্যান্য লোক-লস্কর সহ আগামী কল্যই রুদ্রপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও। তোমার সঙ্গে পলাশও যাবে। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই মহল্লায় নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছি।

শ্বশুরমশাইয়ের আদেশ শুনে বড়জামাতা বিষ্ণুপদ বিস্মিত হল। এবং সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বাবা, পাখিরাচরের দখল আবার নতুন করে নিতে হবে কেন? চরের বার আনা অংশে তো আমাদের প্রজারাই চাষ করে। আর বাকী চার আনা অংশে চাষ করে রাজা বীরভদ্র সিংহের প্রজারা। দীর্ঘদিন ধরে তো এমনটাই হয়ে আসছে। এবার তাহলে আবার—।

বিষ্ণুপদর কথায় বাধা দিয়ে রাজাবাবু বললেন, পাখিরাচরের ষোল আনা অংশই আমাদের। সখ্যতাবশতঃ এতদিন আমি রাজা বীরভদ্র সিংহকে চরের চার আনা অংশ প্রদান করেছিলাম। তাই চরের ওই অংশে ওঁর প্রজারা চাষ করত। কিন্তু ক'মাস আগে রাজা বীরভদ্র সিংহ পরলোক গমন করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর প্রজারাও চরের ওই চার আনা অংশে চাষ করার অধিকার হারিয়েছে। এখন পাখিরা চরের ষোল আনা অংশই আমাদের। তাই এখন থেকে আমাদের প্রজারাই চরের ষোল আনা অংশে চাষ করবে। প্রজাদের মধ্যে চরের বিলি-ব্যাবস্থাও সেইমতো করতে হবে। এসব ব্যাপারে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তুমি অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। তোমাকে আমি সে ক্ষমতা দিলাম।

কিন্তু চরের ওই চার আনা অংশ আমাদের দখলে আনতে গেলে ওঁদের লোকজন আমাদের বাধা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে—।

সেক্ষেত্রে কাজিয়া হবে। তবে প্রয়াত রাজা বীরভদ্র সিংহের বিধবা পত্নী রানী কাত্যায়নী দেবী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সঙ্গে কাজিয়ায় লিপ্ত হয়ে দু'তরফের এতদিনের সুসম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

একটু থেমে রাজাবাবু বললেন, পাখিরা চরের ওই চার আনা অংশ আমাদের দখলে আনার ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসন-কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সব কথা শুনে ওঁরা আমাদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

কিন্তু বাবা, রানী কাত্যায়নী দেবী যদি ওঁর স্বত্বাদি-সংক্রান্ত কাগজপত্র পুলিশ এবং প্রাশাসন কর্তাদের কাছে পেশ করেন, তাহলে?

তেমন কোন কাগজপত্র এখন আর রানী কাত্যায়নী দেবীর হাতে নেই। আর যদি তা থেকেও থাকে এবং তিনি যদি তা পুলিশ এবং প্রশাসন কর্তাদের কাছে পেশ করেন, তবে তাঁরা সেইসব পুরনো কাগজপত্র ঠিকমতো পড়তে পারবেন না। আর

পড়তে পারলেও তাঁরা তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারবেন না। এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা আমাদের পক্ষে রায় দেবেন। সুতরাং ওসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই। ওঁরা আমাকে কথা দিয়েছেন। আর কথা দিয়ে ওঁরা কখনও কথার খেলাপ করেন না। ইংরেজ সরকারের পুলিশ এবং প্রশাসনকর্তারা এসব কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করে থাকেন।

কিন্তু রানী কাত্যায়নী দেবী যদি এ নিয়ে আইন-আদালত করতে চান, তাহলে?

না, না, উনি তা করবেন না। কারণ ওঁর নায়েব, দেওয়ান এবং কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী বর্তমানে আমার অনুগত। সামান্য কয়েকশো বিঘা চরের জমির দখল নেওয়ার জন্য ওঁরা ওঁদের বিধবা রানীমাকে আইন-আদালতের পথে যেতে দেবেন না। ওঁর ওঁদের রানীমাকে বোঝাবেন যে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আইন-আদালত করতে গেলে দু'তরফের এতদিনের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

একটু থেমে রাজাবাবু বললেন, কিন্তু তবুও চরের দখল নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে একটা লড়াই হবে। আর সেই লড়াইটা হবে আমাদের সঙ্গে চরের চার আনা অংশের চাষীদের। ওই চার আনা অংশ আমাদের দখলে আনতে গেলে ওই চাষীদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই করতে হবে। সর্দার সেখ ফরমান চার আনা অংশের সমস্ত চাষীকে একত্র করে ইতিমধ্যেই একটা দল গঠন করেছে। দলটা এখন লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। আর ওই দলের প্রতি রানী কাত্যায়নী দেবীর গোপন সমর্থন এবং সহায়তা রয়েছে।

ঠিক আছে বাবা, আপনি যেমন বলছেন তেমনই হবে। আমি আগামী কালই সর্দার ফজর আলি এবং আমাদের বাছাই বাছাই লোকলস্কর নিয়ে রুদ্রপুরের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি।

তোমার সঙ্গে পলাশও যাবে। ও সব সময়েই জমিদারীর সর্বপ্রকার কর্মকান্ড হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা চিরদিন চলতে পারে না।

একটু থেমে রাজাবাবু বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর আমি অখন্ড পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি। আমার অবর্তমানে পলাশকেই বনতুলসীর জমিদারী চালাতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। আর এখন থেকেই সেই প্রস্তুতি শুরু হোক। এখন থেকেই পলাশ জমিদারীর প্রত্যেকটি কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করুক। এটাই আমার ইচ্ছা। এটাই আমার আদেশ।

একটু থেমে রাজাবাবু স্বগতোক্তি করলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কর্মশালা হয়ে ওঠে।

রক্ষণশীল পরিবারের-কন্যা রানী সুমিত্রা দেবী কাবেরী কাহিনী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। উনি পলাশের এই হঠকারিতাকে মোটেও ভাল চোখে দেখেননি। পলাশকে ওঁর বাস্তব বুদ্ধিহীন বলেই মনে হয়েছে। রাজপরিবারের মান-সম্ভ্রমের কথা

ন্তা করে উনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাই জনার্দন দাসের সঙ্গে কাবেরীর বিয়েটা তে শীঘ্র সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে উনিও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। আর তার জন্য লাশকে যে কয়েকদিনের জন্য দূরে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, উনি তাও বুঝেছিলেন। ই রাজাবাবুর কথায় সায় দিয়ে উনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পলাশও কাল বিষ্ণুপদর ঙ্গে রুদ্রপুরে যাবে। উভয়ে পরামর্শ করে লড়াই পরিচালনা করবে। আর তার আগে ভয়ে মিলে সর্দার ফজর আলির সঙ্গে আমাদের বাছাই-বাছাই লাঠিয়াল, তীরন্দাজ, ঢকীবাজ এবং বন্দুকবাজ প্রেরণ করবে। এই লড়াইটা আমাদের জিততেই হবে। ব এই লড়াইটা জেতাই হবে বনতুলসীর ভবিষ্যৎ জমিদারের প্রথম সাফল্য।

* * *

উনি রাতদুপুরে খুট্ খুট্ করে দরজার শেকল নাড়ার শব্দ পেলেন। চাপাস্বরে সি মাসি ডাক শুনলেন। স্বপ্ন ভেবে ঘুমের ঘোরে বৈষ্ণবী পাশ ফিরে শুলেন। কিন্তু ই খুট্ই শব্দ বন্ধ হল না। মাসি, মাসি ডাকও থামল না। তখন বৈষ্ণবীর ঘুম ভেঙে ল। উনি উঠে বসলেন। এবং চেয়ে দেখলেন, শয্যার একপাশে কাবেরী শীতের থা মুড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

বৈষ্ণবী মৃদু ধাক্কায় কাবেরীকে জাগালেন। কাবেরী উঠে বিছানার 'পরে বসল। ষ্ণবী কাবেরীকে বললেন, শোন তো। কে যেন খুট্ খুট্ করে দরজার শেকল নাড়ছে! পাস্বরে মাসি, মাসি বলে ডাকছে। কার গলা বলতো?

কাবেরী একমুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর উত্তর দিল, মনে হচ্ছে চাঁপার গলা। স্তু এত রাতে! কাবেরী বিস্মিত হল।

এবারে বৈষ্ণবী বিছানা থেকে উঠলেন। এবং দরজার কাছে যেয়ে উনি জিজ্ঞাসা লেন, এত রাতে কে ডাকে?

দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এল, আমি মাসি। আমি চাঁপা। দরজা খোল।

বৈষ্ণবী এবারে দরজা খুললেন। এবং দরজা খুলেই উনি দেখলেন, চাঁপা দরজার মনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর আপাদ-মস্তক চাদরে ঢাকা।

শেষ অগ্রহায়ণের এই কনকনে শীতের নিশুতিরাতে চাঁপাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে কতে দেখে বৈষ্ণবী শঙ্কিত হলেন। উনি চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতরাতে কী াপাররে, চাঁপা? এবারেও কী তুই একা এসেছিস?

চাঁপা চাপাস্বরে উত্তর দিল, না মাসি, এবারে আর আমি একা আসিনি। সঙ্গে টিশ্বর এসেছে। ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চলো, ঘরের ভেতরে চলো। কথা আছে।

চাঁপার চাপাস্বর বৈষ্ণবীর শঙ্কা বাড়িয়ে দিল। উনি পিছিয়ে এসে বিছানার উপরে প করে বসে পড়লেন। চাঁপা ঘরের ভেতরে ঢুকে বিছানার একপাশে বসল।

বৈষ্ণবী চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন, চাঁপা কিছু বলতে চাইছে, স্তু বলতে পারছে না। ও ইতস্ততঃ করছে।

চাঁপা ইতস্ততঃ করছে দেখে বৈষ্ণবীর শঙ্কা আরও বাড়ল। উনি চাঁপাকে বললেন চুপ করে থাকিস নে, চাঁপা। যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। তোর হাবভাব দেখে আমার শঙ্কা বাড়ছে!

চাঁপা বৈষ্ণবীকে আশ্বস্ত করতে চাইল। বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চেয়ে ও বলল শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। শঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।

একটু থেমে চাঁপা বলল, মাসি, পলাশ এসেছে। ও হিজল বনে অপেক্ষা করছে কাবেরীর সঙ্গে ও দেখা করতে চাইছে।

পলাশ! কে পলাশ? তার সঙ্গে কাবেরীর কী সম্পর্ক? এই রাতদুপুরে কাবে কেন যাবে হিজলবনে, তার সঙ্গে দেখা করতে? এসব তুই কী বলছিস? আমি কিছু বুঝতে পারছি নে! আচ্ছা আমি কী স্বপ্ন দেখছিরে, চাঁপা?

না মাসি, তুমি স্বপ্ন দেখছ না। এটা বাস্তব। তবে এই সেদিন যা ঘটেছে স্বপ্নের মতো বটে।

একটু থেমে চাঁপা আবার বলল, পলাশ আমাদের জমিদার প্রতাপ রায়বর্মনে একমাত্র পুত্র। লোক-লস্কর নিয়ে আগামীকাল সকালে ও রুদ্রপুরে রওনা হচ্ছে। চরে দখল নিতে ওখানে দুপক্ষে জোর লড়াই হবে। যাওয়ার আগে পলাশ কাবেরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

কিন্তু কেন? কাবেরী কেন যাবে দূরের ওই হিজলবনে, তার সঙ্গে দেখা করতে

ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে, মাসি। পলাশ কথা দিয়েছে কাবেরীকে ও বিয়ে করবে

না, না, তা হতে পারে না! পলাশ মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়েছে। রাজায়-প্রজায় বিয়ে হয়না। প্রলোভন দেখিয়ে কাবেরীকে পলাশ ওর বাগানবাড়িতে নিয়ে তুলবে সেখানে কাবেরীকে ও রক্ষিতা করে রাখবে। এমন ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে

না মাসি, না। এক্ষেত্রে তেমনটা ঘটবে না। পলাশ উচ্চশিক্ষিত এবং রুচিশীল পলাশ কথা দিয়েছে, কাবেরীকে ও বিয়ে করবে। পলাশের মামা বাবুবসন্ত চৌধুরী প্রতিজ্ঞা করেছেন, উনি পলাশের সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে দেবেন। ওঁদের 'পরে আস্থা রাখা যায়। ওদেরকে বিশ্বাস করা যায়, মাসি।

কিন্তু পলাশের শরীরে যে রাজরক্ত বইছে তা ওকে বিপথে চালিত করবে

না মাসি, না। ওসব কুচিন্তা মনে স্থান দিও না। পলাশ ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় ওর দাদামশাইয়ের কাছে মানুষ হয়েছে। ওখানে থেকেই ও লেখাপড়া শিখেছে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। এবং পলাশ রুচিশীল। তাই রাজরক্ত ওর 'পরে প্রভাব বিস্তার করে ওকে কুপথে পরিচালিত করতে পারবে না।

চাঁপার কথা শুনে বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন আমি যদি কাবেরীকে পলাশের সঙ্গে দেখা করতে না দিই, তাহলে?

তাহলে ওঁরা জোর করবেন। তোমার চোখের সামনেই ওঁরা কাবেরীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবেন। তুমি কী ওঁদের আটকাতে পারবে, মাসি?

দেখ চাঁপা, আমরা রায়রায়ানদের প্রজা। আর রায়রায়ানদের দবদবা কারো অজানা নয়। তেমনটা ঘটলে আমি ওঁদের কাছে দরবার করব। অন্যায়ের বিচার চাইব।

তুমি ভুল করছ, মাসি। মহাভারতের যাদবগণের দবদবাও কিছু কম ছিল না। কিন্তু তাই বলে কী তারা অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ আটকাতে পেরেছিল? পারেনি। কারণ অর্জুন এবং সুভদ্রা দু'জনাই দু'জনকে চেয়েছিল। সুভদ্রা-হরণ কালে অর্জুনের রথের সারথির কাজটা সুভদ্রা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

চাঁপার কথা শুনে বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে বসে রইলেন। তারপর উনি মুখ তুলে বললেন, কিন্তু আমি যে জনার্দনের মাকে কথা দিয়েছি। জনার্দনের সাথে আমি কাবেরীর বিয়ে দেব। তার কি হবে?

সেটা আর হওয়ার নয়, মাসি। যেখানে পলাশ এবং কাবেরী উভয়ে উভয়কে চাইছে, সেখানে জনার্দন দাসের স্থান কোথায়?

তাহলে এখন আমায় তুই কি করতে বলিস, চাঁপা?

তুমি অনুমতি দাও, মাসি। কাবেরী পলাশের সঙ্গে দেখা করুক।

চাঁপার কথা শুনে বৈষ্ণবী অসহায়ের মতো ওর মুখের পানে চাইলেন। তা দেখে চাঁপা বলল, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, মাসি। আমি কাবেরীর সঙ্গে আছি। ওর কোনরকম অসম্মান হবে না।

চাঁপার কথা শুনে বৈষ্ণবী চুপ করে বসে রইলেন। মৌন সম্মতি জেনে চাঁপা কাবেরীকে বলল, চল, ওঘরে চল। আজ আমি তোকে আমার মনের মতো করে সাজাব।

* * *

অগ্রহায়ণ মাস শেষ হতে আর মাত্র ক'দিন বাকী। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। মধ্যযামিনী। জ্যোৎস্না স্নাত চরাচর। তাই তার ধ্যানগম্ভীর রূপ। ওরা দুজন বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। চাঁপা বলল, একটু পা চালা, সই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল কুমার তোর জন্য হিজলবনে অপেক্ষা করছে। ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে যে!

কাবেরী বলল, সই, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। চাঁপা উত্তেজনায় আমার সারা শরীরে ঘাম ঝরছে। নিষ্ঠুর পথের কাঁটা আমার পায়ে রক্ত ঝরাচ্ছে। পথ চলতে যেয়ে আমার অবাধ্য পা দু'খানা জড়িয়ে আসছে। তাতে নুপুর-নিক্কন ছন্দ হারাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কি করি বলতো?

চাঁপা বলল, অভিসারে ভয় থাকবে না,উত্তেজনা থাকবে না, পথের কাঁটা পায়ে রক্ত ঝরাবে না, তাও কি কখন হয়? এই ভয়, এই উত্তেজনা, এই রক্ত ঝরার মধ্য দিয়েই না সম্ভব হয় সেই মধুর মিলন। মেলে সেই স্বর্গীয় সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ। এসব কথা তো তোর অজানা নয়, সই। তুই তো জানিস কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার কথা। অর্জুন প্রিয়া সুভদ্রার কথা। তারও তো সয়েছিল এই জ্বালা, এই যন্ত্রণা। তবেই না তাদের সম্ভব হয়েছিল, কাঙ্ক্ষিত মধুর মিলন। পেয়েছিল তারা স্বর্গীয় সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ।

কিন্তু সই, শেষ অগ্রহায়ণের এই মধ্য যামিণীতে আমার জ্বালা, আমার যন্ত্রণা যে আরও অধিক হয়ে দেখা দিয়েছে! আমার পথ চলায় যে আরও অধিক বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

সই, শুধু কি আমার বুক কাঁপছে, ঘাম ঝরছে, পথের কাঁটা আমার পায়ের রক্ত ঝরাচ্ছে? আরও সব রয়েছে না! তারাও কি আজ আমার সাথে কিছু কম শত্রুতা করছে?

তুই দেখছিস না সই, নিশুতি রাতের বাউরা হাওয়া আমার বসন-ভূষন শিথিল করে দিয়ে আমার চলার গতিকে কেমন মন্থর করে দিচ্ছে? তুই দেখছিস না, নির্মল চন্দ্রালোক বৃক্ষপত্রে বন্দি হওয়ায় বৃক্ষতল কেমন আলো-আঁধারিতে ছেয়ে গেছে? তাতে কেমন এক স্বপ্নালু পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে? যা দেখে আমার মন আনমনা হচ্ছে! আমার চলার গতি মন্থর হচ্ছে!

একবার কান পেতে শোন দেখি সই, অদূরের ওই রাতজাগা বিরহী পাখিটার একঘেয়ে ডাক। উদাসিনী দয়িতাকে কাছে পাওয়ার একঘেয়ে করুন আহ্বান। তারপর আমায় তুই বল, অমন করুন আহ্বান শুনে কার না মন উদাস হয়! কার না মনসংযোগ বিনষ্ট হয়! কার না চলার গতি মন্থর হয়!

চাঁপা কপট আক্ষেপে বলল, সবই ভাগ্যরে, সই! সবই ভাগ্য! তোর অভিসারের জ্বালা-যন্ত্রনা লাঘব করার জন্য মধ্যরাতের এই বাউরা হাওয়াকে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করি তেমন সাধ্য আমার নেই। বৃক্ষপত্রে বন্দি ওই নির্মল চন্দ্রালোককে শৃঙ্খলমুক্ত করে এই অবাঞ্ছিত স্বপ্নালু পরিবেশের অবসান ঘটাই, সে সাধ্যও আমার নেই। ওই বিরহী রাতজাগা পাখিটার অযাচিত সঙ্গীত স্তব্ধ করে দিয়ে এই সঙ্গীতময় বন্যপরিবেশকে আমি যথাসাধ্য সঙ্গীতহীন করে তুলি, সে সাধ্যই বা আমার কোথায়! তাই বলছিরে সই, সবই ভাগ্য! সবই ভাগ্য!

ওরা দু'জন বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। ওদের কথোপকথনের মধ্যেই হঠাৎ অদূরের এক বৃহৎ অর্জুন বৃক্ষের আড়াল হতে চাপা হাঁচির শব্দ ভেসে এল। আর তা শুনে কাবেরী চমকে উঠল। থমকে দাঁড়াল। তারপর ও চাঁপার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, ওই বৃহৎ অর্জুন গাছটার আড়ালে কেউ একজন লুকিয়ে রয়েছে। আচ্ছা লোকটা ঠ্যাঙাড়ে নয় তো রে, সই?

চাঁপা উত্তর দিল, ঠ্যাঙাড়ে হলে এতক্ষণে পাউড়া ছুড়ে ও আমাদের ঠ্যাং ভেঙে দিত। তারপর ঠেঙিয়ে ও আমাদের বৃন্দাবন দেখিয়ে দিত। ভয় পাসনে, ঠ্যাঙাড়ে নয়। লোকটি কুমারের দেহরক্ষী। এক্ষণে ও আমাদের দেহরক্ষী। অমন অনেক রক্ষী এখানকার ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে। এই বিজনবনে ওরা আমাদের রক্ষক।

ওরা দু'জন বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল। একটু পরে চাঁপা বলল, সই, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। সমুখের ওই নাতিদীর্ঘ প্রান্তর পার হলেই হিজলবন। ওখানেই

মাদের পথ চলার শেষ। আর তারপরেই মধুর মিলনে তোর মনের জ্বালার, প্রেমের লার সমাপ্তি।

সুতরাং ওরা দু'জন হৃষ্টমনে এগিয়ে চলল। কিন্তু কয়েকপা যেতেই হঠাৎই এক পত্তি ঘটল। পেছন থেকে কে যেন কাবেরীর শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। কাবেরী য় পেয়ে গেল। এবং অজান্তেই ওর মুখ থেকে 'মাগো' শব্দ বেরিয়ে এল। আর শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল হতে দুজন সশস্ত্ররক্ষী কাবেরীর কাছে ছুটে ন। এবং ওরা এসে দেখতে পেল, কাবেরীর শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ে যেয়ে থপার্শের এক বেতের ঝোপে আটকে গেছে। আর তাতেই এই বিপত্তি! রক্ষী দু'জন তি দ্রুত কাবেরীর শাড়ির আঁচল কন্টকমুক্ত করে দিয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে লে। লজ্জা পেয়ে কাবেরী অধোবদন হল।

* * *

পাশ থেকে চাঁপা বলল, অমন অধোবদন হয়ে থাকিস নে, সই। মুখ তোল। চোখ খ কুমারের চোখে। একবার চেয়ে দেখ দয়িতের চোখের ওই অপরূপ ভাষা। দয়িতের াখের ওই ভাষা বড় বিরল। চোখের ওই ভাষা আত্ম নিবেদনের ভাষা। অমন চোখে াখ রাখলে মুহূর্তে দু'টি মন এক হয়ে যায়।

চাঁদ যে ভাষায় সরসীর পানে চেয়ে থাকে, দয়িতের চোখের ওই ভাষা সেই ভাষা। ুকর যে ভাষায় শতদলার পানে চেয়ে থাকে, ও ভাষা সেই ভাষা। চোখের ওই ষার বাহ্যিকে কিঞ্চিৎ লুব্ধতা প্রকাশ পেলেও অন্তরে তা পবিত্র রে, সই।

সই, একবার মুখ তোল। চোখ রাখ দয়িতের চোখে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার এই দ্বালোকিত নিশীথে তোদের চার চোখের মিলন হোক। তোদের শুভদৃষ্টির পর্বটা জই চুকে-বুকে যাক।

তখন চাঁপার অনুরোধে কাবেরী মুখ তুলল। চোখ রাখল কুমারের চোখে। আর র্তমধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্ট দুটি সুন্দর নর-নারীর দু'টি মন, দু'টি হৃদয় মিলেমিশে এক য় গেল। ওরা অবাক হয়ে দু'জন দু'জনার পানে চেয়ে রইল। এবং চেয়েই রইল। াবেরী মনে মনে বলল, কুমার, তুমি সত্যিই অনন্য। কুমার মনে মনে বলল, কাবেরী, মি সত্যিই অনন্যা।

* * *

বিদায়বেলায় পলাশ কাবেরীর হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, কাল ভাতে আমরা রুদ্রপুরে রওয়ানা হচ্ছি। পাখিরাচরের দখল কায়েম করতে ওখানে পক্ষের লড়াই হবে। যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করার লোভ সামলাতে ারলাম না। তাই এলাম।

কাবেরী বলল, লড়াই জিতে ফিরে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তামার পথ চেয়ে বসে থাকব।

পলাশ বলল, সাবধানে থেকো। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাবধানে থাকার প্রয়োজ আছে। প্রয়োজনে চাঁপার মাধ্যমে আমার মামার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।

কাবেরী বলল, আমি সাবধানে থাকব। আমার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না লড়াইয়ের ময়দানে তুমি সতর্ক থেকো। লড়াই জিতে ভালয় ভালয় ফিরে এসো তোমার জয়ে আমার গর্ব। তোমার শত্রু দলনে আমার অহংকার।

* * *

নিশি অবসান হতে তখনও প্রায় প্রহর খানেক বাকী। রাজবাড়িতে সাজো সাজে রব পড়ে গেছে। রাজাজ্ঞা পেয়ে বনতুলসীর তাবৎ বাছাই-বাছাই লড়িয়ে রাজবাড়ি সম্মুখের বিশাল ময়দানে হাতিয়ার সহ একত্রিত হয়েছে। মশাল হাতে অসংখ্য মশাল বিশাল ময়দানকে আলোকিত করে রেখেছে। রাজাবাবুর বাছাই বাছাই লড়িয়ে পাখিরা চরের দখল নিতে তৈরী হচ্ছে। সর্দার ফজর আলি ওদের প্রয়োজনীয় নির্দে দিচ্ছে। পলাশ এবং বিষ্ণুপদ সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের প্রস্তুতিপর্বের প্রতি লক্ষ রাখছে। খানিক বাদেই ওরা পাখিরাচরের ষোল আনা অংশের দখল কায়েম করে রওনা হবে। ঠিক হয়েছে আজকের দিনটা ওরা রুদ্রপুরে অবস্থান করবে। তারপ আগামীকাল দিগন্ত বিস্তৃত পাখিরাচরে যুযুধান দু'পক্ষের লড়াই হবে। পাখিরা চরে চার আনা অংশের চাষীদের ভাগ্যনির্ধারন হবে ওখানেই।

পুবের আকাশ ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করেছে মাত্র। বাদ্যি-বাজনা, হস্তীর বৃংহ অশ্বের হ্রেষা আর যোদ্ধবেশে সজ্জিত লড়িয়েদের গুঞ্জনধ্বনি শুনে বনতুলসীর প্রজাদে ঘুম ভেঙে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখতে পেল রাজা প্রতাপ রায়বর্মনের শস্ত্রধা লড়িয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে রুদ্রপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

হস্তীপৃষ্ঠে হাওদা আরোহনে, যোদ্ধার বেশে কুমার পলাশ এবং রাজজামাতা বিষ্ণুপ দলের প্রথমে চলেছে। তারপর অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে সর্দার ফজর আলি এবং বহু অশ্বারো লড়িয়ে। আর সবশেষে চলেছে পদাতিকগণ।

কাকভোরে এহেন দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত প্রজারা কানাঘুষা শুরু করে দিল। একজ বলল, ক'মাস আগে হঠাৎই বহেড়ার রাজা বীরভদ্র সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গলা করেছেন। তাই সুযোগ বুঝে স্বর্গীয় রাজার বহেড়া রাজ্যটা এরা দখল করতে চলেছে তা শুনে আর একজন বলল, বাজে কথা! মৃত্যুর আগে রাজা বীরভদ্র সিংহ দত্ত গ্রহণ করেছেন। সেই নাবালক রাজপুত্রের হয়ে রানী কাত্যায়নী দেবী এখন জমিদা চালাচ্ছেন। চুক্তি অনুযায়ী উনি সরকারী খাজনা জমা দিচ্ছেন। তাই তোমার ক আমি মেনে নিতে পারলাম না। অন্য একজন বলল, না, না, তা নয়। ইদানীং কুমারে খুব শিকারের দিকে ঝোঁক হয়েছে। তাই এই শীতের মরসুমে রাজজামাতাকে সঙ্গে নিয়ে কুমার চলেছে শিকার করতে, নাসিমপুরের জঙ্গলে। ওখানে তাঁবু পড়বে। বাইজি নাচ হবে। খানাপিনা হবে। পক্ষকাল ধরে ওখানে শিকার আর আনন্দ-উৎসব চলবে

আর একজন বলল, না, না, তাও নয়। জমিদারের সিপাই-সান্ত্রীরা চলেছে পাখিরা চরের ষোল আনা অংশের দখল কায়েম করতে। কানাঘুসায় আমি তেমনটাই শুনেছি।

যাহোক, বনতুলসীর প্রজাদের মধ্যে কানাঘুষা চলতেই থাকল। আর পলাশ ওর লোকলস্কর নিয়ে রুদ্র পুবের দিকে এগিয়ে চলল।

* * *

নিশি অবসানকালে পলাশ যখন ওর দলবল নিয়ে রুদ্রপুরের দিকে এগিয়ে চলেছিল, ঠিক সেইসময় বিদিশার দিদি সোহিনী ওর বর শিবপদর সঙ্গে বাগদীপাড়ায় এসে হাজির হল। বিদিশার ভাঙাচোরা ঘরদোরের দিয়ে চেয়ে ওরা দু'জন অবাক হল। চারদিক সুনসান। কোন মানুষ ওই বাড়িতে বাস করে বলে ওদের মনে হল না। ওদের দু'জনকে দেখে একটা রাস্তার কুকুর বিদিশার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় চলে গেল।

দীর্ঘদিন পরে ওরা কলকাতা থেকে বনতুলসীতে এসেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এক মহা দুঃসংবাদ।

আজ থেকে প্রায় ছ'বছর আগে বিদিশার দিনমজুর বর হারান বাগদী তার সুন্দরী স্ত্রীর বাক্যবান সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়েছিল।

দিনমজুর হারান পরিবারের ভরন-পোষন ঠিকমতো করতে পারছিল না। ছেঁড়া কাপড় পরে, আধপেটা খেয়ে কোনরকমে ওদের দু'জনের দিন কাটছিল। বাঁশের খুঁটি, চালের খড়, বেড়ার দরমা যোগাড় করাও হারানের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ফলে অনটনের সংসারে ওকে নিত্যদিন স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছিল। অবশেষে আত্মগ্লানিতে বিধ্বস্ত হারান একদিন কাকভোরে চুপিসারে ঘর ছেড়েছিল।

হারান জানত গ্রামে ভাত না জুটলে গ্রাম ছাড়তে হয়। শহরে যেতে হয়। শহরে গেলে ভাত জোটে। মেহনত করলে ওখানে কারো ভাতের অভাব হয় না। তাই বড় আশা বুকে নিয়ে হারান ঘর ছেড়েছিল।

ঘর ছাড়ার আগে হারান মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল যে ও কলকাতায় যাবে। আপাততঃ ও খিদিরপুরে ওর ভায়রাভাই শিবপদর বাসা বাড়িতে যেয়ে উঠবে। পরে ছোটখাটো একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে ও সেখানে চলে যাবে। ওখানে ও মেহনত করে পয়সা কামাবে। পয়সা জমাবে। তারপর কয়েক বছর পরে হঠাৎ একদিন দু'হাত ভরা পয়সা আর স্ত্রীর গা ভরিয়ে দেওয়ার মতো রূপোর গয়না নিয়ে ও বনতুলসীতে ফিরে আসবে। স্ত্রীকে অবাক করে দেবে। ওর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

হারান ভেবেছিল কলকাতা থেকে পয়সা কামিয়ে এনে ও বাগদীপাড়ায় নতুন ঘর তুলবে। নতুন করে সংসার পাতবে। বিদিশার বাচ্চা-কাচ্চা হবে। অনটন দূর হয়ে সংসার সুখ শান্তিতে ভরে উঠবে।

তা খিদিরপুর ডকে ওর ভায়রাভাইয়ের সঙ্গে কুলি-কাবারির কাজ করে হারান

ভালই পয়সা কামিয়েছিল। ভালই পয়সা জমিয়েছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও গা ভরিয়ে দেওয়ার মতো বেশ কয়েকখানা রূপোর গয়নাও গড়িয়েছিল। দু' সপ্তাহের মধ্যেই ও বনতুলসীতে ফিরে যাবে বলেও সোহিনীকে জানিয়েছিল

কিন্তু হারানের দুর্ভাগ্য, ওর সেই আশা আর পূরণ হয়নি। ডকে মাল টানার সম একদিন মালের ধসের নীচে চাপা পড়ে হারান প্রাণ হারিয়েছিল।

সোহিনী আর শিবপদকে বিদিশার উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশের বাড়ি এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল, এই সাতসকালে কে গা তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কাকে চাই তোমাদের?

'পিসি, আমি সোহিনী। বিদিশার দিদি। সঙ্গে রয়েছে আমার বর। শেষ রাতে ট্রেনে আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। তা বিদিশা কোথায়, পিসি?

বিদিশা তো এখন রাজরানী হয়েছে রে, সোহিনী। তাকে এই ভাঙাঘরে খুঁ পাবি কেনে! ছোট গাঙতীরে তাব কোঠাবাড়িতে চলে যা। ওখানে তার দেখা মিলবে

বিদিশা কি ওখানে কাজ নিয়েছে, পিসি?

পিসি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল, কাজ নিতে যাবে কোন্ দুঃখে! কুলে কালি দি মাগী এখন বাইওয়ালী সেজেছে। নিজে নাচছে, সঙ্গে ওর বার ভাতারদেব নাচাচে এই কাকভোরে আমায় আর বকাসনে, বাছা। পোদ্দার বাবুদের দালান বাঁহাতে বে সোজা ছোট গাঙতীরে চলে যা।

সকালবেলায় ভাতার খেদানী নচ্ছার মাগীটার নাম আমার মুখে আনতে হ না জানি দিনটা আমার আজ কেমন যাবে। যাওোসব—।

বৃদ্ধা আপন মনেই একক সংলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। আব তা শুনতে শুন সোহিনী ওর বরকে নিয়ে চটপট বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সোহিনীর মুখ থেকে হারানের মৃত্যুসংবাদ শুনে বিদিশা খুব কাঁদল। খুব কাঁদ তারপর একসময় কান্না থামিয়ে ধরাগলায় ও ওর দিদিকে বলল, মানুষটা এতদি ধরে তোদের কাছে রইল আর তোরা আমাকে একটা খবর দেওয়ার প্রয়োজন বে করলিনে! আর আজ, এতকাল পরে তোরা এয়েছিস আমার কাছে তার মৃত্যুসংব পৌঁছে দিতে! তোরা এত নিষ্ঠুর রে, দিদি!

কি করব বোন, তোর বর যে আমাদের খবর দিতে বারণ করেছিল। মাথ দিব্যি দিয়েছিল। নইলে একখানা পোস্টকার্ড কি আর জুটত না! তুই আমাদের বু বুঝিস নে, বোন।

শিবপদ বলল, হ্যাঁ, ছোট গিন্নী, তোমার দিদি যা বলছে তা সম্পূর্ণ সত্য। হার আমাদের খবর দিতে বারন করেছিল। তুমি যেন আমাদের ভুল বুঝনা।

একটু পরে সোহিনী বলল, হরান তোকে বড্ড ভালবাসত রে, বোন। তোব ভ

ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে টাকা কামিয়েছিল। টাকা জমিয়েছিল। তোর গা ভরিয়ে দেয়ার মতো বেশ ক'খানা রূপোর গয়না ও গড়িয়েছিল। তোকে নিয়ে ও নতুন করে সংসার পাততে চেয়েছিল। নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে নিয়তি ওকে অকালে টেনে নিল। আসলে মানুষ নিয়তির অধীন। সেই দেবী মানুষকে নিয়ে নিরন্তর খেলা করে চলেছে। কত নিষ্ঠুর খেলা খেলে চলেছে। সে তো কারো কথা মানেনা, বোন!

একটু পরে শিবপদর ইশারায় সোহিনী ওর পাশ থেকে একটা পুঁটলি খুলে সেখান থেকে কিছু টাকা আর ক'খানা রূপোর গয়না তুলে নিল। তারপর সেগুলো বিদিশার হাতে তুলে দিয়ে ও বলল, এগুলো তোর বর আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। এগুলো নিয়ে তুই আমাকে দায়মুক্ত কর, বোন।

বিদিশা ওর দিদির হাত থেকে টাকা আর গয়নাগুলো নিয়ে কপালে ঠেকাল। আর তারপর ও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একটু পরে কান্না থামিয়ে বিদিশা ওই টাকা আর গয়নাগুলো ওর দিদির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, মানুষটাই যখন চলে গেছে তখন আর এগুলো নিয়ে আমি কি করব, দিদি? এগুলো তুই বাগদীপাড়ার নিঃস্ব মানুষগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিস; ওদের কাজে লাগবে। আর মানুষটার আত্মাও তাহলে একটু শান্তি পাবে।

তা না হয় দেব। কিন্তু তোর এই মতিগতি হল কেন, বোন? কুলে কালি দিয়ে, মুখে চুনকালি মেখে এ তুই কোন্ সর্বনাশের পথে এসে দাঁড়িয়েছিস? কোন্ নরকে এসে দাঁড়িয়েছিস? তোর ইহকাল পরকাল দুই-ই যে তুই খইয়ে বসে আছিস! তোর কী গতি হবে রে?

আমার আবার গতি! কি যে বলিস, দিদি! ওসব গতিফতি নিয়ে ভাবিস নে তুই। ভেবে কোন লাভ নেই। আমিও ওসব নিয়ে ভাবিনে। এই নরকে আছি। বেশ আছি। আনন্দে আছি। আর এও জানি, এই নরকেই আমাকে থাকতে হবে চিরদিন। আমি জানি, এখান থেকে কেউ কোনদিন আমায় উদ্ধার করবে না। কেউ কোনদিন আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যেয়ে সমাজ-সংসারের মূল স্রোতে প্রতিষ্ঠিত করবে না। সেটা সম্ভব নয়। আর তাই আমি ওসব অলীক কল্পনায় সময় নষ্ট করি না। ওসব নিয়ে ভাবিনা।

একটু থেমে বিদিশা বলল, ওই যে একটু আগে তুই যে দেবীর কথা বললি। যে দেবী মানুষকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলে চলেছে। সেই দেবীই আমাকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর আনন্দের খেলায় মেতেছে। আমার দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে, আমার অসহয়তার সুযোগ নিয়ে, আমার অনাহারের সুযোগ নিয়ে সেই দেবী আমাকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর আনন্দের খেলা খেলছে। আমি জানি একমাত্র আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একদিন এই খেলা শেষ হবে। তার আগে নয়।

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, বিয়ের বছর কাটতে না কাটতেই মানুষটা একদিন আমায় ফেলে পালিয়ে গেল। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমি একা হয়ে

পড়লাম। আমি চোখেমুখে অন্ধকার দেখলাম। দু'মুঠো অন্নের জন্য আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু কেউ আমাকে দু'মুঠো অন্ন দিল না। উল্টে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে আমার একটা কাজ জুটল। পাশের গ্রামের রসিক লাল বাবুর বাড়িতে আমি খাওয়া-পরায় ঝিয়ের কাজ পেলাম। ওদের মস্ত বড় ব্যবসায়। ওদের মস্তবড় সংসার। ওখানে আমি সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতাম। আর সন্ধ্যের পর রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসতাম। কিন্তু এক-একদিন কাজ শেষ হতে বেশ রাত হয়ে যেত। সেদিন আর আমি রাতে বাড়ি ফিরতে পারতাম না। ওদের বাড়িতেই আমি রাতের খাবার খেয়ে নিতাম। তারপর ও বাড়ির গিন্নীমায়ের দেওয়া ছোট্ট ঘরটায় শুয়ে আমি রাত কাটিয়ে দিতাম। পরদিন ভোরবেলায় উঠে আবার আমি কাজে লেগে যেতাম। এইভাবেই চলছিল। বেশ চলছিল।

কিন্তু বেশিদিন চলল না। একদিন রাতে এক অঘটন ঘটে গেল। রাতদুপুরে রসিকলালের ছোট ছেলে মদনলাল চোরের মতো আমার ঘরে ঢুকে আমার পরিশ্রান্ত দেহটার ওপর ঝাঁপিড়ে পড়ল। বাধা দেওয়ার সময় পেলাম না। তার আগেই শয়তানটা একখানা গামছা দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেলল। আমার পরনের শিথিল শাড়িখানা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ও আমার হাত বাঁধল। আমার ইজ্জত নষ্ট করল। আর তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ও আমায় নরম-গরম শাসানির সুরে বলে গেল, রাতে আর বাড়ি ফিরিস নে। আমি রোজ রাতে তোর ঘরে আসব। অনেক টাকা দেব। কিন্তু মুখ খুললে কেটে দু'টুকরো করে ওই বড় গাঙের জলে ভাসিয়ে দেব। কথাটা মনে থাকে যেন।

ভয় আর দুঃশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কেটে গেল। কিন্তু রাত পোহালেই বুঝতে পারলাম কীভাবে যেন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। সকাল থেকেই ঝি-চাকরদের মধ্যে চোখ-ঠারাঠারি চলতে লাগল। কানাঘুষো চলতে লাগল। আড়াল-আবডাল হতে চাপা খিল খিল হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আর বেলা বাড়তেই গিন্নীমা আমার হাতে ক'টা টাকা ধরিয়ে দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল। আমার কাজটা গেল। আবার আমি অনাহারের সম্মুখীন হলাম।

ক'দিন পরে পোড়া পেটের জ্বালায় আবার আমি পথে নামলাম। আশপাশের গ্রামের সচ্ছল পরিবারে কাজের সন্ধান করতে লাগলাম। আর ওই কাজের সন্ধান করতে যেয়েই আমি বুঝতে পারলাম, গ্রামগঞ্জের মন্দ কথাগুলো বড্ড জোরে ছোটে। ছুটতে ছুটতেই তাদের ডালপালা গজায়। আর গ্রামের পুকুরঘাটের মজলিশে তারা পল্লবিত হয়। তারা পুষ্পভারে ভারাক্রান্ত হয়। তখন গন্ধ ছড়ায়। মন্দ কথা তো, তাই মন্দ গন্ধ ছড়ায়। বদবু ছড়ায়। দুর্গন্ধ ছড়ায়। আর উপস্থিত ঠানদিরা সেই দুর্গন্ধের নানা ব্যাখ্যা দেয়। আর ঘাটের বউ-ঝিরা তা শুনে অবাক হয়। তাজ্জব বনে যায়। বলে, কী ঘেন্না, কী ঘেন্না! এমনও হয়!

অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোথাও আমি কাজ পেলাম না। কেউ আমাকে একটা দিল না। উল্টে দু'একজন আবার সে রাতের বাসি গেঁজে-ওঠা উদগ্র কেচ্ছাটা র মুখের 'পরে উগরে দিয়ে আমাকে তারা সোজা অবিদ্যা পাড়ায় যেয়ে দাঁড়ানোর দিল। ওটাই নাকি আমার মতো মেয়ে মানুষের পক্ষে সেরা জায়গা। হায়রে কপাল! হায়রে আমার নিয়তি!

এক ধাক্কায় এতগুলো কথা বলার পর বিদিশা চুপ করল। ওকে বড় বিমর্ষ দেখাতে াগল। ওর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। তা দেখে শিবপদ বলল, থাক ছোট , থাক। আর বলার প্রয়োজন নেই। আমরা সব বুঝতে পেরেছি। তোমার এপথে অনিবার্যতা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তুমি অন্য কথা বল।

আমায় বলতে দাও, জামাইবাবু। সব কথা বলে আমার মনটাকে একটু হাল্কা করতে াও। এই ক'বছর ধরে আমি যে গুমরে মরছি! আমায় তুমি বলতে দাও, জামাইবাবু! তখন চৈত্রমাস। দ্বিপ্রহর। ধুধু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছিলাম। মানুষের দ্বারে দ্বারে খেয়ে খেয়ে তখন আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। লজ্জা, ঘৃণা আর ভয়ে তখন আমি ুরোপুরি বিপর্যস্ত। অনেকক্ষণ ধরেই আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। পা দু'খানা লছিল। তবুও এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু আর পারলাম না। হঠাৎই একরাশ অন্ধকার কোথা থেকে যেন ছুটে এসে আমার চোখেমুখে একটা ঝট্‌কা মারল। আমাকে ফেলে তে চাইল। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য, আমি থিপার্শের একটা নেড়া খেজুর গাছকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। আছড়ে পড়লাম। আমি জ্ঞান হারালাম।

তারপর শেষ রাত্রে যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম এক সুসজ্জিত কক্ষের দুগ্ধফেননিভ য আমি শুয়ে আছি। পালিশ করা আবলুস কাঠের খাট। অনতিদূরে একটা বাতি তার কোমল আলো পালিশ করা খাটে পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। প্রথমে মনে আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ঘোর কাটতেই বুঝতে পারলাম, এ স্বপ্ন নয়। এ বাস্তব। বাস্তব। কিন্তু এ কেমন বাস্তব? বাগদীপাড়ার দুস্থ, নিঃস্ব বিদিশা আমি। অথচ কান্ এক যাদুবলে আজ আমি এই অচিন্‌পুরের রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছি? কার র্ধ খাটে শুয়ে আছি? আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু কোন উত্তর পলাম না।

পরক্ষণেই দেখলাম, আমার জ্ঞান ফিরেছে বুঝতে পেরে একটি বার-তের বছরের টফুটে কিশোরী আমার খাটের কাছে এগিয়ে এল। তারপর সে আমায় জিজ্ঞাসা রল, এখন কেমন বোধ করছ, বিদিশাদিদি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কেরে, বোন? তোকে া আমি চিনতে পারলাম না!

ওমা, তুমি আমায় চিনতে পারলে না! আমি তরঙ্গ গো! খালপারের তরঙ্গবালা। বতারন ঢুলীর মেয়ে।

ও. তুই ভবতারন খুড়োর মেয়ে! অনেক বড় হয়ে গেছিল তো, তাই চিনতে পারিনি তা হ্যাঁরে তরঙ্গ, এ আমি কোথায় এসে পড়েছি? কার মহার্ঘ খাটে শুয়ে আছি?

বলছিগো, বলছি। সব বলছি। ওঠো, এই দুধটুকু আগে খেয়ে নাও। তারপর সব বলছি।

আমি উঠে বসলাম। তরঙ্গ এক গেলাস ঈষদুষ্ণ দুধ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নাও, এটুকু খেয়ে নাও। আগে একটু সুস্থ হও। তারপর সব বলছি।

আমি দুধটুকু খেলাম। তারপর ওকে বললাম, এবারে বল। এটা কার মহল? আমি কার অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি? কার মহার্ঘ খাটে শুয়ে আছি?

তরঙ্গ বলল, এটা রাজপ্রাসাদের পশ্চিমদিকের শেষ মহল। বাবু বসন্ত চৌধুরীর মহল। তোমাকে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে বাবু তোমায় ল্যান্ডো চাপিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন।

বাবু বসন্ত চৌধুরী! তিনি কে?

ওমা, তুমি তাও জান না! তিনি রাজাবাবুর কুটুম গো! মস্ত বড়লোক। কলকাতায় ওঁর মস্তবড় ব্যবসায়।

এবারে চিনলাম। দূর থেকে তাঁকে রাস্তা-ঘাটে দেখেছি। পুকুরঘাটে তাঁকে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে দেখেছি। বন্দুক হাতে তাঁকে পাখি মারতে দেখেছি। ল্যান্ডো চেপে তাঁকে ছুটে যেতে দেখেছি। যতটা তাঁকে দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি আরো অনেক বেশি। তবে সে সবই মন্দ কথা।

আর আজ! আজ দৈবক্রমে আমি তাঁরই বালমলে অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছি! তাঁর মহার্ঘ খাটে শুয়ে আছি! মনে মনে শঙ্কিত হলাম। ঠিক করলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এখান থেকে পালাতে হবে।

তরঙ্গকে বললাম, তোর হাতের দুধটুকু খাওয়ার পর এখন আমি অনেকটাই সুস্থ বোধ করছি। এবারে চলে যেতে পারব। তুই আমাকে মহল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দে। আমি বাড়ি যাব।

তরঙ্গ বলল, সেটি হওয়ার নয়, দিদি। বাবু রাতের ট্রেনে কলকাতায় যাবেন অনেক আগেই মহল থেকে রওনা হয়ে গেছেন। ওখানে তিনি সপ্তাহ দুয়েক থাকবেন তারপর ফিরবেন। ততদিন তুমি এখানেই থাকবে। আমি আর বিলাসী পিসি তোমার সেবা-যত্ন করব। তোমাকে আমরা পুরোপুরি সুস্থ করে তুলব। মকবুল কাকা ল্যান্ডো নিয়ে কবরেজমশাইকে আনতে গেছে। তিনি এলেন বলে।

না, না, ডাক্তার কবরেজের দরকার নেই! বললাম তো, আমি সুস্থ হয়ে গেছি এবারে বাড়ি ফিরব। আমাকে তুই মহল থেকে বেরনোর পথ দেখিয়ে দে।

না দিদি, সেটি হওয়ার নয়। বাবুর হুকুম। তিনি কলকাতা থেকে না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। আর বাবুর হুকুম না মানলে আমাদের চাকরি যাবে। তুমি কী চাও আমাদের চাকরি যাক?

বুঝলাম, ওরা 'হুকুমের চাকর'। বাবুর হুকুম না মানলে ওদের চাকরি যাবে। আর চাকরি গেলে ওরাও হয়তো আমারই মতো অনাহারের সম্মুখীন হবে!

মনে মনে ভাবলাম, না, তা হয় না। তা হতে পারে না। আমি নিশ্চই তেমন কিছু করব না যাতে ওদের চাকরি যায়। ওরা অনাহারের সম্মুখীন হয়।

সুতরাং মনে সাহস এনে আমি বললাম, ঠিক আছে, বাবু কলকাতা থেকে না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। তবে তোদের সঙ্গে আমিও এই মহলের কাজ-কাম করব। তোদের দু'জনের কাজ ভাগ করে নিয়ে আমরা তিনজনে করব।

সেই সময় বিলাসী পিসি ঘরে ঢুকল। এবং ঘরে ঢুকেই পিসি বলে উঠল, এ কেমন কথা বল গো, মেয়ে! তুমি হলে বাবুর অতিথি। এই মহলের অতিথি। তোমাকে দিয়ে আমরা ঝি-চাকররের কাজ করিয়েছি জানতে পারলে বাবু আমাদের চাকরিতে রাখবেন ভেবেছ! দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন না! আর চাকরি গেলে আমরা কী খাব, বাছা। অমন কথা তুমি আর মুখেও এনো না।

তো তখন থেকে শুরু হল নিয়তির আর একখেলা। সে বড় মজার খেলা। বিলাসী পিসি আমার হাত ধরে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আর তারপর আলমারি খুলে আমার হাতে দামী শাড়ি, সেমিজ আর বেশ ক'খানা সোনার গয়না তুলে দিয়ে বলল, নাও, এগুলো পরে নাও। একটু সাজগোজ কর। তারপর নিজের আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে সেগুলো ওই শাড়ি-সেমিজের ওপর রেখে বলল, বাবু কলকাতা থেকে না ফেরা পর্যন্ত তুমিই এই মহলের মালকিন। এ মহলের ভালমন্দ দেখার ভারও তোমার। তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

এও কি বাবুর হুকুম? আমি পিসিকে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, সবই বাবুর হুকুম। উত্তর দিল পিসি।

আচ্ছা পিসি, বাবুর অবর্তমানে তাঁর সব অতিথিই কি এই মহলের অস্থায়ী মালিক অথবা মালকিন হয়ে বসে?

না বাছা, তা হয় না। বাবুদের কলকাতার বাড়ি থেকে এ বাড়িতে আমি প্রায় সাত বছর হল এসেছি। কিন্তু এমনটি আর আমি আগে কখনও দেখিনি।

আচ্ছা পিসি, বাবুতো আমায় চেনেন না। আমার সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেনও না। তবে কেন তিনি আমার ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলেন? এমন হুকুম দিয়ে গেলেন?

তোমার ভাগ্য বিপর্যয়ের সব কথাই আমি বাবুকে বলেছি, বাছা। আর সব কথা শোনার পরই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন হুকুম দিয়েছেন।

আমার সম্বন্ধে তুমি সব জান, পিসি?

হ্যাঁ, সব জানি। গ্রামবাংলার মন্দ কথা রাষ্ট্র হতে বেশি সময় লাগে না। ওসব বাতাসের আগে ছোটে।

কিন্তু কোন্ পরিচয়ে আমি এই মহলে থাকব, পিসি?

সে কথাটাও কী আমায় বলে দিতে হবে, বাছা? তোমার রূপ আছে। যৌবন আছে। অনাহারক্লিষ্ট দেহেও তোমার সে রূপযৌবনে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং তা উথলে উঠেছে।

তুমি স্বামী পরিত্যক্তা। পরপুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা। শরীরী শুচিতাহীনা। এরপরেও কী আমায় বলে দিতে হবে, কোন্ পরিচয়ে তুমি এই মহলে থাকবে?

একটু থেমে পিসি বলল, শত মানুষের চোখের সামনে বাবু তোমাকে রাস্তা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে ল্যান্ডোয় চাপিয়েছেন। ল্যান্ডোয় চাপিয়ে তোমাকে তিনি এই মহলে এনে তুলেছেন। তুমি কী ভেবেছ, এতসবের পরেও বাড়ি ফিরে গেলে তোমাদের বাগদী পাড়ার সমাজ তোমাকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবে? গ্রাম্যসমাজের কদর্যরূপ দেখার দুর্ভাগ্য কী তোমার আগে কখনও হয়নি, বাছা?

দেখ বাছা, আমি নিজেও গ্রামের মেয়ে। এবং বালবিধবা। পান থেকে চুন খসলে গ্রামের সমাজপতিরা আমার দিকে ভ্রূকুটি হেনেছে। আমাকে তারা চোখ রাঙিয়েছে। আঙুল তুলে শাসানি দিয়েছে। আর চোখের জলে আমার বুক ভেসেছে। সে সব অনেক কথা।

একটু থেমে পিসি আবার বলল, তোমার অদৃষ্ট যখন তোমাকে এই মহলে টেনে এনেছে, তখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলে তুমি এই মহলেই থেকে যাও। বাবুর সেবা কর। এবং একছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে তুমি এই মহলেই বিরাজ কর।

এই মুহূর্তে বাবু একা। বড় একা। আর তোমাকে তাঁর মনেও ধরেছে। তাই আমি আবার বলছি, তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, বাছা।

শেষে বিলাসীপিসির কথাই আমি মেনে নিয়েছিলাম। এছাড়া তখন আর উপায়ও ছিল না। সেই রাতে বা তার পরদিন বাড়ি ফিরে গেলে বাগদীপাড়ার সমাজ যে আমায় সহজে ছাড়বে না, সে কথা আমি বিলক্ষণ বুঝেছিলাম।

সেই থেকে আমি বাবুর কাছে রয়ে গেছি। কোনদিন আমি তাঁর কাছে কিছু চাইনি। চাইতে হয়নি। না চাইতেই সব পেয়েছি। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। রাজবাড়ির পশ্চিম দিকের শেষ মহলে অনেকদিন কাটিয়েছি। এই বছর দুয়েক হল তিনি আমার জন্য এই 'বিদিশা কুঞ্জ' গড়ে দিয়েছেন।

বাবু আসলে খামখেয়ালী মানুষ। যখন যা খেয়াল চাপে, করে ছাড়েন। কারো কথা শোনেন না। কারো বাধা মানেন না।

প্রথম দিকের কথা বলছি। একদিন বাবুর খেয়াল চাপল যে তাঁর কাছ থেকে আমার সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটা আমাকে চেয়ে নিতে হবে। আমি রাখঢাক না করে সোজাসুজি বললাম, তুমিই আমার সবচেয়ে পছন্দের। আর তোমাকে তো আমি পেয়েই গেছি। এরপরে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

কিন্তু উনি গোঁ ধরলেন, একটা কিছু ওঁর কাছ থেকে আমায় চেয়ে নিতেই হবে। তো তখন আমি বললাম, বেশ। আমায় তুমি একটু আলো দেখাও। শিক্ষার আলো। জ্ঞানের আলো।

তা আমার সে ইচ্ছা বাবু অপূর্ণ রাখেননি। একজন বৃদ্ধ শিক্ষক নিয়োগ করে উনি আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। ওঁর ইচ্ছায় আমি শিক্ষা আর জ্ঞানের ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়েছি।

একটু থেমে বিদিশা বলল, কিন্তু সব কিছু পেয়েও একজন নারী হিসাবে আজও আমি অপূর্ণই রয়ে গেছি। এত সুখশান্তি পেয়েও আজও আমি প্রকৃত সুখশান্তি পাইনি। প্রকৃত সুখশান্তির ঠিকানা থেকে দূরেই রয়ে গেছি। এ দুঃখ আমি ভুলতে পারি না, জামাইবাবু!

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, এতক্ষণ তো শুধু আমার কথাই শোনালাম তোমাদের। এবারে তোমাদের কথা বল। গোপাল কেমন আছে? কত বড় হয়েছে? লেখাপড়া করছে তো?

গোপাল ভাল আছে। ক্লাস সিক্স-এ পড়ছে। আসার সময় ওকে আমার ধর্ম-দিদির কাছে রেখে এসেছি। আর সেই কারণেই যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে। নইলে ও কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। বলল বিদিশার জামাইবাবু।

আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে। এখন স্নান করে দু'টো খেয়ে নাও তোমরা। রাত জেগে এসেছ। বলল বিদিশা।

সোহিনী বলল, আসবার পথে আমার সই রোহিনীর সঙ্গে দেখা হল। দুপুরে ওদের বাড়িতে খেতে বলেছে আমাদের। তাই ভাবছি স্নানটা এখান থেকে সেরে নিয়ে আমরা ওদের বাড়ি যাব। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করব। তারপর ওখান থেকেই কাল সকালে কলকাতায় ফিরে যাব। তোর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে না।

সোহিনীর কথা শুনে বিদিশা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবং কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমি কী এতই অস্পৃশ্য-অশুচি যে আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করলে তোদের জাত যাবে! আমার বাড়িতে রাত কাটালে তোদের দুর্নাম রটবে।

একটু থেমে বিদিশা বলল, লোকে বলে আমি নষ্টা, আমি দুঃচরিত্রা। কিন্তু কেন আজ আমি নষ্টা, কেন আজ আমি দুঃচরিত্রা সে কথা তো কেউ একবার ভেবে দেখে না! কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমি এই নরকে আসতে বাধ্য হয়েছি, সে কথা তো কেউ একবার চিন্তা করে না!

লোকে আমাকে ঘৃণা করে। আমার নিন্দা করে, ছি ছি করে। কিন্তু আমার পশ্চাতে আমাকে যারা ঘৃণা করে, আমার নিন্দা করে, ছিছি করে, তারাই আবার দায়ে পড়ে আমার সম্মুখে এসে হাত পাতে। আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। কেউ আসে পিতৃদায়ে,

কেউ মাতৃদায়ে, কেউ কন্যাদায়ে। আবার কেউ কেউ আমার সম্মুখে এসে হাতপাতে জঠর জ্বালায় কাতর হয়ে। আমি যদি দুশ্চরিত্রা হই তবে এইসব দ্বিজিহ্ব মানুষগুলো কোন্ চরিত্রের? এদের বিচার কে করবে?

ওই শয়তান মদনলাল রাতের অন্ধকারে, চোরের মতো আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ধর্ষণ করল। অথচ মানুষ ওই শয়তানটার বিচার করল না। ওই ধনীপুত্রের বিচার করার কথাটা কেউ একবার মুখেও আনল না। কিন্তু একটা রাতের অঘটনের জেরে আমি সারাজীবনের মতো আমার কাঙ্ক্ষিত গৃহকোণ হারালাম। সমাজ সংসারের মূল স্রোত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মানুষের কাছে আমি নষ্টা, দুঃচরিত্রা, দেহপসারিনী হয়ে গেলাম। বলতে পারিস তোরা, মানুষের এ কেমন বিচার?

বেশ। এই নষ্টা, দুঃচরিত্রা, অস্পৃশ্যা অশুচির ঘরে পাত পাততে যদি তোদের ঘৃণা বোধ হয়, তবে তোরা তোদের পছন্দের শুচি-শুদ্ধ পবিত্রজনের ঘরে যেতে পারিস। তাদের ঘরে রাত কাটাতে পারিস। তবে যাওয়ার আগে তোরা একটা কথা জেনে যা। আমার এই বিদিশাকুঞ্জে আমি যে নিশি-পসার সাজাই সেখানে শুধু আমার নাচ গান বিকিকিনি হয়। আমার দেহ বিকিকিনি হয় না। আমি বাইজী কিন্তু দেহপসারিনী নই।

বিদিশা চুপ করল। ও সাশ্রু নয়নে মুখ নীচু করে বসে রইল। তা দেখে ওর জামাইবাবু বলল, তুমি সত্বর আমাদের স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা কর, ছোটগিন্নী। বড্ড খিদে পেয়েছে। আর এখনই লোক পাঠিয়ে তোমার দিদির সইয়ের বাড়িতে খবরটা জানিয়ে দাও।

* * *

তো সেদিন বিকালে ছোটগাঙ পার হয়ে জনার্দনের বিধবা মা সরযূবালা দাসী এক জরুরী প্রস্তাব নিয়ে কাবেরীর মা ফুলমালা দাসীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ওঁর জরুরী প্রস্তাবটা হল, আগামী বুধবারেই উনি শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চান কারণ ওঁর সর্বক্ষণের বিধবা ঝি শশীমুখীর বাতের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়েছে আর উনি নিজেও একজন বাতের রুগী। শেষ অগ্রহায়ণের এই কনকনে শীতে ওঁর নিজের ব্যথাটাও বড্ড বেড়েছে। তার ফলে ওঁর সংসারটাই হয়ে পড়েছে বেহাল

সরযূবালার প্রস্তাব শুনে ফুলমালা বললেন, তা কী করে সম্ভব? আজ রোববার মাঝে আর মাত্র দু'টো দিন। এত তাড়াতাড়ি কী আর মেয়ের বিয়ের যোগাড় করা যায়! তাছাড়া টাকাপয়সা কোথায়? বরপণের পুরো টাকাও তো এখনও আমি যোগাড় করতে পারিনি। এই অবস্থায় মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, দিদি।

সরযূবালা বললেন, ঠিক আছে, বোন। বরপণের টাকার অর্ধেকটা তুমি এখন দাও আর বাকী অর্ধেক টাকা তুমি পরে শোধ দিও। তাতেই হবে। এখন নম নম করে

্মি ওই বুধবারেই ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও। চার হাত এক করে দাও। আমার ড্ড ঠেকা। তুমি আর না কোরো না, বোন।

না দিদি, তা সম্ভব নয়। বৈষ্ণবঠাকুর বাড়ি নেই। টাকা পয়সার যোগাড় নেই। ট করে অমনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও বললেই কী আর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়? কটা মেয়ের বিয়েতে কী কম ঝক্কি-ঝামেলা?

বৈষ্ণব ঠাকুর বাড়ি ফিরুক। টাকাপয়সার যোগাড় হোক। তারপর ভেবেচিন্তে যা য় করা যাবে। আর একান্তই যদি ওই বুধবারেই তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে াও, তাহলে অন্যত্র দেখ। তোমাদের বনতুলসীতে তো আর সোমত্ত মেয়ের আকাল াড়েনি।

না, তা পড়েনি। তবে কিনা একদিন তুমি আমার হাতেপায়ে ধরে অনুরোধ করেছিলে। তোমার মেয়েটাকে আমার পায়ে ঠাঁই দিতে বলেছিলে, তাই। নইলে নতুলসীতে আর সোমত্ত মেয়ের অভাব কী!

তবে হ্যাঁ, তোমার মেয়ে সুন্দরী। লেখাপড়া শিখেছে। ধর্মশাস্ত্রর পড়েছে। গানবাজনা ানে। তাই তোমার মেয়েটাকে আমার ছেলের মনে ধরেছে। নইলে সোনাঝরার ময়েদের চেয়ে বনতুলসীর মেয়েরা কম কীসে!

তুমি আমায় ক্ষমা কর, দিদি। এখন আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। তোমার যখন চট্জলদি বউ দরকার, তখন তুমি অন্য ঘরে ছেলের বিয়ে দাও। আমাকে রেহাই দাও।

ফুলমালার কথা শুনে সরযূবালা ক্ষুব্ধ হলেন। এবং তিনি মনে মনে ভাবলেন, যহেতু স্বয়ং রাজা প্রতাপ রায়বর্মন চাইছেন জনার্দনের সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে হোক, তাই জনার্দনের সঙ্গেই কাবেরীর বিয়ে হবে। অন্য ঘরে ছেলে বিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর, যেহেতু স্বয়ং রাজার ইচ্ছা এ বিয়ে তাড়াতাড়ি হোক, তাই এ বিয়ে তাড়াতাড়িই হবে। বৈষ্ণবঠাকুরের পথ চেয়ে বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না।

সুতরাং ক্ষুব্ধ সরযূবালা ফুলমালাকে বললেন, তা হয় না, ফুলমালা। গত এক ছর ধরে আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আর এখন তুমি বলছ, অন্য ঘরে ছেলে বিয়ে দাও। তা হয় না।

ক্ষুব্ধ সরযূবালা এবারে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, শোন ফুলমালা। তোমার এই দেমাক কিন্তু আমি সহ্য করব না! আগামী বুধবারেই আমি আমার ছেলের বিয়ে দেব। এবং তোমার মেয়ে কাবেরীর সঙ্গেই বিয়ে দেব। দেখি তুমি কেমন করে এ বিয়ে আটকাও!

তুমি জোর করে বিয়ে দেবে নাকি? বলি দেশে আইন-কানুন বলে কী কিছু নেই াকি?

কাবেরী জনার্দনের বাকদত্তা। সুতরাং বিয়েটা আইন মেনেই হচ্ছে। তুমি বিয়ের যোগাড় কর। অন্যথায়—।

অন্যথায়? অন্যথায় কী করবে তুমি শুনি?

সময় হলেই দেখতে পাবে।

অমন প্রতাপান্বিত জমিদার যার সহায় তার আর বেশি কথা বলার প্রয়োজন ক্রুদ্ধ সরযূবালা এমনটা ভেবেই আর কথা বাড়ালেন না। উনি দর্পিত পদক্ষে ফুলমালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। জলধর মাঝি বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল উনি জলধরকে বললেন, লগি তোল। বাড়ি ফিরব।

জনার্দনের মুখ থেকে সব কথা শোনার পর রাজাবাবু বললেন, তোমার মা ঠিব বলেছেন, কাবেরী তোমার বাগদত্তা। আর তাই ওই বুধবারেই তোমার সঙ্গে কাবেরী বিয়ে হবে। এটা পুরোপুরি আইন সম্মত। তুমি এখনই বাড়ি ফিরে যাও এবং বিয়ে আয়োজন কর।

রাজাজ্ঞা পেয়ে জনার্দন একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এ সেদিন থেকেই সে বিয়ের আয়োজন শুরু করে দিল।

জনার্দন ফর্দ দেখে বিয়ের কেনাকাটা করতে লাগল। বাড়ি বাড়ি যেয়ে আত্মী স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করতে লাগল। আর বিয়েটা স্বয়ং জমিদারবাবুর ইচ্ছায় হচ্ছে জনার্দন সে কথাটা জানাতে ভুলল না।

এদিকে জনার্দন রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই রাজাবাবু কানা পরানকে ডে পাঠালেন। তারপর কানাপরান আসতেই তিনি তাকে ফুলমালা বোষ্টমীর মে কাবেরীকে চুপিসারে তুলে এনে গুমঘরে আটক করার হুকুম দিলেন। ওদি পাহারাদারদের সর্দার কুটিশ্বর হালদারকে ডেকে এনে রাজাবাবু তাকে গুমঘরে বিশে পাহারা বসাবার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি নায়েব মশাইকে বললেন, যেহেতু দু'দি বাদেই মেয়েটি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে, তাই গুমঘরে যেন মেয়েটির প্রতি যথে সদয় ব্যবহার করা হয়।

রাজাবাবুর হুকুম শুনে কানাপরান এতক্ষণ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে উস-খুস উ খুস করছিল। এবারে রাজাবাবু থামতেই সে হাতকচলাতে কচলাতে বলল, আ রাতদুপুরে চুপিসারে বোষ্টমীর মেয়েটাকে তুলে এনে গুমঘরে আটক করার কাজ একটা বৈষ্ণব-ভাব ফুটে উঠছে, হুজুর। অমন একটা সাদামাঠা কাজে কোন উৎসা পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া কাজটায় কোন উল্লাস প্রকাশের সুযোগও থাকছে ন

রাতদুপুরে একজন অবাধ্য প্রজার সুন্দরী কন্যেকে অপহরণ করা হবে অথচ আ জ্বলবে না, ঘরবাড়ি পুড়বে না। কান্নাকাটি হবে না। চিৎকার চেঁচামেচি হবে ন ব্যাপারটা বড়ই ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে।

তাই বলছিলাম হুজুর, কয়েক পাঁইট কেরাসিন আর ওই জনা দশেক সঙ্গীস

পেলে কাজটা যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উল্লাস সহকারে সম্পন্ন করা যেত। আর ওই প্রথা মেনে কাজটায় একটা বীরত্বের ভাবও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত।

কিন্তু কানাপরানের সদিচ্ছায় জল ঢেলে দিয়ে রাজাবাবু বললেন, ফুলমালা বোষ্টমী অবাধ্য প্রজা হলেও সে আমাদের প্রজা নয়। সে রায়রায়ানদের প্রজা। আর রায়রায়ানদের প্রজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে আমরা তাঁদের বিরাগভাজন হতে চাইনা। তাই এই অপহরণ কর্মে আগুন জ্বলবে না, ঘরবাড়ি পুড়বে না। কান্নাকাটি বা চিৎকার চেঁচামেচি হবে না।

তুই রাতদুপুরে দু'জন সঙ্গী নিয়ে সেতু পার হয়ে ওপারে যাবি। এবং বোষ্টমীর মেয়েটাকে চুপিসারে তুলে এনে গুমঘরে আটকে দিবি। পুরো কাজটাই করতে হবে চুপিসারে এবং সবার অগোচরে। আর সেই কারণেই তোদের ওই উল্লাস প্রকাশ এবং বীরত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছেটা এ যাত্রায় ত্যাগ করতে হবে।

এহেন হুকুম শুনে ম্রিয়মান কানাপরান রাজাবাবুকে হাতজোড় করে প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

সন্ধ্যার পরে ছদ্মবেশে চাঁপা গেল বিদিশাকুঞ্জে। জলসাঘর আজ সুনসান। নাচগান আজ বন্ধ। ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে, ভারাক্রান্ত মনে বিদিশা চোখ বুজে মহার্ঘ পালঙ্কে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ও নানান কথা চিন্তা করছিল।

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে চিন্তা করতে বিদিশার ভাল লাগে। অমন নিরিবিলিতে শুয়ে ও নানা কথা চিন্তা করে। কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতেও অমন নিরিবিলি অন্ধকার পরিবেশ ওর সহায়তা করে।

এমনই নিরিবিলি অন্ধকারে শুয়ে বিদিশা মাঝে মাঝে এক সুখ স্বপ্ন দেখত। অবাস্তব জেনেও সেই সুখ স্বপ্নে ও বিভোর হয়ে থাকত। সেই অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে ওর ভাল লাগত। বড় ভাল লাগত।

নিরিবিলি অন্ধকারে শুয়ে বিদিশা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখত, বহুদিন পরে ওর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্বামী হঠাৎই ঘরে ফিরে এসেছে। আর তারপর ওকে নিয়ে ওর স্বামী কোন এক দূর গাঁয়ে চলে গেছে। সেথায় একটা পাতার কুটির বেঁধেছে। সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় ওর ক্লান্ত স্বামী ঘরে ফিরে এসেছে। সারাদিন সংসারের কাজের শেষে বিদিশা তখন তুলসীতলায় মঙ্গলদীপ জ্বেলে দিয়েছে। মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে তখন ও সংসারের মঙ্গল কামনা করছে। ওর স্বামীর জন্য ও মঙ্গল কামনা করছে। ওর কচিকাঁচাগুলোর জন্য ও মঙ্গল কামনা করছে। এমন সুখ স্বপ্ন দেখতে ওর ভারি ভাল লাগত।

কিন্তু বিদিশার সেই সুখস্বপ্ন হঠাৎই ভেঙে গেছে। ওর সেই স্বপ্ন দেখা হঠাৎই

শেষ হয়ে গেছে। ইহজন্মের মতো শেষ হয়ে গেছে। এসব কথা চিন্তা করতেই অন্ধকারে ওর দু'চোখ বেয়ে ক'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল।

দুঃসংবাদগুলো যেন সারিবদ্ধভাবে বিদিশার দিকে এগিয়ে আসছে। গতকাল সকালে ও ওর স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ শুনেছে। আর আজ বিকালে ও পলাশের গুরুতর আহত হওয়ার সংবাদ শুনল। বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে ওর মনে হল আরো অনেক দুঃসংবাদই বুঝি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। আরো অনেক দুঃসংবাদই বুঝি ওর দিকে এগিয়ে আসার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ বিকেলে রাজজামাতা বিষ্ণুপদর প্রেরিত বিশেষ অশ্বারোহী দূত সংবাদ নিয়ে এসেছে যে পাখিরাচরের লড়াইটা ওরাই জিতেছে। তবে লড়াইয়ের ময়দানে পলাশ আহত হয়েছে। ওর আঘাত গুরুতর। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার পর আজ রাতের ট্রেনেই ওকে কলকাতায় পাঠাতে হবে। ওর সুচিকিৎসার প্রয়োজন। অন্যথায় বিপদ ঘটতে পারে।

এহেন দুঃসংবাদ শুনে রানী সুমিত্রা দেবী ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু রাজা প্রতাপ রায়বর্মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

রাজবাড়িতে বিদিশার নিয়োজিত লোক দুঃসংবাদটা সঙ্গে সঙ্গেই বিদিশাকে পৌঁছে দিয়েছে।

পলাশের জন্য এখন বিদিশার চিন্তা হয়। চিন্তা হয় ওই অসহায় কাবেরীর জন্যও। ওদের দু'জনের জীবন আজ একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। পলাশের কিছু হয়ে গেলে কাবেরীকে বাঁচানো যাবে না। ও নির্ঘাত মারা যাবে। অন্ধকারে শুয়ে, ভারাক্রান্ত মনে বিদিশা ওদের দুজনের কথা চিন্তা করছিল।

দূর মারফত প্রেরিত সংবাদ শুনে বিদিশার মনে হয়েছে যে লড়াইয়ের ময়দানে পলাশের আহত হওয়াটা নিছকই অন্তর্ঘাতের ফল। ওটা পূর্বপরিকল্পিত। ওটা একটা চক্রান্ত। আর পলাশ সেই চক্রান্তের শিকার।

পাখিরাচরের চার আনা অংশের চাষীরা জীবনপন করে ওদের রুটি-রুজির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ওরা লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারেনি। লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ চার আনা অংশের চাষীরা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করতে নেমেছিল। কিন্তু রাজা প্রতাপ রায়বর্মনের অভিজ্ঞ লড়িয়েদের আক্রমণে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওরা বিধ্বস্ত হয়েছিল। ওদের সর্দার সেখ ফরমান লড়াইয়ের ময়দানে বন্দি হয়েছিল। বন্দি হয়েছিল ওদের আরো অনেক লড়িয়ে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয়ী লড়িয়েদের আনন্দধ্বনি আর গগনভেদী চিৎকারের মধ্য দিয়ে পাখিরাচরের লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত শেখ ফরমান এবং অন্যান্য বন্দিদের রাজজামাতা বিষ্ণুপদর তাঁবুর দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই পেছন থেকে কেউ একজন অশ্বারোহী পলাশের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে

তীর চালিয়েছিল। তীরবিদ্ধ পলাশ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নীচে পড়ে গিয়েছিল।

অশ্বারোহী সর্দার ফজর আলি তখন কিছুটা দূরে অবস্থান করছিল। এহেন দৃশ্য দেখে হতচকিত সর্দার অতি দ্রুত পলাশের কাছে ছুটে গিয়েছিল এবং ভূপতিত পলাশের পৃষ্ঠদেশ তীরমুক্ত করেছিল। কিন্তু উক্ত তীরের গঠনশৈলী দেখে সর্দার অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ ওই তীরের গঠনশৈলী ছিল অবিকল রাজা প্রতাপ রায়বর্মনের কামারশালে তৈরী তীরের মতো। অবাক ফজল আলির মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এসেছিল, 'শালা বেইমান।'

পরিচারিকার মুখে বনফুল নাম শুনেই বিদিশা বুঝতে পারল, চাঁপা এসেছে। বিদিশা পরিচারিকাকে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বনফুলকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বলল।

বনফুল উদভ্রান্তের মতো ঘরে প্রবেশ করল। বিদিশা ওকে পালঙ্কের উপরে বসতে বলল। বনফুল পালঙ্কের একপাশে বসল। ওর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

বনফুল চাপাস্বরে বলল, বড় খারাপ খবর, বিদিশাদিদি! লড়াইয়ের ময়দানে পলাশ আহত হয়েছে। ওর আঘাত গুরুতর।

বিদিশা বলল, ওটা পূর্বপরিকল্পিত। ওটা একটা চক্রান্ত। পলাশ চক্রান্তের শিকার। চিকিৎসার জন্য ওকে আজ রাতের ট্রেনে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা মামা বসন্ত চৌধুরী ওর সঙ্গে যাবেন।

বনফুল বলল, খবর পেয়েছি আজ দুপুররাতে রাজাবাবুর লোক কাবেরীকে অপহরণ করবে!

বিদিশা নির্লিপ্তভাবে বলল, তার আগেই আমাদের লোক কাবেরীকে হরণ করবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ও নিয়ে তুই চিন্তা করিস নে, বনফুল।

আমাদের লোক কাবেরীকে হরণ করবে! তারা কারা?

বললাম তো, তারা আমাদের লোক। দীপক রায়ের পরিচালনায় তারা কাবেরীকে হরণ করবে। আমি বিশেষ ঘোড়সওয়ার মারফত হুতোমপুরের দীপকবাবুর কাছে খত পাঠিয়েছিলাম। উনি কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

দীপক রায়! মানে কাবেরীর সেই অবৈধ—।

ওটা রটনা। ওতে সত্য কিছু নেই। আমি দীপকবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। অন্যভাবেও খোঁজ নিয়েছি।

দীপক রায় আর কাবেরীর মা কৃষ্ণা দু'জনে কৈশোরের প্রেমিক-প্রেমিকা। এর বেশি কিছু নয়! দীপকবাবু নিষ্কলঙ্ক।

একটু থেমে বিদিশা বলল, বহু সন্ধানের পর আমি রটন্তী অপেরার তৎকালীন অধিকারী সূর্যকান্ত দাস মশাইয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। বয়সের ভার আর ব্যাধির প্রকোপে এখন তিনি নুব্জ-কুব্জ। তাঁর মুখ থেকেই আমি জেনেছি যে ওই অপেরার সুজন

দাস নামে এক উচ্ছৃঙ্খল এবং দুশ্চরিত্র সখের অভিনেতাই কাবেরীর অবৈধ জন্মদাতা; শয়তানটা কৃষ্ণাকে বলাৎকার করেছিল। তবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত সুজ বহুদিন আগেই মারা গেছে। তার মৃতদেহ কাশীর এক বারবনিতার ঘরে পাওয় গিয়েছিল। কিন্তু ওই বারবনিতার কোন খোঁজ মেলেনি। ফলে সুজনের মৃত্যুর সঠি কারণও জানা যায়নি।

একটু থেমে বিদিশা আবার বলল, সেই সময় কৃষ্ণা অন্তঃসত্বা ছিল। কিন্তু ত সত্বেও তাকে বলপূর্বক অপেরা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই অমানবি আচরণের জন্য অধিকারী মশাই দুঃখ প্রকাশ করলেন। আর এক কন্যা সন্তান প্রসবে অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণার মৃত্যু হয়েছিল শুনে তিনি শোক প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণা সেই কানীন কন্যা বর্তমানে বিবাহযোগ্যা শুনে তিনি কিঞ্চিৎ খুশিও হলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর বনফুল বলল, কাবেরীকে আগেভাগে সরি নিলে ও বেচারী হয়তো রাজাবাবুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু রাজাবাবুর দুর্বৃত্তে না পেয়ে শেষে ফুলমালা বৈষ্ণবীর প্রাণ নেবে। সেদিকটা একবার ভো দেখেছ, বিদিশাদিদি?

হ্যাঁ, সে দিকটাও ভেবেছি। কাবেরীর সঙ্গে ওর মাকেও সরিয়ে নেওয়া হবে তবে ক'টা দিনের জন্য কাবেরী আর ওর মাকে তোদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখ হবে, পারবি তো?

খুব পারব। আমাদের মস্তবড় গোয়ালঘর। তার একপাশে থাকে আমাদের গর বাছুর আর অন্যপাশে খড়ের গাদা। খড়ের গাদার পাশে কাবেরী আর ওর মা অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যাবে। কেউ টের পাবে না। ওনিয়ে তুমি চিন্তা কোরো ন ও ভারটা আমি নিলাম।

তবে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। এবারে তাহলে তুই বাড়ি ফিরে য বাড়ি ফিরে যেয়ে তোর বাবা মা আর কুটিশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ব্যব পাকা করে ফেল। সময় বড় কম।

কিন্তু তবুও একটা সমস্যা রয়েই যাচ্ছে, বিদিশাদিদি। রাজাবাবুর দুবৃর্ত্তেরা কাবে হরণে ব্যর্থ হলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং নির্দ্বিধায় ওরা কাবেরীদের ঘরবাড়ি জ্বালি দেবে। রাধাবল্লভজীর মন্দিরও বাদ যাবে না। দুর্বৃত্তের চোখে দেববিগ্রহ তো পুতু মাত্র।

ওসব সমস্যার সমাধান আমি করব। ও নিয়ে তুই চিন্তা করিস নে। কাবেরীদে ঘরবাড়ি জ্বলবে না। দেবমন্দির পুড়বে না। রাধাবল্লভজীও কলুষিত হবেন না। অ বিগ্রহের নিত্যপূজাও যথারীতি চলবে। ও সব চিন্তা আমার। ওসব ব্যবস্থা আমি কর

এখন তোকে আমি যা বলি, তুই তাই কর। তুই এখনই বাড়ি ফিরে যা এবং সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেল। সময় বড় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, বনফুল!

*　　*　　*

রাজবাড়ির প্রায় সমস্ত নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীই বনতুলসী আর সোনাঝরার মানুষ। ফলে রাজবাড়ির গোপন কথাগুলো ওই দুই গ্রামের মানুষের কাছে প্রায়ই গোপন থাকে না। একান থেকে সেকান। সেকান থেকে আর এককান হয়ে যায়। আর এইভাবেই রাজবাড়ির প্রায় সব গোপন কথাই শেষ পর্যন্ত পাঁচকান হয়ে যায়।

এক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছিল। কাবেরী হরণের ব্যাপারটাও পাঁচকান হয়ে গিয়েছিল। রাজাবাবুর লোকেরা যে আজ রাত্রেই কাবেরীকে হরণ করবে, এ ব্যাপারটা সোনাঝরার মানুষ জেনে গিয়েছিল। আর রাজাবাবুর ইচ্ছায় আগামী বুধবারেই যে জনার্দনের সাথে কাবেরীর বিয়ে হবে, সে খবরটা তো গ্রামে আগেই চাউর হয়ে গিয়েছিল।

কাবেরী হরণের ব্যাপারটা তাই সোনাঝরার মানুষ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে নিয়েছিল।

সোনাঝরার মানুষ যা বুঝেছিল তা হল, যেহেতু ফুলমালা বৈষ্ণবীর এ বিয়েতে সম্মতি নাই, তাই আজ রাত্রেই রাজাবাবুর লোক কাবেরীকে হরণ করবে। এবং বৈষ্ণবীর মতামতের তোয়াক্কা না করে আগামী বুধবারেই রাজাবাবু জনার্দনের সাথে কাবেরীর বিয়ে দেবেন। একেবারে জলের মতো সোজা ব্যাপার। এতে ভয়ভীতি বা উদ্বেগের কোন কারণই নেই।

আর এ বিয়েতে বৈষ্ণবীর অসম্মতির ব্যাপারটাকে গ্রামের মানুষ মোটে আমলই নিতে চায়নি। কারণ রাজাবাবুর ইচ্ছায় যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারেই কাবেরীর বিয়ে হতে চলেছে। নিন্দুকেরা যাই বলুক না কেন, রাজাবাবুও যে মাঝেমধ্যে দু'একটা ভাল কাজ করে থাকেন, এটা তো তারই একটা প্রমাণ।

*

শেষ অগ্রহায়ণের প্রচন্ড শীতে সোনাঝরার মানুষ রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে, শীতের কাঁথা মুড়ে, যে যার ঘরে শুয়ে পড়ল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গ্রাম সুনসান হয়ে গেল। কিন্তু ওর মধ্যেই আবার দু'একজন ঘুমোতে পারল না। তাদের চোখে ঘুম এল না। তাদের মনটা উস-খুস করতে লাগল। তাদের বড় ইচ্ছা হল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কাবেরী হরণ পর্বটা প্রত্যক্ষ করা। এবং পরদিন সকালে উঠে বিষয়টাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, নানা শব্দালঙ্কারে ভূষিত করে গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করা।

সুতরাং মনটা উস-খুস করায় যারা ঘুমোতে পারল না তারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে

কাবেরী হরণ পর্ব প্রত্যক্ষ করল। তারা লক্ষ্য করল, রাতের দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতেই মুখে কালো কাপড় বাঁধা কয়েকজন লোক কাবেরীদের উঠোনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা হাতমুখ বাঁধা কাবেরী এবং ফুলমালা বৈষ্ণবীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে, অতি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দৃষ্টিশক্তির বাইরে চলে গেল।

কাবেরী হরণ পর্ব সমাপ্ত হল। উৎসুক জনেরা যে যার ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু তারা ঘুমোতে পারল না। এবারেও তাদের চোখে ঘুম এল না। কারণ এবারে তারা পরিবেশন চিন্তায় মগ্ন হল। পরদিন সকালে উঠে বিষয়টাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নানা শব্দালঙ্কারে ভূষিত করে কিভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করলে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে, এবারে তারা সেই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল। বিষয়টাকে একবার তারা তাদের মনের মতো করে গড়ল। কিন্তু অপছন্দ হওয়ায় আবার তারা সেটাকে ভাঙল। আবার গড়ল। আবার ভাঙল। এইভাবে চলতে থাকল। রাত বাড়তে থাকল।

শেষে মধ্যরাত্রে আচমকা অশ্বক্ষুর শব্দ শুনে জেগে থাকা মানুষগুলোর চিন্তাজাল ছিন্ন হল। অমন অসময়ে অশ্বক্ষুর শব্দ শুনে তারা চকিত হল। চকিতে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। এবং তারা অবাক হয়ে দেখল, মুখে কালো কাপড় বাঁধা তিনজন যণ্ডামার্কা লোক কাবেরীদের উঠোনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। পরমুহূর্তে তারা কাবেরীদের ঘরে ঢুকল। এবং একজন যুবতীর হাতমুখ বেঁধে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে অতি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারা অন্ধকারে মিশে গেল।

এহেন দৃশ্য দেখে জেগে থাকা মানুষগুলো তাজ্জব বনে গেল। তারা ভেবে পেল না, প্রথমবারে যদি রাজাবাবুর লোক কাবেরীকে হরণ করে থাকে, তবে এবারে তার কাকে হরণ করল। দ্বিতীয়বারে যাকে হরণ করা হল, সেও যে একজন যুবতী তা তারা বেশ বুঝতে পারল। কিন্তু কে ওই যুবতী? ফুলমালা বৈষ্ণবীর ঘরে হঠাৎ ওই দ্বিতীয় যুবতী এলই বা কোথা থেকে? কোন প্রশ্নের উত্তর মিলল না। কিন্তু ব্যাপারটা যে রীতিমতো গোলমেলে তা তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারল। এবং উট্‌কো ঝামেলায় না জড়িয়ে, পরদিন সকালে উঠে মুখে কুলুপ এঁটে থাকাটাই যে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাও তারা বেশ বুঝতে পারল।

* * *

পরদিন দুপুরে গুমঘরে বন্দি মেয়েটাকে খাবার দিতে যেয়ে রাধার মা অবাক হল কাল দুপুররাত থেকে যাকে গুমঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেতো কাবেরী নয় এযে অন্য মেয়ে! রাধার মা ভেবে পেল না, কাল দুপুর রাতে ড্যাকরাগুলো কাকে ভেবে এ কাকে তুলে নিয়ে এসেছে! বুধবারে যার সঙ্গে জনার্দনের বিয়ে হবে সে কোথায়? সর্বনাশ হয়েছে! ড্যাকরাগুলো নিশ্চয়ই গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে অন্য কাকে

্লে এনে ফাটকে পুরে দিয়েছে। একেবারে সর্বনাশ করে ছেড়েছে! কাল বিলম্ব না রে, খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে রাধার মা ছুটল রানীমার কাছে।

ব্যাপার শুনে রানীমাও কম অবাক হলেন না। উনি রাধার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ই ঠিক দেখেছিস রাধার মা, গুমঘরে যে মেয়েটিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে সে াবেরী নয়?

আজ্ঞে না রানীমা, ও মেয়ে কাবেরী নয়। অন্য কেউ। কাবেরীকে আমি ভালমতো নি। এই বন্দি মেয়েটির মুখখানাও চেনা চেনা ঠেকছে। তবে ঠিকমতো ঠাওর করতে ারছিনে।

ঠিক আছে। কথাটা তুই পাঁচকান করিসনে। এখন চল আমার সঙ্গে। আমি য়েটিকে দেখব। ওর সঙ্গে কথা বলব।

তুমি গুমঘরে যাবে, মা! রাজাবাবু শুনলে রাগ করবেন না?

সে চিন্তা আমি করব। তুই চল আমার সঙ্গে।

অতঃপর রাধার মাকে সঙ্গে নিয়ে রানীমা চললেন গুমঘরে। রানীমাকে দেখে ুমঘরের প্রহরীদ্বয় লৌহদ্বার খুলে দিল। রানীমা সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেলেন। াধার মা পথ দেখিয়ে রানীমাকে বন্দিনীর কাছে নিয়ে গেল।

রানীমা বন্দিনীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর উনি বন্দিনীকে জিজ্ঞাসা রলেন, কে তুমি?

বন্দিনী উত্তর দিল, আজ্ঞে আমি রঙ্গিলা।

রানীমা বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা এই অল্প বয়সে মরবার সাধ জাগল কেন? সখ করে তো কেউ এই মৃত্যুগহ্বরে প্রবেশ করে না!

আজ্ঞে, সখ করে তো আমি এখানে আসিনি, রানীমা। কাল রাতদুপুরে আপনার লোকজন আমায় ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে এসে এখানে ফেলে রেখে গেছে। ওরা আমায় জোর করে তুলে এনেছে। আমি কি করব বলুন?

বন্দিনীর কথা শুনে রানীমার মনে হল, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। নেশার ঝোঁকে বর্ব্বরগুলো উধোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

রানীমা বন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা থাকা হয় কোথায়?

বন্দিনী উত্তর দিল, আজ্ঞে, আমাদের কি আর কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে, রানীমা। সেই কথায় বলে না, যেখানে রাত সেখানেই কাত। আমাদের হল সেই বেত্তান্ত।

চুপ কর! রাণীমা বন্দিনীকে ধমক দিলেন। তারপর উনি বললেন, যা যা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক ঠিক উত্তর দাও। নইলে ভাগ্যে দুঃখ আছে!

এবারে বল, তোমার বাবার নাম কি?

বন্দিনী জিভ কেটে বলল, এই পোড়া মুখে ও নাম উচ্চারণ করতে বলবেন না, রানীমা। আমি পারব না।

তুমি বাঁচতে চাও না?

তা তো চাই।

তুমি এই মৃত্যু গহ্বর থেকে উদ্ধার পেতে চাও না?

আজ্ঞে, তাও চাই।

তাহলে বল, কাবেরী কোথায়?

কে কাবেরী? আমি তাকে চিনব কেমন করে, রানীমা?

বনতুলসীতে তুমি কবে এসেছ?

আজ্ঞে, গতকাল এসেছি।

কেন এসেছ?

আজ্ঞে, বাবু বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

আজ্ঞে, আমার তাঁকে কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমাকে নাকি তাঁর খুব প্রয়োজন। তাই এসেছি। আসলে আমাদের মতো মেয়েদের তিনি খুব পছন্দ করেন কিনা! তাই ভাবলাম কিছুদিন সঙ্গ দিয়ে যদি ভাগ্যটা একটু ফিরিয়ে নিতে পারি। তা দেখুন না, দেখা তো তার পেলামই না, উল্টে রাত দুপুরে এই বিপত্তি!

বন্দিনীর উত্তর শুনে রানীমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন, অপদার্থগুলো নেশার ঝোঁকে একটা রাস্তার নোংরা মেয়েছেলেকে তুলে এনে গুমঘরে আটকে রেখেছে। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে তিনি রাজাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চললেন।

রানী সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলে রাজাবাবু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বর্ব্বরগুলো গতকাল সন্ধ্যের পরে রাজবাড়িতে হাজিরা দিয়ে যেয়ে গাঁজার আড্ডায় সামিল হয়েছিল। তারপর অধিকরাত্রে ওরা নেশার ঝোঁকে কাবেরীর পরিবর্তে ওই নষ্টা মেয়েটাকে তুলে এনে গুমঘরে আটক করেছে। এই মারাত্মক ভুলের জন্য অবশ্যই ওদের সাজা পেতে হবে। তবে তার আগে আজ রাত্রেই কাবেরী-হরণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে নাকি ওই বুধবারের লগ্নেই ঝামেলাটা চুকিয়ে দেওয়া যায়।

অতএব কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাজাবাবু তৎক্ষণাৎ নায়েবমশাইকে ডেকে পাঠালেন। এবং সবিস্তার আলোচনার পরে তিনি নায়েবমশাইকে কাবেরী-হরণ নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন।

রাজাদেশ পেয়ে নায়েব মশাই একেবারে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাথমিক খোঁজখবর করার জন্য বিশ্বস্ত অনুচর পঞ্চাননকে ফুলমালা বৈষ্ণবীর বাড়িতে পাঠালেন।

পঞ্চানন খোঁজ খবর নিয়ে এসে নায়েব মশাইকে বলল, ফুলমালা বোষ্টমীর বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। তবে বিদিশা বাইজীর গোপালের পূজারী পাঠকমশাইকে দেখলাম একমনে বোষ্টমীর গৃহদেবতার পূজো করছেন। আমি তাঁকে বোষ্টমী এবং কাবেরীর সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নের কোন

্তরই দিলেন না। শুধু একবার তাচ্ছিল্য ভরে আমার দিকে চেয়ে তিনি আবার জায় মন দিলেন।

অন্যদিকে আমাকে যেতে দেখে বোষ্টমীর প্রতিবেশীরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে ্লল। তারাও বোষ্টমী বা কাবেরীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না। আমি যতক্ষণ ানে ছিলাম ততক্ষণ তারা হাবাকালা সেজে যে যার কাজে ব্যস্ত রইল। তাই বাধ্য ্য আমাকে শূন্য হাতেই ফিরে আসতে হল।

পঞ্চাননের কথা শুনে নায়েব মশাই বললেন, তুই তো বেটা শূন্য হাতে ফিরে ্লি। এখন আমি কী করি বল তো? কাবেরীকে কোথায় পাই? তাকে যে আমার প্রয়োজন!

পঞ্চানন বলল, কাবেরীকে যদি পেতে চান তবে ওই পাঠকমশাইকে ফাটকে পুরুন। পূজারী বেটা সব জানেন। গৃহস্থের অবর্তমানে তার বাড়িতে পূজো করছেন অথচ স্থ কোথায় তা তিনি জানেন না, তা কী কখনও হয়?

বেশ। তাহলে যা। আমার নাম করে তুই পাঠক মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমার ডাকে উনি আসবেন না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন। আপনি আমার সঙ্গে জন পেয়াদা দিন। দু'জনে মিলে ওঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে আপনার সামনে লে দিই!

না, না, অতটা বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নাই। একজন পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে তুই ঠকমশাইকে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর দেখি কি করা যায়।

তো সব শুনে পাঠক মশাই বললেন, আমি দক্ষিণা পেয়েছি, পূজো করছি। গৃহকর্ত্রীর ন্স আমার জানা নাই। তবে শুনেছি আগামী বুধবার জনার্দন দাসের সঙ্গে কাবেরীর তাই জনার্দন নিশ্চয়ই ওদের তত্ত্ব-তালাস জানে। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন, য়েবমশাই।

ব্যাপার শুনে জনার্দন দাস একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর সে দতে কাঁদতেই বলল, আমি অতটাকা খরচ করে বিয়ের কেনাকাটা করলাম বাড়ি ড়ি যেয়ে নেমন্তন্ন করে এলাম। এখন কী হবে, নায়েব মশাই?

নায়েবমশাই ধমক দিয়ে বললেন, আহাম্মকের মতো কেঁদে ভাসিও না। যাও, যেখান কে পার কাবেরীকে ধরে নিয়ে এসো। নইলে রাজাবাবু চাবুকে তোমার পিঠের ল ছাড়িয়ে নেবেন।

নায়েবমশাইয়ের ধমক খেয়ে জনার্দন চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শেষে সন্ধ্যের পরে কানাপরান এল রাজবাড়িতে। সব কথা শুনে কানাপরান কিঞ্চি ক্ষুণ্ণ হল। এবং সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, গাঁজার দোষ দেবেন না, নায়েব মশাই। গাঁ খেলে চোখের জ্যোতি বাড়ে, বুকের দম বাড়ে, তাই গাঁজা খাই।

তারপর কানা পরান আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল, ফুলমালা বোষ্টমীর বাড়িতে কাবে ভিন্ন অন্য কোন যুবতী থাকে না। তাই কাল রাতদুপুরে আমরা যাকে তুলে এনে সে কাবেরী না হয়ে যায় না!

নায়েব মশাই কানাপরাণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর সঙ্গে আর কে ছিল?

কানা পরান উত্তর দিল, আজ্ঞে, আরো দু'জন ছিল। একজন উদ্ভট, অন্য আকন্দ।

তোরা তিনজনেই কাল রাতে গাঁজা খেয়েছিলি?

আজ্ঞে, খেয়েছিলাম।

অন্য দু'জন কোথায়?

আজ্ঞে, পাশের ঘরেই আছে।

ডাক তাদের।

কানাপরান পাশের ঘর থেকে উদ্ভট এবং আকন্দকে ডেকে নিয়ে এল।

নায়েব মশাই ওদের তিনজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা তিনজনেই কাবেরী চিনিস তো?

ওরা তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিল, আজ্ঞে, চিনি নায়েব মশাই।

তাহলে তোরা তিনজনেই আমার সঙ্গে গুমঘরে চল। তারপর দেখে বল, মেয়ে কাবেরী কিনা।

অতঃপর ওরা তিনজন নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে গুমঘরে চলল। একজন নৈশ প্রহ লণ্ঠন নিয়ে ওদের সঙ্গে চলল।

ওরা লণ্ঠনের আলোয় গুমঘরে বন্দি মেয়েটিকে দেখল। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ নীচুগলায় তিনজনে কিছু আলোচনা করল। তারপর কানাপরান বলল, পোষা পরিচ্ছদ, সাজ-গোজ সব কাবেরীর মতো। চেহারাটাও কাবেরীর মতোই চটকদা তবে লণ্ঠনের আলোয় বয়সটা যেন একটু বেশি মনে হচ্ছে। তাতে আর কি হয়ে আপনি এর সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিন, নায়েব মশাই। একেবারে ঘর আলো করা পাবে জনার্দন দাস।

কানাপরানের যুক্তি শুনে নায়েব মশাই ক্রুদ্ধ হলেন এবং ধমক দিয়ে বলে চুপ কর আহাম্মক! গাঁজাখোরের মতো কথা বলিস না। এই মেয়েটি কাবেরী ন তাই যেখান থেকে পারিস কাবেরীকে ধরে নিয়ে আয়। নইলে রাজাবাবু তো তিনজনকেই জ্যান্ত কবর দেবেন!

আজ্ঞে, কাল রাত-দুপুরে আমরা একে ফুলমালা বোষ্টমীর বাড়ি থেকে তু এনেছি। আর ফুলমালা বোষ্টমীর বাড়িতে কাবেরী ভিন্ন অন্য কোন মেয়ে থাকে

্বুও আপনি বলছেন এই মেয়েটি কাবেরী নয়। গাংশালিকের গর্তে হাত ঢুকিয়ে য পাখিটাকে আমরা ধরে নিয়ে এলাম, সে পাখিটা গাংশালিক নয়! এ আপনার কমন বিচার হল, নায়েব মশাই?

বিচার করার আমি কে? তোদের বিচার করবেন রাজা প্রতাপ রায় বর্মন। এখুনি বরিয়ে পড়। যেখান থেকে পারিস কাবেরীকে ধরে নিয়ে আয়। অন্যথায় তোরা াণের মায়া ত্যাগ কর।

* * *

এরপর তিনদিন কেটে গেল। রাজা প্রতাপ রায়বমনের গুপ্তচরেরা হন্যে হয়ে তুর্দিকে খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তারা কাবেরীর কোন খোঁজ পেল না। কাবেরী যন কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গেছে। ব্যাপার দেখে নায়েব মশাই হতাশ হলেন। তাশ হলেন স্বয়ং রাজাবাবু। শেষে চতুর্থ দিনে একটা গোপন সংবাদ পাওয়া গেল। ংবাদটা নিয়ে এল ছদ্মবেশী প্রমীলা।

প্রমীলা হল রাজাবাবুর যৌবনের নর্মসহচরী। যৌবন উত্তীর্ণা প্রমীলা এখন বিদিশা াইজীর পরিচারিকা। আসলে সে রাজাবাবুর গোপন সংবাদ সংগ্রাহিকা। কিন্তু সে ানীমার চোখের বালি। আর তাই রানীমার হুকুমে তার রাজবাড়ির ত্রিসীমানায় প্রবেশ ষেধ।

প্রমীলা আজ যৌবন উত্তীর্ণা। কিন্তু তবুও রাজবাড়িতে তার প্রবেশ নিষেধ। এমনিতে স রাজবাড়িতে প্রবেশ করে না। তার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় খন তাকে রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ করতে হয় তাকে গোপন অছিলায় বং ছদ্মবেশে।

প্রমীলা এক বেদেনীর বেশে, একান্তে রাজসমীপে হাজির হল। এবং রাজাবাবুর সম্মুখে দু'হাত পেতে দিয়ে সে বলল, দুহাত ভরে ইনাম দাও, রাজা। জবর খবর এনেছি।

দু'হাত ভরে ইনাম দেব। খবর শোনাও। বললেন রাজাবাবু।

গত রবিবার রাত থেকে বিদিশা বাইজী তার কুঠিতে অনুপস্থিত। বলল ছদ্মবেশী বেদেনী।

যেহেতু বাবু বসন্ত চৌধুরী গত রবিবার রাত থেকে বনতুলসীতে অনুপস্থিত তাই বাইজী তার কুঠিতে অনুপস্থিত। এটা কোন খবরই নয়। বললেন রাজাবাবু।

গত রবিবার রাত থেকে বসন্ত রোগের অছিলায় এক নকল বাইজী স্বেচ্ছা-গৃহবন্দি। মশারীর ঘেরা টোপে স্বেচ্ছা-বন্দি বাইজীর মুখ বাইজী কুঠির পরিচারিকারাও সহজে দেখতে পায় না। বলল বেদেনী।

বাইজী কুঠিতে নকল বাইজী! কে সে? কী তার পরিচয়? জিজ্ঞাসা করলেন রাজাবাবু।

বিদিশার দিদি সোহিনীই সেই নকল বাইজী। দু'বোনের চেহারায় এত মিল সহজে তাদের আলাদা করে চেনা ভার। কিন্তু আমি প্রমীলা দাসী, সোহিনীর প্রতিবেশী। আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। আমি সোহিনীকে চিনতে পেরেছি।

তাহলে বিদিশা কোথায়?

আমার অনুমান ভুল না হলে বিদিশা এখন তোমার গুমঘরে বন্দি।

একী কথা বলছ, বেদেনী! গুমঘরে বন্দি রঙ্গিলাই তাহলে বিদিশা বাইজী! ওই রঙ্গিলা যদি বিদিশা হয় তাহলে কাবেরী কোথায়?

জানি না, রাজা। কাবেরী কোথায় তা আমি জানি না। তবে কাবেরী কোথায় তা যদি জানতে চাও তাহলে ওই শতেক খোয়ারী বাইজীটার পিঠে চাবুক চালাও ওই হারামজাদীর পিঠের চামরা খুলে নাও। ওই নচ্ছার মাগীই কাবেরীকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

অনেক ভাবে জেরা করেও গুমঘরের বন্দিনীর মুখ থেকে কোন কথা বার করা গেল না। তখন রাজ আজ্ঞায় তার 'পরে চাবুক চালানো হল। চাবুকের ঘায়ে তার সারা শরীরে রক্ত ঝরল। শেষে সে যে বিদিশা বাইজী তা সে স্বীকার করে নিল কিন্তু শত অত্যাচারেও তার মুখ থেকে কাবেরীর খবর বার করা গেল না। কাবেরী প্রশ্নে বিদিশা মুখে কুলুপ এঁটে রইল। অতএব অত্যাচারের মাত্রাও উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এবং একসময় অত্যাচারে জর্জরিত বিদিশা বাইজী জ্ঞান হারিয়ে গুমঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও সে কাবেরী কোথায় তা বলল না।

* * *

পঞ্চম দিনে রাজা প্রতাপ রায় বর্মন এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন যে বা যারা কাবেরীর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে সে বা তারা পুরস্কারে ওই হাজার টাকা পাবে।

ঘোষণা শুনে গ্রামের মানুষজন নড়েচড়ে বসল। হাজার টাকা! সে যে অনেক টাকা!

অতএব কাজ ফেলে, বিশ্রাম ভুলে মানুষজন ঘরের বার হল। এবং কারণে অকারণে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হল। যে আলাপচারিতার শেষ কথা হয়ে উঠল কাবেরী। কাবেরী কোথায়? কোথায় কাবেরী? কেউ জানে না কাবেরী কোথায়। সে যেন সোনাঝরা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেছে!

শেষে সপ্তম দিনে ছদ্মবেশী প্রমীলা আবার রাজাবাবুর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করল এবং রাজাবাবুর সম্মুখে দু'হাত পেতে দিয়ে সে বলল, পুরস্কারের হাজার টাকা আমায় দাও, রাজা। আমি তোমায় কাবেরীর সংবাদ দেব।

পুরস্কারের হাজার টাকা তুমি অবশ্যই পাবে। কাবেরীর সঠিক সংবাদ দাও। বললেন রাজাবাবু।

ধীবর পল্লীতে আগে কখনও উষাকালে শ্রীকৃষ্ণের নাম গান শোনা যায়নি। কিন্তু ইদানীং সেই মধুর সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। বলল ছদ্মবেশী বেদেনী।

হেঁয়ালি রাখ, বেদেনী। আসল কথা খুলে বল।

ধীবর দলপতি রসরাজের গোয়াল ঘরে প্রত্যহ উষাকালে ললিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নাম গান হয়। বড়ই মধুর সেই গান। বড়ই মধুর তার সুর। উষাকালের ওই নামগান শ্রবণ সুখকর এবং পবিত্র। ওই নামগান শ্রবণে মানুষেণ মন নিষ্কলুষ হয়। পবিত্র হয়। এবং মানুষের মনস্থিত যাবতীয় গর্হিত-কর্ম-ইচ্ছা দূর হয়ে যায়।

বেদেনীর কথা শুনে রাজাবাবু বিরক্ত হলেন। এবং তিনি বিরক্তির সুরে বললেন, উঃ! চুপ কর বেদেনী, চুপ কর! নামগানের মহিমা কীর্তন শোনার জন্য আমি পুরস্কার ঘোষণা করিনি। আমি কাবেরীর সংবাদ চাই। তুমি আমায় কাবেরীর সংবাদ দাও। আমি তোমায় পুরস্কারের হাজার টাকা দেব। ব্যস্।

পুরস্কার আমি চাই না, রাজা। তোমার নুন খাই। হাত পেতে তোমার তঙ্কা গ্রহণ করি। তাই গর্হিত-কর্ম জেনেও কর্তব্যবোধে তোমাকে আমি কাবেরীর সংবাদ দিতে এসেছি। তবে এই আমার শেষ সংবাদ।

একটু থেমে বেদেনী বলল, জীবনে অনেক গর্হিত-কর্ম করেছি। অনেক নোংরা-আবর্জনা ঘেঁটেছি। তবে আর নয়। এই বয়সে আর নয়। এবারে আমায় তুমি মুক্তি দাও, রাজা।

শোন রাজা। উষাকালের ওই মধুর নামগান আমার মনস্থিত যাবতীয় গর্হিত-কর্ম-ইচ্ছা নির্মূল করেছে। ওই মধুর নাম গান আমায় নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে। আমি ওই পবিত্র পথের পথিক হতে চাই। আর তাই আজ থেকে আমি আমার গুপ্তচর বৃত্তিতে ইস্তফা দিলাম।

একটু থেমে বেদেনী আবার বলল, শোন রাজা। ধীবর দলপতি রসরাজের গোয়ালঘরে প্রতিদিন উষাকালে যিনি মধুর নাম গান করেন তিনি ফুলমালা বৈষ্ণবী। আর তাঁর একমাত্র মুগ্ধ শ্রোতাই হল কন্যা কাবেরী।

* * *

অতঃপর কাবেরীকে বন্দি করতে আর বিলম্ব ঘটল না। সে রাত্রেই জমিদারের একদল অশ্বারোহী মশাল হাতে ধীবর দলপতির গৃহে চড়াও হল। এবং মুহূর্ত মধ্যে তারা কাবেরীর হাতমুখ বেঁধে ফেলল। তারপর তারা কাবেরীকে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়ে নিয়ে দ্রুত উধাও হয়ে গেল। আর উধাও হয়ে যাওয়ার আগে তারা ধীবর দলপতির গোয়ালঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সে আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধীবর দলপতির গৃহ পুড়ল। গৃহ পুড়ল তাঁর প্রতিবেশীদের। পৌষের সেই

হাড় হিম করা নিশীথে গোটা ধীবর পল্লীতে কান্নার রোল উঠল। আর একদিকে কন্যার শোক এবং অন্যদিকে মুহূর্ত মধ্যে অমন এক ভয়াল অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে দেখে আতঙ্কিত ফুলমালা বৈষ্ণবী জ্ঞান হারিয়ে ধীবর দলপতির আঙিনায় লুটিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে আর এক বিপদ ঘটল। রাজাবাবু কুটিশ্বরকে প্রহরীর পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কারণ তার বিরুদ্ধে গোপন তথ্য ফাঁসের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

হঠাৎ চাকরিটা চলে যাওয়ায় কুটিশ্বর মুষড়ে পড়ল। গতরাত্রে রাজরোষে তাদের গৃহ পুড়েছে। আর আজ সকালে রাজরোষে তার চাকরিটা গেল। এবং সেইসঙ্গে চাঁপাকে বিয়ে করার আশাও তার শেষ হয়ে গেল। কারণ কনে পণের একশো এক টাকা জমতে যে তখনও অনেক বাকী!

ধীবর পল্লীর এই দুঃখের দিনে পাশে এসে দাঁড়ালেন চাষাপাড়ার মাথা তসলিম মিঞা। তিনি ধীবর দলপতি রসরাজের বাল্যবন্ধু। তসলিম বললেন, দেখ ভাই রাজরোষ রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে এই দুঃখের দিনে আমরা তোদের সঙ্গে আছি। গোটা চাষাপাড়াব মানুষ তোদের সঙ্গে আছে। আর চিরকাল আমরা তোদের সঙ্গেই থাকব। চিরকাল আমরা পাশাপাশি বাস করব।

শোন ভাই। আমরা তোদের খড় দেব, বাঁশ দেব, শ্রম দেব, সাধ্যমতো কিছু অর্থও দেব। তোরা আবার বসত বানা। আবার উঠে দাঁড়া।

তো দেখতে দেখতে ধীবর পল্লীতে খুশির ছোঁয়া লাগল। সবার মুখে হাসি ফুটল। নতুন বসত গড়ে উঠতে লাগল। সবার ভিটেয় নতুন খুঁটি পোঁতা হল। সবার ঘরে চালে খড় উঠল, টিন উঠল। শুধু কুটিশ্বরের ভিটেয় খুঁটি পোঁতা হল না। তার চালে খড় কিংবা টিন কিছুই উঠল না। কারণ কুটিশ্বরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কুটিশ্বরের বৃদ্ধা মা পোড়া ভিটের সম্মুখে মলিন মুখে বসে রইলেন।

খবর পেয়ে ধীবর দলপতি রসরাজ চাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে কুটিশ্বরের পোড়া ভিটে ছুটে এলেন। এবং তিনি কুটিশ্বরের মাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না, দিদি। কুটিশ্বরকে খুঁজে আনতে আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি। আর আমার লোকদের আমি বলছি এখনই তোমার ভিটেয় খুঁটি পুঁততে। তোমার চালে খড় তুলতে। যাতে করে গোটা ধীবর পল্লীর নতুন বসত একই সঙ্গে গড়ে ওঠে।

.তারপর তিনি বললেন, বিনা দোষে জমিদারবাবু কুটিশ্বরকে বরখাস্ত করেছেন তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আমি কুটিশ্বরকে মাছ ধরার জাল দেব, নাও দেব। মালোর ছেলের হাতে, জাল থাকতে আর নাও থাকতে তার কখনও ভাতের অভাব হয় না।

তারপর তিনি আবার বললেন, চাঁপা আর কুটিশ্বর দু'জনে শৈশবের সাথী। আমি ওদের সাথীহারা করব না। আগামী মাঘ মাসেই আমি ওদের দু'জনের বিয়ে দেব। প্রথা মেনে মাত্র একটাকা কনে পণ নিয়েই চাঁপাকে আমি কুটিশ্বরের হাতে তুলে দেব। এই আমি তোমায় কথা দিলাম, দিদি।

চাঁপা এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সবকথা শুনছিল। এবারে সে বলল, বাবা, আমি জানি কুটিশ্বর কোথায় আছে। আমি ডিঙি নিয়ে ওকে আনতে যাচ্ছি। তুমি এদিকটা দেখ।

তারপর চাঁপা কুটিশ্বরের মাকে বলল, তুমি চিন্তা কোরো না, পিসি। ধীবর পল্লীর সবাই একসঙ্গে গৃহপ্রবেশ করবে। আমি এখনই কুটিশ্বরকে আনতে যাচ্ছি।

ও কোথায় আছে রে, চাঁপা? তুই একা যাবি ওকে আনতে? জিজ্ঞাসা করলেন কুটিশ্বরের মা।

হ্যাঁ পিসি, আমি একাই যাচ্ছি ওকে আনতে। আমি জানি ও কোথায় আছে। নির্জন পশ্চিম-বাঁকে ওকে পাওয়া যাবে। ওটাই ওর সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। সময় পেলেই ও ওখানে চলে যায়। তারপর নদী বাঁক সংলগ্ন এক বকুল গাছের নীচে বসেও আপন মনে বাঁশী বাজায়।

তারপর চাঁপা ফুলমালা বৈষ্ণবীর কাছে যেয়ে বলল, তুমি কান্না থামাও, মাসি। চোখের জলে কাবেরীকে ফিরে পাওয়া যাবে না। ওকে উদ্ধার করতে হবে। অত্যাচারী জমিদারের হাত থেকে ওকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করতে হবে।

একটু থেমে চাঁপা বলল, আজ সকালেই আমি লোক মারফত পলাশের খত পেয়েছি। পলাশ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আগামী কালই ও ওর মামার সঙ্গে বনতুলসীতে ফিরে আসছে। এদিকে অত্যাচারী জমিদার কাবেরীকে অপহরণ করেছেন শুনে পলাশের বন্ধু-বান্ধবরা রাগে ফুঁসছে। ওরা পলাশের ফিরে-আসার অপেক্ষায় রয়েছে। পলাশ ফিরে এলেই জমিদারের হাত থেকে কাবেরীকে উদ্ধার করা হবে। এনিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। চোখের জল ফেলো না।

একটু থেমে চাঁপা আবার বলল, বাবু বসন্ত চৌধুরীর পেয়ারের বাইজী বিদিশাকেও জমিদার তাঁর গুমঘরে বন্দি করে রেখেছেন। তার 'পরে চাবুক চালানো হয়েছে। চাবুকের ঘায়ে তার শরীরের রক্ত ঝরানো হয়েছে। তাই বসন্ত বাবুও ওই অত্যাচারী জমিদারকে সহজে ছাড়বেন না।

মাসি, দেখেশুনে মনে হচ্ছে একটা লড়াই বাঁধবে। বাপ-বেটা, শালা-ভগ্নীপতির লড়াই। জানি না সেই লড়াইয়ের পরিণতি কি হবে!

চাঁপার অনুমান মিথ্যা হল না। সে দূর থেকেই কুটিশ্বরের বিষাদ বাঁশীর অস্পষ্ট সুর শুনতে পেল। সে ডিঙি বেয়ে পশ্চিম-নদী-বাঁকের দিকে এগিয়ে চলল। বাঁশীর সুর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। খানিকবাদে সে বাঁকের নির্জন চরে ডিঙি ভেড়াল।

কুটিশ্বর জানত চাঁপা আসবে। তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবে। কিন্তু তার পক্ষে আর ঘরে ফেরা সম্ভব নয়। আর তার ঘরই বা কোথায়? জমিদারের রোষানলে তার ঘর গেছে, চাকরি গেছে। আর সেই সঙ্গে তার শৈশবের সাথী চাঁপাকে

আপন করে পাওয়ার আশাও শেষ হয়ে গেছে। এখন তার বিবাগী হওয়া ছাড়া উ
নাই!

চাঁপাকে ডিঙি থেকে নেমে আসতে দেখে কুটিশ্বর বলল, কেন এলি রে, চাঁপা
আমার মতো এক চালচুলোহীন পুরুষের কাছে ছুটে আসা তোর মানায় না। যে
তোর উচিত মূল্য চুকিয়ে দিয়ে তোকে ঘরে তুলতে পারবে তুই তার কাছে যা

চাঁপা বলল, তা কেন! নাইবা থাকল তোমার ঘরবাড়ি। নাইবা থাকল
টাকা কড়ি। তুমি পুরুষ। তোমার পৌরুষ দিয়ে আমায় তুমি জয় কর। তুমি
না, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

তারপর চাঁপা বলল, এক কাজ কর। আমায় তুমি অপহরণ কর। তোমার
কাঁধের গামছা দিয়ে তুমি আমার মুখ বাঁধ। ওই ডিঙি বাঁধার দড়ি দিয়ে তুমি
হাত দু'খানা বাঁধ। আমি চুপটি করে এই ডিঙিতে বসে থাকি। তুমি ডিঙি ভাসাং
আমায় নিয়ে কোন এক অচিন দেশে পাড়ি জমাও। তারপর আমায় তুমি গান্ধর্ব
বিয়ে কর। আমরা দুজনে ঘর বাঁধি। আমরা আমাদের প্রেমকে সফল করে তুলি
আমরা আমাদের চাওয়া-পাওয়াকে সার্থক করে তুলি। আমার জন্য তুমি এটুকু করা
পারবে না?

কুটিশ্বর বলল, তা যে হওয়ার নয় রে, চাঁপা। আমরা যদি একজোড়া মুক্ত বিহ
হতাম, উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে দিতাম। কোন এক অচিন দেশে পাড়ি জমাতা
দু'জনে মিলে কোন এক নির্জন অরণ্য শাখে এক ছোট্ট নীড় বাঁধতাম। প্রেমে কা
আমরা আমদের সেই নীড়কে এক স্বতন্ত্র স্বর্গে পরিণত করতাম।

কিন্তু হায়! তা যে হওয়ার নয়। আমরা সমাজবদ্ধ মানুষ। আর তাই শত দুঃখে
আমরা আমাদের সমাজকে আঁকড়ে ধরে থাকি। সমাজকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচি। আব
সমাজকে আঁকড়ে ধরেই মরি।

চাঁপা বলল, হে যুবক, তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ। তাই তুমি অমন কথা বল
বেশ। তুমি যদি সমাজকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাও তবে তুমি আমার নি
আত্মসমর্পণ কর। আমাকে অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সমাজ-সংসারে থিতু হওয়
উত্তম দিশা দেব। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার প্রশস্ত পথ দেখাব। তোমার স্ত্রী
পরিবার লাভের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে তোমাকে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য কর
আর এত সখের বিনিময়ে আমাকে তুমি শুধু একটু ভালবাসা দিও। শুধু এ
ভালবাসা।

চাঁপার কথা শুনে কুটিশ্বর স্মিতমুখে উঠে এল। এবং আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে চাঁ
দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, হে বীর্যবতী নারী, আমি তোমার নিকট নিঃ
আত্মসমর্পণ করলাম। আমায় তুমি গ্রহণ কর।

কুটিশ্বরের কথা শুনে চাঁপা দু'পা এগিয়ে এল। তারপর সাগ্রহে সে কুটিশ্বে

হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরল। আরো একটু সরে এসে সে কুটিশ্বরের প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল। পরম নির্ভরতার আনন্দে তার চোখ দুটি বুজে এল।

*  *  *

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, বিদিশা এবং কাবেরী যে জমিদারের গুমঘরে বন্দি, চাঁপার চিঠির মারফত সে সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম। আবার পলাশ যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং ওর মামার সঙ্গে কলকাতা থেকে বনতুলসীতে ফিরে আসছে, চাঁপার পরবর্তী চিঠিতে আমি তাও জেনেছিলাম। অতঃপর বসন্তবাবু, পলাশ এবং চাঁপার ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিন বিকালে আমি বনতুলসীতে যেয়ে হাজির হলাম। তারপর গভীর রাত্রে আমি হাজির হলাম ওঁদের গুপ্ত সমাবেশে।

আলাপ-আলোচনায় যে কাজ হবে না, বসন্তবাবু তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। বুঝেছিল তা পলাশও। আবার সম্মুখ সমরে যে রাজা প্রতাপ রায় বর্মনের পোড়-খাওয়া লড়িয়েদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না, তা বুঝতেও কারো অসুবিধা হয় নি।

সুতরাং সেদিনকার সেই গভীর রাত্রের গুপ্ত সমাবেশে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আগামী কাল দুপুররাত্রে আমরা অতর্কিতে গুমঘরে হানা দেব। অবশ্যই সশস্ত্র হানা। এবং ব্যাপারটা জমিদারের নৈশ প্রহরী আর লড়িয়েদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠার আগেই আমরা কাবেরী এবং বিদিশাকে গুমঘর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে বড়গাঙের বুকে বজরা ভাসিয়ে দেব। আমরা কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে যাব। আর আমাদের ওই বজরাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বজরার চারপাশে অন্ততপক্ষে বিশখানা সশস্ত্র লড়িয়ের ছিপ চক্রব্যূহ রচনা করে এগিয়ে যাবে। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে অতর্কিত হানার শুরু থেকে বড়গাঙের বুকে বজরা ভাসানোর সময় কাল কিছুতেই আধঘণ্টার বেশি হবে না।

আমি ভাল লাঠি খেলতে জানতাম। একা দশজন লেঠেলের মহড়া নিতে পারতাম। আমার তীর ধনুকের হাতও মন্দ ছিল না। আবার রতন কাকার কাছে আমি বন্দুক চালাতেও শিখেছিলাম। কাকার সঙ্গে গাছের ডালে বাঁধা মাচায় বসে আমি নরখাদক বাঘ মেরেছি। তবে ওই টঙে চড়ে বন্দুক তাক করে বাঘ মারা আ'র লড়াইয়ের ময়দানে বন্দুক তাক করে শত্রু মারা যে এক নয় তাও আমি জানতাম। জানতাম, বন্যপশুর হাতে বন্দুক থাকে না কিন্তু প্রতিপক্ষ শত্রুর হাতে থাকে। কিন্তু সেদিনকার সেই গভীর রাত্রের গুপ্ত সমাবেশে আমাকে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে বলা হল। আমার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে পরদিন দুপুর রাত্রে আমাকে ঘোড়ায় চড়ে, বন্দুক হাতে নিয়ে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হতে বলা হল।

আমি শুনেছিলাম, পলাশ এবং বসন্তবাবুর একদল সখের লড়িয়ে আছে, যাদেরকে মানুষ ভয় পায়। যাদের থেকে মানুষ দূরে সরে থাকে। ব্যাপারটা আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেদিন সেই দুপুররাত্রে সখের লড়িয়েদের সঙ্গে জমিদারের গুমঘরে অতর্কিতে হানা দিতে যেয়ে ব্যাপারটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারলাম।

আমি বুঝতে পারলাম, কেন মানুষ ওইসব সখের লড়িয়েদের ভয় পায়। আমি বুঝতে পারলাম, কেন মানুষ ওইসব সখের লড়িয়েদের থেকে দূরে সরে থাকে।

বসন্তবাবু এবং পলাশ কলকাতা থেকে ফিরে এলে যে একটা গণ্ডগোল বাঁধতে পারে, জমিদারবাবুর মনে তেমনই একটা আশঙ্কা ছিল। আর তাই তিনি আগে ভাগেই কিছু লাঠিয়াল, তীরন্দাজ, শড়কী বাজ এবং বন্দুকবাজকে এনে রাজবাড়িতে একত্রিত করেছিলেন। ওইসব লড়িয়েদের স্থান হয়েছিল জমিদারের সিপাইবাড়ি এবং লেঠেল ছাউনিতে।

তো পূর্বরাত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন দুপুররাত্রে আমরা জমিদারের গুমঘরে হানা দিতে চললাম। উদ্দেশ্য, পলাশের প্রেয়সী কাবেরী এবং বসন্তবাবুর পেয়ারের বাইজী বিদিশাকে গুমঘর থেকে উদ্ধার করা।

আমাদের সখের লড়িয়েরা অতর্কিত হানার শুরুতেই জমিদারের নৈশপ্রহরী এবং বিশ্রামরত লড়িয়েদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল। বে-পরোয়া তীর ছুড়তে লাগল। বে-ফায়দা সড়কী নিক্ষেপ করতে লাগল। এবং প্রতিবারেই ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে লাগল। আমাদের সখের লড়িয়েরা জমিদারের যেসব নৈশপ্রহরী এবং লড়িয়েদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল, তীর ছুড়ল, সড়কী নিক্ষেপ করল তারা প্রাণে বেঁচে গেল। কিন্তু ওদের ওই লক্ষ্যহীন অতর্কিত আক্রমণে জমিদারের কিছু আতঙ্কিত এবং অসতর্ক নৈশপ্রহরী এবং লড়িয়ের প্রাণ গেল। কিছু আহত হল। ফলে সখের লড়িয়েরা বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েও জমিদারের নৈশপ্রহরী এবং লড়িয়েদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করতে সক্ষম হল। সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিযুদ্ধের সময়টুকু পর্যন্ত না পাওয়ায় তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

সখের লড়িয়েদের অতর্কিত আক্রমণে জমিদারের কিছু নৈশপ্রহরী এবং লড়িয়ের প্রাণ যেতেই বাকীরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি, ছুটোছুটি-দৌড়োদৌড়ি, আহতদের করুণ আর্তনাদ আর অবিশ্রান্ত গুলির আওয়াজে সেই নিশীথরাত্রে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল। আর চোখের সামনে আমাদের সখের লড়িয়েদের অমন অভূতপূর্ব কেরামতি দেখে আমি নিজে আক্রমণ হতে নিবৃত্ত হলাম।

আমাদের সখের বন্দুক বাজরা ফলাফলের কথা চিন্তা না করে প্রথম থেকেই এলোপাতাড়ি গুলি বৃষ্টি করে গেল। এবং তাতেই বিষময় ফল ফলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমিদারের বারুদঘরে আগুন লেগে গেল। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের সঙ্গে চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের সঙ্গে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঊর্ধ্বমুখী হল। আর ছড়িয়ে-পড়া আগুনে জমিদারের অস্ত্রাগার, সিপাইবাড়ি, লেঠেল ছাউনি, সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। ভয়াবহ আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে চতুর্দিক ছেয়ে গেল। এমনকি গুমঘরে প্রবেশের পথটুকু পর্যন্ত অগম্য হয়ে উঠল। সেই নিশীথরাত্রে আমাদের নির্বোধ বন্দুক বাজরা একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছাড়ল!

অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে দেখে আমি প্রমাদ গুনলাম। এবং সময় নষ্ট না করে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুমঘরের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্যদিক থেকে পলাশ এবং ওর দু'জন লড়িয়ে বন্ধু এগিয়ে এল। ওরা তিনজন আমাকে অনুসরণ করল। এবং আমরা চারজন অতিদ্রুত গুমঘরের প্রবেশ পথের কাছাকাছি যেয়ে পৌঁছলাম। আর তারপর কাছাকাছি হতেই আমরা দেখতে পেলাম, গুমঘরের লৌহদ্বার খোলা। মনে হল, অমন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে গুমঘরের প্রহরীরা লৌহদ্বার খুলে দিয়ে আপনাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

আমরা চারজন আগুন আর ধোঁয়াকে অগ্রাহ্য করে গুমঘরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। উপরে তখনও বারুদঘরে মাঝে মাঝেই বিস্ফোরণ হচ্ছে। ভয়াবহ আগুনে আশপাশের গাছপালা পুড়ছে। চটপট চটপট আওয়াজ উঠছে। বায়ুর গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রলয়ঙ্কর আগুন অতিদ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

গুমঘরের ভেতরে একটা টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছিল। আর বাইরের কিছু কালো ধোঁয়া ততক্ষণে অনুপ্রবেশকারীর মতো গুমঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তারপর হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো আর সেই অনুপ্রবেশকারী কালো ধোঁয়া মিলেমিশে গুমঘরের ভেতরে একটা ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সেই ভুতুড়ে পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না। কোন জীবন্ত প্রাণীর সাড়াশব্দ পর্যন্ত পেলাম না। তখন আমরা ডাক ছাড়লাম, 'কাবেরী তুমি কোথায়, সাড়া দাও। বিদিশা বাঈ তুমি কোথায়, সাড়া দাও। আমরা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।'

কিন্তু আমাদের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। আমাদের কাছে কেউ এগিয়ে এল না। তখন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে আমরা চারজন অপ্রাকৃতজনের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে গভীর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি অন্ধকার ঘরের এককোণে একজন মহিলার স্পর্শ পেলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তার একখানা হাত চেপে ধরলাম। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কে তুমি?

কিন্তু ওই মহিলা আমার প্রশ্নের কোন উত্তরতো দিলই না, উপরন্তু সে আমার হাতে একটা মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিয়ে, খিল খিল করে হাসতে হাসতে গভীরতর অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল। অন্ধকারে মিশে গেল।

সেই নিশীথরাত্রে পাতালপুরীর অন্ধকার ঘরের এককোণে আচমকা অমন উন্মাদবৎ খিল খিল হাসির শব্দ শুনে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

একটু পরে পলাশের পায়ে অন্য একজন মহিলার দেহ ঠেকল। ওই মহিলা গুমঘরের মেঝেয় শুয়েছিল। একটু ঝুঁকে পলাশ তাকে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

সেই মহিলাও কোন উত্তর দিল না। সে যেমনভাবে শুয়েছিল তেমনভাবেই শুয়ে রইল। তখন পলাশ তাকে মেঝে থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে টিমটিমে আলোর দিকে এগিয়ে গেল। এবং সে অচিরেই বুঝতে পারল, তার বাহুদ্বয়ে আশ্রিতা মহিলা অচৈতন্য। এবং সে কাবেরী।

পাতালপুরীর গা-ছমছম করা পরিবেশ আর বদবুতে পরিপূর্ণ গুমঘরে আমরা আরও কিছুক্ষণ বিদিশা বাঈকে খুঁজলাম। তার নাম ধরে বারবার ডাকলাম। এখনই গুমঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে যে আমরা সকলেই আগুনে পুড়ে মারাযাব, চিৎকার করে আমরা সে কথাও বললাম। কিন্তু তবুও আমাদের ডাকে বিদিশাবাঈ সাড়া দিল না। আমাদের কাছে সে এগিয়ে এল না।

উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম, গুমঘরের উন্মুক্ত দ্বারে তখন ক্রুদ্ধ অগ্নির লোলজিহ্বা বার বার ছোবল মারছে। মনে হল, সবকিছু বিনাশ করার পর এবারে সে আমাদের খোঁজ করছে। এবারে সে আমাদের বিনাশ করতে চাইছে।

বৃথা সময় নষ্ট করা সমীচিন হবে না বুঝে আমরা সকলে গুমঘরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। তারপর ক্রুদ্ধ অগ্নির লোলজিহ্বা থেকে যথাসম্ভব নিজেদের বাঁচিয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে এসে দাঁড়ালাম। আমরা বুকভরে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করলাম। পলাশের বাহুদ্বয়ে আশ্রিতা কাবেরী তখনও অচৈতন্য।

ক্ষণিকের তরে আমরা চারদিকের ধ্বংসলীলার দিকে চাইলাম। দেখলাম, বারুদঘর, অস্ত্রাগার, সিপাইবাড়ি, লেঠেল ছাউনি এবং সন্নিহিত বৃক্ষসকল জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তখনও আগুন জ্বলছে। আর তারই মাঝে পড়ে রয়েছে কিছু হতভাগ্য মানুষের ঝলসানো লাশ।

বুঝলাম, ওই হতভাগ্য মানুষগুলো এখন আর বন্দুকবাজ বা লাঠিয়াল নয়। ওরা সড়কীবাজ বা তীরন্দাজও নয়। ওরা এখন নেহাৎই কতকগুলো ঝলসানো লাশ।

বুঝলাম, এখন আর ওদের আলাদা কোন পরিচয় নেই। এখন আর ওদের আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। এখন ওরা কতকগুলো ঝলসানো লাশ মাত্র। এখন ওরা বীভৎস লড়াইয়ের পরিণতি মাত্র।

চোখের সামনে অমন নারকীয় দৃশ্য দেখে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আর ঠিক তখনই বিপক্ষের দু'তিনটি বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল। আমরা চমকে উঠলাম। মনে হল, জমিদারের লড়িয়েরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। তারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে।

আমরা ছুটতে লাগলাম। আমরা বড়গাঙের দিকে ছুটে চললাম। যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে সুসজ্জিত বজরা। আর সেই সুসজ্জিত বজরাকে ঘিরে রেখেছে বিশখানা সশস্ত্র লড়িয়ের ছিপ।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হঠাৎই এক অঘটন ঘটে গেল। আমরা কিছুদুর এগিয়ে যেতেই বিপক্ষের ছোড়া একটি বন্দুকের গুলি ছুটে এসে আমার পিঠে বিঁধল। আমি পড়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পলাশের দু'জন বন্ধু আমার কাছে ছুটে এল। এবং চোখের পলকে ওরা আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। জলা, জঙ্গল, চষা-ক্ষেত, বালিয়াড়ি, কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ওরা আমাকে কাঁধে নিয়ে ছুটে চলল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাকে কাঁধে নিয়ে বজরায় পৌঁছল।

ওরা আমাকে বজরায় ভেতরে নিয়ে যেয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমার ব্যথা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। পিঠের ব্যথা হু হু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তখনও আমার পুরোপুরি জ্ঞান ছিল।

অচৈতন্য কাবেরীকেও বজরার মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পলাশ ওর একখানা হাত ধরে বিছানার পাশে বসেছিল। ওর চোখেমুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই ওর জ্ঞান ফিরে এল।

জ্ঞান ফিরে আসতেই কাবেরী পলাশকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়?

পলাশ উত্তর দিল, তুমি এখন আমাদের বজরায়।

কাবেরী ঃ বজরা করে আমরা কোথায় চলেছি?

পলাশ ঃ কলকাতায়।

আমার মা, বাবা, ওঁরা কোথায়?

তোমার মা তোমাদের বাড়িতে আছেন। তোমার বাবা বাইরে থেকে এখনও ঘরে ফেরেননি। তোমার মাকে আনতে আমরা লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু উনি আসেননি। উনি বলেছেন, তোমার বাবা ঘরে না-ফেরা পর্যন্ত উনি কোথও যাবেন না।

কাবেরী বিছানা থেকে উঠে বসল। তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও পলাশকে জিজ্ঞাসা করল, উনিকে? উনি কি অসুস্থ?

উনি তোমার পিতৃব্য। হুতোমপুরের দীপক রায়। তোমাকে গুম ঘর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় বিপক্ষের ছোড়া গুলিতে উনি জখম হয়েছেন। ওঁর চিকিৎসা চলছে।

আমি ওঁকে চিনি। দেখো, ওঁর চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়।

একটু থেমে কাবেরী পলাশকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমার বিদিশা দিদি কোথায়? উনি সুস্থ আছেন তো?

ওঁর সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ জানি না, কাবেরী। অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে আমরা গুম ঘর থেকে উদ্ধার করতে পারিনি। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখ জনক!

আমাকে বাঁচানোর জন্যই দিদির এই আত্মত্যাগ। এমন মানুষকেও আমি একসময় ভুল বুঝেছিলাম। আমার খুব খারাপ লাগছে গো!

বজরা বড়গাঙের বুকে ভেসে চলেছিল। বিশখানা সশস্ত্র লড়িয়ের ছিপ বজরাকে ঘিরে এগিয়ে চলেছিল। বাবু বসন্ত চৌধুরী এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বজরার মধ্যে বসেছিলেন। বিদিশার কথা উঠতেই উনি পলাশকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ভাগ্নে, গুমঘর, বারুদঘর, অস্ত্রাগার এবং আশপাশেণ সবকিছুই কি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে? বিদিশার জীবনের কি কোন আশাই নেই?

পলাশ শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দিল, মামা, জমিদার প্রতাপ রায় বর্মনের অহঙ্কারের প্রতীক বারুদঘর, অস্ত্রাগার, সিপাই বাড়ি, লেঠেল ছাউনি এবং আশপাশের সমস্ত কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তবে রাজপ্রাসাদ এমনও অক্ষত আছে। তবুও বিপদের

আশঙ্কায় রাজাবাবু প্রাসাদ ফাঁকা করে দিয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে গুপ্তপথে কোন এক অজানা স্থানে চলে গেছেন।

আর আমরা যতক্ষন ওখানে ছিলাম, পাতালপুরীর গুমঘরে আগুন পৌঁছোয় নি তবে ক্রুদ্ধ অগ্নির লোলজিহ্বা যেভাবে গুমঘরের খোলা দরজায় ছোবল মারছিল তাতে বিদিশা বাঈ-এর জীবনের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে অত্যাচারী জমিদারের নৃশংস পীড়নে বন্দি বাঈ-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। ওঁর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে সে অবস্থায়—।

পলাশের কথা শুনে কাবেরী আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। তারপর ও ভারী গলায় পলাশকে জিজ্ঞাসা করল, আর আমাদের বিলাস, মা-মরা ছেলেটা, তার খবর কী?

বিলাস ভাল আছে। রাজপরিবারের সঙ্গে সে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে।

আমার সই চাঁপা আর ওর হবু বর কুটিশ্বরের খবর কি? ওরা ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, ওরা ভাল আছে। বজরা ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে ওরা দু'জন ঘাটে এসেছিল তুমি তখন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলে।

কাবেরী পলাশকে লড়াইয়ের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছিল। পলাশ উত্তর দিচ্ছিল।

আমার সারা শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। অমন কনকনে শীতেও আমার সারা শরীর ঘেমে উঠেছিল। বজরার মধ্যে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখলাম, আমার পাশে পলাশের দু'জন লড়িয়ে-বন্ধু বসে রয়েছে। ওরা লড়াইয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। আমি ওদের বললাম, দেখ, এখানে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তোমরা আমাকে বজরায় বাইরে নিয়ে চল ওখানে আমি বুক ভরে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে পারব।

আমার কথা শুনে ওরা দু'জন আমাকে ধরাধরি করে বজরার বাইরে নিয়ে গেল তারপর ওরা আমাকে ধরাধরি করে বজরার ছাদের উপরে শুইয়ে দিল।

আমার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি চোখ বুজে বজরার ছাদে শুয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে সময় কেটে যাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে আমার বোধশক্তি লোপ পাচ্ছিল।

জানি না এইভাবে আমি কতক্ষণ শুয়েছিলাম। জানি না এইভাবে কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে আমি চোখ মেলে চাইলাম। কিন্তু আশপাশে আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। শুনতে পেলাম একজন নারীকণ্ঠের কথা। সে আমায় বলছে, এই যে সখা, এদিকে। আমি এখানে।

নারীকণ্ঠ অনুসরণ করে আমি আকাশের দিকে চাইলাম। এবং দেখলাম, হাল্কা মেঘের মাঝে শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা একজন সুন্দরী যুবতী আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি? অমন হাসছ কেন?

সেই সুন্দরী বলল, সে কী সখা, আমায় তুমি চিনতে পারলে না! আমি তোমার সখী। তোমার কৃষ্ণা গো, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা! কোন কৃষ্ণা?

আমি সেই রটন্তী অপেরার কৃষ্ণা গো! এর মধ্যেই আমায় তুমি ভুলে গেছ?

রটন্তী অপেরার কৃষ্ণা! সে তো কবেই মারা গেছে!

না গো সখা, আমি মরিনি। এই দেখছ না, আমি বেঁচে আছি।

তুমি বেঁচে আছ? তুমি মরনি?

না, আমি মবিনি। আমি বেঁচে আছি।

কি জানি! তোমার সব কথা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। কেমন যেন হেঁয়ালি মনে হয়।

একটু থেমে কৃষ্ণা বলল, আচ্ছা, তুমি শোননি, দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। কারণ, দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। আমার দেহের বিনাশ হয়েছে কিন্তু আমার আত্মার বিনাশ হয়নি। আর তাই আমি বেঁচে আছি। আমি মরেও বেঁচে আছি।

তুমি বলছ, তুমি মরেও বেঁচে আছ। এ আবার কেমন কথা! আবার যখন তুমি সত্যিই বেঁচে ছিলে তখন তুমি বলতে, সুষুপ্তিকালে তুমি নাকি এক স্বপ্নের দেশে পাড়ি জমাও। সে দেশের এক রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরে তুমি আকৃষ্ট হও। তার বাঁশীর সুরে তুমি নাচ। তাকে তুমি ভালওবাস। এসব হেঁয়ালি নয়?

আমার কথা শুনে কৃষ্ণা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। তারপর ও বলল, সব ভালবাসা এক হয় না। ওই রাখাল ছেলের প্রতি আমার যে ভালবাসা, আর তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তা এক নয়। আচ্ছা, এসব তুমি বুঝতে পার না? নাকি এসব তুমি বুঝতে চাও না?

কথা ক'টি বলে কৃষ্ণা চুপ করে রইল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আজও কি তুমি সেই স্বপ্নের দেশে ডানা মেল? আজও কি তুমি সেই রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরে নাচ?

কৃষ্ণা বলল, না, এখন আর আমাকে সেই স্বপ্নের দেশে ডানা মেলতে হয় না। আমি যেখানে থাকি তার অদূরেই অমন একটা স্বপ্নের দেশ আছে। আসলে আমার মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ওখানে আমি অমনই একটা স্বপ্নের দেশ গড়ে নিয়েছি। সেখানে সেই রাখাল ছেলেটা আছে। ওর গরুগুলোও আছে। ওর গরুগুলো যখন মাঠে চরে বেড়ায় আগের মতোই ও তখন গাছতলায় বসে বাঁশী বাজায়। ওর বাঁশীর সুর আজও আমাকে আকুল করে। ওর বাঁশীর সুরে আজও আমি নাচি।

একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বলল, আসলে আমি ওই রাখাল ছেলেটাকে ভালবাসি

না গো। আমি ভালোবাসি ওর বাঁশীর সুর। ও নয়, আমাকে আকুল করে ওর বাঁশীর সুর। আজও।

হঠাৎ আমার পিঠের যন্ত্রণাটা চাগাড় দেওয়ায় আমি ককিয়ে উঠলাম। আমি কৃষ্ণাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে! অসহ্য যন্ত্রণা!

কৃষ্ণা বলল, ওটা তোমার দেহের যন্ত্রণা। অমন অসহ্য দেহের যন্ত্রণায় একদিন আমিও ভুগেছি। তবে ওটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওটা ক্ষণিকের। অমন অসহ্য দেহের যন্ত্রণা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যন্ত্রণাহীন জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়। আমি তাই পেয়েছি।

দেখ, তোমার ওইসব এলোমেলো কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি মরে যেয়েও বেঁচে আছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি যন্ত্রণাহীন জীবনের স্বাদ পেয়েছ। এসব কেমন কথা?

হ্যাঁ, আমি মরে যেয়েও বেঁচে আমি। আমি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যন্ত্রণাহীন জীবনের স্বাদ পেয়েছি। কারণ, আমি দেহ নই। আমি মন নই। আমি বুদ্ধি নই। আমি ইন্দ্রিয় নিচয় নই। আমি আত্মা। আমার জন্ম নেই। আমার মৃত্যু নেই। আমি জন্ম মৃত্যু রহিত শাশ্বত সনাতন আত্মা।

দূর! ওসব তো তুমি সূর্যকান্ত দাসের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছ। ওসব আমি শুনতে চাই না।

কে বলেছে এসব শেখানো বুলি? এ তত্ত্বকথা। এ সত্য কথা। এ শাশ্বত কথা

থাক, থাক। বললাম তো, ওসব আমি শুনতে চাই না।

কৃষ্ণা স্মিত হাস্যে আমার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, তাহলে থাক।

কৃষ্ণা চুপ করতেই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ তোমাকে বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার বল তো?

কৃষ্ণা বলল, বাঃ! আজ যে খুশির দিন! আনন্দের দিন! এই দিনটির জন্য আমি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে প্রতীক্ষা করে রয়েছি। আর আজ আমার সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আমি দেখতে পেলাম আমার ষোড়শী সুন্দরী কন্যা কাবেরী দয়িতসাথে শুভযাত্রা করেছে। বুক ভরা আশা নিয়ে ও নতুন ঘর বাঁধতে চলেছে। ওদের তুমি আশীর্বাদ কর গো। ওরা যেন সুখী হয়। ওরা যেন শান্তি পায়।

আমি ওদের আশীর্বাদ করছি, কৃষ্ণা। ওরা সুখী হবে। ওরা শান্তি পাবে।

একটু থেমে আমি বললাম, আর পারছি না, কৃষ্ণা। বড্ড যন্ত্রণা!

কিন্তু কৃষ্ণা কোন কথা বলল না। ও মলিন মুখে আমার পানে চেয়ে রইল।

আমি চোখ বুজলাম। আমি গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ামার বোধশক্তি লোপ পেতে লাগল।

এই পর্যন্ত বলে আগন্তুক চুপ করলেন। তখন পাশ থেকে পটসুন্দর বলে উঠল, তঃপর তুমি জ্ঞান হারিয়ে বজরার ছইয়ের উপরে পড়ে রইলে। আর তা দেখে ামার কিশোর বেলার প্রেমিকা কৃষ্ণা মেঘের আড়াল হতে কান্না ভেজা চোখে তোমার নে চেয়ে রইল। তারপর পরদিন ভোরবেলায় তোমার জ্ঞান ফিরে এল। সেরে ঠতে আরও কিছুদিন লেগে গেল। এই তো?

তা ও গল্প এখন থাক। মাঝ রাত গড়িয়ে গেছে। এবারে তুমি তোমার ভূতের ল্পটা শুনিয়ে দাও। আমরা বাড়ি ফিরি।

রহিম বলল, হ্যাঁ, নতুন খুড়ো, বাকীটুকু থাক। আর রাজপুত্তুর যখন রাজকন্যেকে দ্ধার করে নিয়ে গহিন দরিয়ায় নাও ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন ধরেই নেওয়া যায় মধুর মিলন শেষে কিস্‌সাটাও শেষ হয়ে গেছে।

রামলোচন খুড়ো বললেন, হ্যাঁ ভায়া, ভূতের গল্পের সঙ্গে তুমি আমাদের কিছু নুষের কথাও শোনাতে চেয়েছিলে। তা এতক্ষণ তোমার মুখ থেকে আমরা কিছু নুষের কথা শুনলাম। এবারে তুমি তোমার ভূতের গল্পটা শুনিয়ে দাও। ওদের তাড়া াছে। ওরা বাড়ি ফিরুক। বাড়িতে বৌমারা সব একা রয়েছে।

পর্ব সমাপ্ত।

তখন আগন্তুক বললেন, ঠিক আছে, তবে তাই হোক। আমি আগে যা বলছিলা আবার সেই কথাতেই ফিরে আসি।

তো আমার লেখাপড়ার বহর দেখে আমার বাবা যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ হ পড়েছিলেন। এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমাকে তিনি খেত-খামারের কাজে লে পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে নাকি সংসারের কিছু উপকার হয়। অ আমার মা-ও আমার বাবার কথায় সায় দিয়েছিলেন।

আমার মা আমার ছেলেবেলায় মায়ের সইকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর মে অমৃতালক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। মেয়েটিকে নাকি মায়ের বড় পছন্দ।

অমৃতালক্ষ্মী আমার আগেই একটা পাশ দিয়েছিল। এবং চাষী গেরস্ত ঘরের হওয়ার মতো তার চেহারাটাও তখন বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছিল। সুতরাং আম মা-ও চাইছিলেন, অধিক বিদ্যালাভের বৃথা চেষ্টা না করে আমি যেন বাবার স খেত খামারের কাজে লেগে পড়ি। যাতে করে নাকি তিনি বছর খানেকের মধ্যে শুভ কাজটা সেরে ফেলতে পারেন।

কিন্তু বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তখনও আমি কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি। তাই 'আ সে পরে ভেবে দেখা যাবে' বলে পরদিন সকাল বেলায় আমি যেয়ে হাজি হয়েছিলাম নূরপুরে, বাবার বাল্য বন্ধু রতনকাকার বাড়িতে।

রতনকাকা এবং সাহানাকাকীমাকে প্রণাম করে ওঁদেরকে আমি আমার পা খবর শোনাতেই কাকা আনন্দে আমাকে একেবারে বুকে টেনে নিলেন। আর তার উনি মন্তব্য করলেন, জানিস, রাত জেগে পুঁথি মুখস্থ করে একবারে পাশ ক চেয়ে ধীরে-সুস্থে দু'তিন বার ফেল করার পর পাশ করাই ভাল। তাতে করে একদি যেমন পাশের আনন্দটা বেশি করে উপভোগ করা যায়, অন্যদিকে আবার বার ফেল করায় বাস্তব যে কত কঠোর তাও বেশ বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে বাস্তব বোধটা বেশ কাজে লাগে। তোর এই কাকার জীবনেও তো অমনটাই ঘটে তাই এই নিয়ে তুই আবার যেন মন খারাপ করতে যাসনে। পাশ করেছিস এই যে

কিন্তু সাহানাকাকীমা রতনকাকার ওই সব জ্ঞান-গর্ভ কথায় মোটেও কান দি না। কাকা থামতেই উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দেখ, দেখ, একবার চেয়ে দে দীপু কত বড় হয়ে গেছে! ওকে কেমন পুরুষমানুষ-পুরুষমানুষ বলে মনে হচ্ছে!

কাকা বললেন, হ্যাঁ, এবারে অনেকদিন পরে দেখলাম ওকে। এর মধ্যেই ব যেন বেটা একেবারে পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছে।

এমন একটা সুযোগ আমি হাতছাড়া করলাম না। সঙ্গে সঙ্গে কাকার কাছে ত আমার পুরনো আর্জিটা পেশ করে দিলাম। বললাম, এবারে তাহলে তুমি আমায় দেখাও, কাকা। এবারে তো আমি সত্যিই বড় হয়ে গেছি। পুরুষ মানুষ হয়ে গে

কিন্তু কাকীমা বাগড়া দিলেন। বললেন, আঃ দীপু! কী যে বলিস তার কোন

নেই! আচ্ছা, ভূত-প্রেত আবার একটা দেখবার জিনিষ হল নাকি? ও সব মতলব ছাড়। তার চেয়ে চল, এই পৌষের শীতে আমরা তিনজন কলকাতার চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, এসব দেখে আসি। আর কালীঘাটে যেয়ে মায়ের পুজোটাও দিয়ে আসি। কতদিন হয়ে গেল মাকে দর্শন করিনি!

আমি বললাম, ওসব আমার দেখা হয়ে গেছে। আর কালীঘাটে যেয়ে মায়ের পূজোও দেওয়া হয়ে গেছে। তাই এবারে আমি ভূতই দেখব।

আমার কথা শুনে কাকা কাকীমার দিকে চেয়ে বললেন, আহা, যাক না! ওর যখন অনেক দিনের ইচ্ছে ভূত দেখার, তখন দেখেই আসুক না। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কাকার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম, না, না, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই! আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি, তাই না?

কিন্তু ভূত দেখার ব্যাপারে কাকীমা মোটেও সায় দিলেন না। উনি গোমড়া মুখ করে খানিকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঘরের কাজে চলে গেলেন।

আর কাকীমা চোখের আড়াল হতেই কাকা চাপা আনন্দে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কপালগুণে এবারে বড় ভাল সময়ে এসে পড়েছিস রে, দীপু! একে পৌষমাস, তারপর আগামী শনিবার অমাবস্যা। ভূত দেখার একেবারে প্রকৃষ্ট সময়। যাকে বলে একেবারে সোনায় সোহাগা! তুই মানসিক ভাবে তৈরী হয়ে নে। আর আমি একবার রুকি মাসির সঙ্গে দেখা করে আসি। ওনাকে রাজী করাতে পারলে ভূত দেখাটা কোন ব্যাপারই নয়! আর শুধু দেখার কথাই বা বলি কেন, ওনাকে রাজী করাতে পারলে তেনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, মেলামেশা করা, সবই সম্ভব হবে, বুঝলি?

কিন্তু কাকার মুখে ওঁর রুকি মাসির কথা শুনে আমার প্রচণ্ড রাগ হল। আমি কাকাকে বললাম, ওই ধাপ্পাবাজ মহিলার কথা তুমি মুখেও এনো না, কাকা! ভূত প্রেত সম্বন্ধে উনি কিচ্ছু জানেন না। সেই ছেলেবেলা থেকে ওঁকে আমি শুধু ধাপ্পাবাজীই করে আসতে দেখছি!

না রে না, তা নয়। আসলে এতদিন তুই ছোট ছিলিস তো, তাই তোকে উনি ভূত দেখাতে রাজী হন নি। এখন তুই বড় হয়েছিস। এখন তোকে ভূত দেখাতে উনি ঠিক রাজী হয়ে যাবেন। ব্যাপারটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।

না কাকা, তার দরকার নেই। ওই মহিলার সহযোগিতায় আমি ভূত দেখতে চাই নে। তোমার নিজের ক্ষমতায় তুমি যা পার, যতটুকু পার, তাই কর। ওই মহিলাকে তুমি এর মধ্যে টেনো না, ব্যস্।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব হবে 'খন। এখন তুই স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম কর গে। আমি একটু বেরোব!

তো একটু পরেই কাকা বাদশার পিঠে চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর

তিনি ফিরলেন সেই রাত দশটায়। আর ফিরেই আমাকে তিনি সু-সংবাদটা দিলেন। বললেন, বুঝলি দীপ, তোর ভূত দেখার ব্যাপারটা আমি একেবারে পাকা করে এলুম। আর কোন চিন্তা রইল না। আগামী অমাবস্যার রাতে তুই ভূত দেখতে যাচ্ছিস, ব্যস্।

তারপর তিনি বললেন, ওদিন সন্ধ্যের পরেই তুই বেরিয়ে পড়বি। কারণ তোকে যেতে হবে সেই সাত মাইল দূরের মারি গ্রামে!

মারি গ্রাম! ওটা তো একটা পরিত্যক্ত গ্রাম! বহুদিন থেকে ও গ্রামে কোন মানুষই বাস করে না!

আরে বোকা ছেলে। মানুষ বাস করে না বলেই তো তেনারা বাস করেন! মানুষের সঙ্গে কি আর তেনাদের বাস করা চলে?

আদতে কী হয়েছিল জানিস? বহুকাল আগে একবার মড়ক লাগায় গ্রামটার মানুষজন মরে একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই থেকেই গ্রামটার নাম হয়ে গেছে মারি গ্রাম। বহুকাল থেকেই ওটা একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। আর পরিত্যক্ত গ্রাম, পোড়ো বাড়ি, নদী বা জলাশয়ের ধারের জঙ্গলই হল তেনাদের পছন্দের জায়গা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মারি গ্রাম হল তেনাদের একটা আদর্শ গ্রাম। কিরে, ভয় পাচ্ছিস নাকি?

কী যে বল, কাকা! আচ্ছা, একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া তোমার এই ভাইপোকে তুমি আর অন্য কিছুতে ভয় পেতে দেখেছ কোন দিন?

গম্ভীর গলায় কাকা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এই তো চাই! এই রতন কাকার উপযুক্ত ভাইপোর মতো কথা বলেছিস তুই। তোর সাফল্য আটকায় কে!

একটু থেমে কাকা বললেন, তবুও একবার ভেবে দেখ। অমাবস্যার রাত। মারি গ্রাম বা তার আশপাশে কোথাও কোন জনবসতি নেই। আবার যেতে হবে তোকে সেই মহাকাল শ্মশানের পাশ দিয়ে। জায়গাটা কিন্তু ভাল নয়, বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে!

একটু থেমে কাকা আবার বললেন, আরেকটা ব্যাপার আছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেয়ে তোকে কিছুক্ষণ নীল সায়রের ধারে অপেক্ষা করতে হবে। নীল সায়রের আশপাশে রয়েছে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা বিশাল অনাবাদী মাঠ। ওখানকার ঝোপ-জঙ্গল হল বুনো শুয়োর আর বিষধর সাপের রাজ্য। ওদের রাজ্যে মানুষের অনুপ্রবেশকে ওরা কিন্তু মোটেও ভাল চোখে দেখে না। তাই আমি বলি কি, এসব ব্যাপারগুলো আগে তুই একটু ভাল করে ভেবে দেখ। তারপর যদি বলিস—।

আঃ কাকা! তুমি তোমার উল্টোপাল্টা গীত থামাও তো। তুমি ব্যবস্থা কর। আমি আগামী শনিবার রাতে ভূত দেখতে যাচ্ছি। তবে একটা কথা। একটা রাতের জন্য তুমি তোমার বন্দুকটা আমাকে ধার দিও। ব্যস্, তাহলেই হবে।

তা যেতে আসতে তো অনেকটা পথ। প্রায় চোদ্দ মাইল। তাই শুধু বন্দুক কেন,

তুই তুফানকেও পাচ্ছিস। আর অভিযান সফল করে ফিরে আসতে পারলে, তুফানকে তুই চিরদিনের মতো পেয়ে যাচ্ছিস।

আর শোন। বন্দুক দিয়ে যেন আবার তেনাদের মারতে যাস নে। কারণ বন্দুক দিয়ে তেনাদের মারা যায় না। শুধুমাত্র হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক চালাবি।

বেশ, বুঝলাম। কিন্তু ওদিন রাতে আমাকে নীল সায়রের ধারে অপেক্ষা করতে হবে কেন, তা তো বললে না?

বলছি, বলছি, সব বলছি। শোন। ওদিন রাতে তোকে নীল সায়রের ধারে অপেক্ষা করতে হবে এক ধনীপুত্রের বিয়ের শোভাযাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য।

ওখানকার তেমাথা রাস্তায় তুই অপেক্ষা করে থাকবি। এবং এক সময় তুই দেখতে পাবি, নীল সায়রের সমুখের বিস্তৃর্ণ মাঠের কাঁচারাস্তা ধরে এক আলো ঝলমলে শোভাযাত্রা তোর দিকে এগিয়ে আসছে। ওটাই হল বিয়ের শোভাযাত্রা। ওই শোভাযাত্রায় তোকে সামিল হতে হবে।

তোকে আমি একখানা লাল রুমাল দেব। ওই রুমালখানাই হল তোর ভূত দেখার ছাড়পত্র। এবং ওটা তোর শংসা পত্রও বটে। ওটার মেয়াদ শনিবার সারারাত। অর্থাৎ ওই রুমালই তোকে সারারাত ধরে রক্ষা করবে। কোনরকম অনিষ্ট ঘটতে দেবে না।

কাকীমা এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন কাকা চুপ করতেই কাকীমা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎই কাকাকে প্রশ্ন করলেন, আর যদি রাত পোহালে কোন অনিষ্ট ঘটে তখন কী হবে? তখন ছেলেটাকে কে রক্ষা করবে, শুনি?

কাকীমা হঠাৎ অমন একটা প্রশ্ন করায় কাকা খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। এবং আগুপিছু না ভেবে তিনি উত্তর দিলেন, কেন, কেন, ওর সঙ্গে বন্দুক থাকছে! ওই বন্দুকই ওকে রক্ষা করবে। প্রয়োজন হলে ও বন্দুক চালাবে।

আহা, কী যুক্তি! প্রয়োজন হলে ও বন্দুক চালাবে! কিন্তু একটু আগে তুমিই তো বলছিলে যে বন্দুক দিয়ে তেনাদের মারা যায় না! তা বন্দুক দিয়ে যদি তেনাদের না-ই মারা গেল, তাহলে ওই বস্তুটা সঙ্গে থাকলে ছেলেটার কোন্ উপকারটা হবে, শুনি?

কেন, ওটা দিয়ে ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের মারবে!

দেখ, রাতের বেলায় যদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো ছেলেটাকে ছেড়ে দেয়, তবে দিনের বেলায় যে তারা আর ওকে কামড়াতে আসবে না, সেটা আমি জানি। তাই তোমার কাছে আমি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের কথা জানতে চাইছি না। তোমার কাছে আমি জানতে চাইছি যে দিনের বেলায় যদি তোমার ওই ভূত-পেত্নীগুলো ছেলেটার কোন ক্ষতি করতে আসে, তখন তাদের হাত থেকে ওকে রক্ষা করবে কে? তোমার ওই লাল রুমালের ভেল্কি তো রাত পোহানোর আগেই শেষ!

এক গাল কেঠো-হাসি হেসে কাকা বললেন, ও, এই কথা? দেখ, দিনের বেলায় তেনারা কারো কোন অনিষ্ট করেন না। আসলে দিনের বেলায় তেনাদের মনে কোন অনিষ্ট-চিন্তাই ঠাঁই পায় না। আর তাই দিনের বেলায় তেনাদের থেকে কোন ভয়ের আশঙ্কাও থাকছে না!

কিন্তু কাকার ওই হাসি-মাখানো কথায় কাকীমা ভুললেন না। তিনি বললেন, দেখ, তোমার ওই মিষ্টি কথায় আমি ভুলছি না, বাপু! কারণ রাতের বেলায় যেনারা মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খেতে পারেন, দিনের বেলায় তেনারা সব হিংসা ভুলে শুধু নাম কীর্তন করে বেড়াবেন, এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!

তারপর তিনি বললেন, যত নষ্টের গোড়া হল ওই রুকি বুড়িটা। কাকা-ভাইপোকে একেবারে ভূত-পাগল করে ছাড়লে! আমার হয়েছে যত জ্বালা! আপন মনেই গজ গজ করতে করতে তিনি ঘরের কাজে চলে গেলেন।

আর কাকীমা ঘরের কাজে চলে যেতেই কাকা আমাকে বললেন, বরকর্তাকে তুই ওই শোভাযাত্রার সামনেই দেখতে পাবি। দেখবি, তেনার লম্বা-চওড়া-ফর্সা চেহারা পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, কাঁধে কাশ্মীরী শাল এবং হাতে শৌখিন লাঠি। ওই লাল রুমালখানা তুই তেনার হাত তুলে দিবি। ব্যস্। এর পর তোর সব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন।

তবে হ্যাঁ, তেনার নির্দেশগুলো কিন্তু তুই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবি। আর ভোর হতেই তেনাদের ডেরা ছেড়ে তুই চলে আসবি। কারণ দিনের বেলায় তেনাদের ডেরায় মনুষ্যের উপস্থিতি তেনারা কিন্তু সহ্য করেন না।

কিন্তু কাকা, এটা তো পৌষ মাস। পৌষ মাসে কি কারো বিয়ে হয়?

হয় রে, হয়। তেনাদের হয়। অমাবস্যা তিথি পেলেই হয়। তেনাদের সমাজে অমবস্যা তিথি হল এক মস্তবড় শুভদিন। তাই তেনাদের বিয়ে-সাদি, অন্নপ্রাশন এবং যাবতীয় শুভকর্ম ওই অমাবস্যা তিথিতেই সম্পন্ন হয়।

একটু থেমে কাকা বললেন, আর শোন। কালকের দিনটা সময় পাচ্ছিস। এর মধ্যে তোর মনটাকে তুই শক্ত করে নে। কারণ, একমাত্র শক্ত মনের মানুষই তেনাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, বুঝেছি।

কাকা আবার বললেন, আর শোন। মানুষের সঙ্গে ভূতেদের কিছু তফাত আছে এই যেমন ধর, আমাদের সমাজে দিন দিন ভাল মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে আর মন্দ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অথচ ভূতেদের সমাজে ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা সেখানে দিনদিন ভাল ভূতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর মন্দ ভূতের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে তোকে মাত্র ওই দু'চারটে মন্দ ভূত থেকে সাবধানে থাকলেই চলবে।

হ্যাঁ, বুঝলাম।

ইদানীং আরো একটা তফাত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখছিস তো, সমস্ত জগৎ ড়েই কেমন জনস্ফীতি শুরু হয়ে গেছে। হু হু করে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অথচ তেদের জগতে শুরু হয়েছে প্রবল ভূত সঙ্কোচন। দিন দিন ভূতের সংখ্যা দারুনভাবে ম যাচ্ছে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে তো ভূত সমাজ প্রায় নিঃশেষিত হতে লছে। ভূতেরা প্রায় নির্বংশ হতে বসেছে। ব্যাপারটা প্রতিটি ভূত-প্রেমী মানুষকেই শ ভাবিয়ে তুলেছে!

মানুষের সঙ্গে ভূতেদের আরো একটা বড় তফাত আছে। সেটা হল—।

বাধা দিয়ে আমি বললাম, দেখ কাকা, আমি একটা রাতের জন্য ভূত দেখতে চ্ছি। তাই তাদের স্বভাব-চরিত্রের খবর, তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিসংখ্যান, এসব ামার জানার প্রয়োজন আছে কী?

আছে রে, আছে। প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, তুই কি ভেবেছিস যে একটা রাতের খাশোনা, একটা রাতের মেলামেশাতেই তেনাদের সঙ্গে তোর সব সম্পর্ক শেষ য় যাবে? তা হয় না রে, দীপ। তা হয় না। তেনারা মানুষকে কাছে টানেন। নুষের সঙ্গের সম্পর্ককে তেনারা দীর্ঘস্থায়ী করেন। তেনাদের মনুষ্য প্রীতির কোন লনা হয় না! একবার দেখা-সাক্ষাৎ হোক, দেখবি আমার কথা একেবারে অক্ষরে ক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

থাক ওসব কথা। অনেক রাত হল। যা, এবারে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে। বাকী থা পরে হবে।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে একটা কথা আমায় তুমি খোলসা করে বল দেখি, কাকা। আচ্ছা, ই ধনীর ছেলের বিয়ের শোভাযাত্রায় সামিল হওয়ার সঙ্গে ভূত দেখার কোন ম্পর্ক আছে নাকি?

আরে! ব্যাপারটা তুই এখনও বুঝতে পারিস নি? আদতে ওই শোভাযাত্রাটাই া হল সেই ভূতের বিয়ের শোভাযাত্রা!

কাকার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। এবং অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে ল, অ্যাঁ!

মুচকি হেসে কাকা বললেন, হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। তারপর আমার পিঠে একটা চাপড় রে উনি বললেন, যা, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে।

রাতে ভাল ঘুম হল না। নানা রকম চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করতে লাগল। াকার ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী শনিবার, অমাবস্যার রাতে আমাকে ভূতের বিয়ের াভাযাত্রায় সামিল হতে হবে। অর্থাৎ একদঙ্গল ভূতের সঙ্গে আমায় বরযাত্রী সেজে নে ভূতের বাড়ি যেতে হবে। ভূত-পেত্নীর বিয়ে দেখতে হবে। তাদের সঙ্গে একত্রে সে বিয়ের ভোজ খেতে হবে, ইত্যাদি।

যদিও ভূত দেখার ইচ্ছে আমরা অনেক দিনের, কিন্তু তাই বলে ভূতের বিয়ে বরযাত্রী যাওয়া, ভোজ খাওয়া, এতটা? শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কোথায় যে দাঁড়াবে, কে জানে!

এমনিতে ভূত-পেত্নী বলতে আমরা যা বুঝি, আমাদের মনে যে ধারণাটা কা বেঁধে আছে, সেটা বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু তবুও আমরা ভূতের গল্প শুনা ভালবাসি। ভূতের দর্শন পেলে আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই। অবশ্য যেনাদের বিয়ে আমি আমন্ত্রিত, তেনাদের চেহারার কোন বিবরণ এখনও পর্যন্ত আমি কাকার কা থেকে পাইনি। তবুও মনে তো হয় না যে তেনারা সব নয়নাভিরাম রূপে আমা সম্মুখে হাজির হয়ে আমাকে একেবারে আনন্দ সাগরে অবগাহন করাবেন। ব্যাপার তাই চিন্তার বটে!

এছাড়াও তেনাদের বাসস্থান সম্বন্ধে একটা চিন্তা রয়েছে। কাকা বললে পরিত্যক্ত গ্রাম, পোড়োবাড়ি, নদী বা জলাশয়ের ধারের জঙ্গলই নাকি তেনাদে পছন্দের জায়গা। তা বরযাত্রী সেজে তেনাদের সঙ্গে আমাকে যে শেষপর্যন্ত কোথ যেয়ে দাঁড়াতে হবে, তাই বা কে জানে!

এর পরেও থাকছে খাদ্য-খানার চিন্তা। এটা একটা বড় চিন্তা। মানুষ বরযাত্রী জন্য তেনারা যে কোন্ ডিশের ব্যবস্থা করবেন, তাই বা কে জানে!

চোখে ঘুম এল না। এইসব সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতেই রাত অনেক হ গেল। বোধহয় শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। আর ঘুমি পড়তেই আমি সোজা যেয়ে বসে পড়লাম তেনাদের ছাঁদনা তলায়। তেনাদের বি দেখতে।

দেখলাম, ছাঁদনা তলায় ভূত-প্রেতনীর বিয়ে হচ্ছে। জাঁক-জমকের খামতি নে মান্যগণ্য ভূত-প্রেতরা সব ছাঁদনা তলায় বসে বিয়ে দেখছেন। আমার পাশে এ যুবতী বসেছিল। সেও বিয়ে দেখছিল। আমি আড়চোখে চেয়ে দেখলাম তার মুখখ বেশ হাসি হাসি। মনটা খুশি খুশি। কিন্তু সেই আড়চোখে চেয়ে দেখাটাই শে আমার কাল হল। পেছন থেকে কেউ বোধহয় আমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। আমার কানের কাছে মুখ এনে হঠাৎই বলে উঠল, এই, সাবধান! তোমার পাশে যুবতী কিন্তু কনের ছোটবোন!

একথা শুনে আমি ঝটিতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। কিন্তু কে আমা অমনভাবে সাবধান করল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, সবাই ভ মানুষের মতো মুখ করে বিয়ে দেখছে। মনে একটা খটকা লাগল। তাই সতর্ক হল সতর্ক হয়ে আমি কনের ছোট বোনের প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। আড় চোখে থাকলাম।

একটু পরে কনের ছোট বোন আমার মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে উঠ এবং সঙ্গে সঙ্গে ও লাজুক মেয়ের মতো মুখ নামিয়ে নিল। কিন্তু আমি ওকে প

দিলাম না। আমি গম্ভীর হয়ে বসে বিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কনের ছোট বোন হাল ছাড়ল না। ও উসখুস উসখুস করতে লাগল। এবং শেষে সামনের থালা থেকে একগাছা গাঁদা ফুলের মালা তুলে নিয়ে ও আমার কাছে এগিয়ে এল।

এবারে আমি ভয় পেলাম। এবারে আমার মন কু-গেয়ে উঠল। কু-গেয়ে উঠে সে আমার প্রতি চরম সতর্কতা জারি করল। বলল, সাবধান! কনের ছোট বোনের মতলব কিন্তু ভাল নয়! ওর হাতে-ধরা ওই গাঁদা ফুলের মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে ও তোমাকে পতিত্বে বরণ করার মতলব আঁটছে!

অ্যাঁ! এ কী সর্বনেশে কথা বলগো? তাহলেআমি এখন কী করি?

মন বলল, বাঁচতে চাও তো পালাও!

আমি বললাম, ঠিক বলেছ। য পলায়তি স জীবতি! সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে আমি হাঁচড় পাঁচড় করতে করতে ছাঁদনা তলার বাইরে বেরিয়ে এলাম। এবং বাইরে বেরিয়ে এসেই আমি ছুটতে শুরু করলাম। যে দিকে দুই চোখ গেল, সে দিকেই ছুটে চললাম।

কিন্তু তাতেও আমি রেহাই পেলাম না। কনের ছোট বোন সেই গাঁদা ফুলের মালাটি হাতে নিয়ে আমার পেছনে ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম। আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও আমি থামলাম না। আমি ছুটে চললাম। প্রাণের দায়ে ছুটে চললাম।

আর অমনি ভাবে ছুটতে ছুটতে এক সময় আমি হাঁফিয়ে উঠলাম। আমার পা জড়িয়ে আসতে লাগল। আর সেই সুযোগে কনের ছোটবোন বা হাত দিয়ে খপ্ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরল। এবং ডান হাতে সে তার বরমালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিতে গেল। আর এ হেন ব্যাপার দেখে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার যোগাড় হল!

আর ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন অমৃতা এসে আমার সামনে হাজির হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে কনের ছোটবোনকে বলল, এ্যাই, থাম, থাম! ওটি আমার নাগর। তুই ওকে বরমালা পরাতে যাস কোন আক্কেলে?

কনের ছোটবোন কিন্তু সে কথা মানতে নারাজ। সেও চিৎকার করে বলে উঠল, কোথাকার আহ্লাদী লো তুই? তোর বাক্যি শুনে মোর অঙ্গ জ্বলে যায়! সব্বাই জানে এটি আমার নাগর। তাই আজকের এই অমাবস্যার শুভ রেতে আমি এর গলায় বরমালা পরাতে যাচ্ছি। তুই কোথাকার কে? ভাগ এখান থেকে!

এহেন বাক্য শুনে অমৃতা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে সে তার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিল। তারপর কনের ছোট বোনের দিকে ছুটে যেয়ে সে চিৎকার করে বলল, তবে লো মাগী! বড্ড বাড় বেড়েছিস! দেখাচ্ছি মজা!

প্রথমে ওরা দু'জন হাতাহাতি শুরু করল, সঙ্গে গালাগালি। পরে ঠেলাঠেলি এবং শেষে চুলোচুলি।

দেখলাম, কেউ কম যায় না। দু'জনেই সমান লড়িয়ে। খানিকক্ষণ দু'জনেই সমান তালে লড়ে গেল। কিন্তু কনের ছোটবোন শেষ রক্ষা করতে পারল না। লড়াই চলাকালীন অমৃতা একসময় সুযোগ বুঝে ওর খোলা চুল ধরে সজোরে দিল এক হেঁচকা টান। প্রতিপক্ষের অমন বিদঘুটে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কনের ছোট বোন প্রস্তুত ছিল না। ফলে মুহূর্তে সে হল কুপোকাত।

কনের ছোট বোন ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে অমৃতা আনন্দে নাচতে শুরু করে দিল। আর অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কনের ছোটবোন বাবা গো, মা গো, মেরে ফেল্লে গো বলে চিৎকার করতে লাগল। খানিকক্ষণ ওভাবেই চলল। একজন নাচতে লাগল। অন্যজন ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল চিৎকার করতে লাগল।

শেষে নাচ থামিয়ে অমৃতা আমাকে বলল, এবারে ধর মাগীর গলা টিপে। ওর বিয়ের সাধ ঘুচিয়ে দাও। ওকে হত্যা কর।

আমি বললাম, কিন্তু শুনেছি, নারীহত্যা ধর্মশাস্ত্র বিরোধী। তাহলে একে আমি হত্যা করি কী করে?

অমৃতা বলল, ও মাগী নারী নয়, পেত্নী। আর পেত্নী হত্যায় শাস্ত্রে কোন বাধ নেই। তুমি ওর গলা টিপে ধর। ওকে হত্যা কর।

অমৃতার কথা মতো শেষে আমি দু'হাতে কনের ছোট বোনের গলা টিপে ধরলাম। ও ছটফট করতে লাগল। হাত পা ছুড়তে লাগল। আর ওদিকে অমৃত সমানে চিৎকার করতে লাগল, আরো জোরে টিপে ধর। আরো জোরে। আরে জোরে।

আমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কনের ছোটবোনের গলা টিপে ধরলাম। কিন্ত কী শক্ত গলা রে বাবা! হাজার টেপাটেপি করেও আমি তেমন সুবিধে করতে পারলাম না! এমন সময় সুযোগ বুঝে ও আমার একখানা হাত কামড়ে ধরল একেবারে মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিল। তারপর কড়মড় করে ও আমার হাত খানাকে চিবোতে লাগল। আঃ! সে কী যন্ত্রণা!

আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। প্রচণ্ড ভয়ে আমি বাবা গো, মা গো, খেয়ে ফেল্লে গো বলে চিৎকার করে উঠলাম। সে এমনই বিদঘুটে চীৎকার যে সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যেতেই আমি বিছানায় উঠে বসলাম।

দেখলাম, পৌষের সেই প্রচণ্ড শীতেও আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে আর সেই ঘামে ভেজা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে গুচ্ছের শিমুল তুলো।

বুঝলাম, স্বপ্নে কনের ছোট বোনের গলা ভেবে এতক্ষণ যা আমি টেপাটেপি

রেছি, আসলে তা হল আমার বিছানার কোল বালিস। আর সেই কোল বালিসের খাল ছিঁড়েই এখন আমার শরীরের এই অদ্ভুত দীপ্তি!

* * *

শনিবার। সন্ধ্যের পরে কাকা আমাকে বললেন, ছ'টা বাজে। ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে অমাবস্যা লাগছে। চটপট তৈরী হয়ে নে। শুভ কাজে দেরী করতে নেই।

ঠিক কথা। 'শুভস্য শীঘ্রম' কথাটা আগে আমি কতিপয় গুণীজনের মুখে শুনেছিলাম। সুতরাং সময় নষ্ট না করে আমি কাকার হ্যাট, কোট, বুট পরে চটপট তৈরী হয়ে নিলাম। কাকার বন্দুকটা আমি আগেই পরীক্ষা করে রেখেছিলাম। সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। আব্দুল তুফানকে সাজিয়ে-গুজিয়ে এনে উঠোনের এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল। অত্যন্ত তেজী ঘোড়া। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে লাগল।

একটু পরে কাকীমা মলিন মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আর কাকা একটু এগিয়ে এসে একখানা ভাঁজ করা লাল রুমাল আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, ওই রুমালে সাঙ্কেতিক ভাষায় কিসব লেখা রয়েছে।

কাকা বললেন, রুমালখানা তুই তোর কোটের পকেটে রেখে দে। নীল সায়রের মাঠে ওখানা তুই বরকর্তার হাতে তুলে দিবি। ওঁর নির্দেশ মেনে চলবি। বিয়ে বাড়িতে ওঁরা যেখানে তোকে বসতে দেন, বসবি। ওঁরা যা খেতে দেন, খাবি। আজ রাতে তুই ওঁদের অতিথি। আর ওঁরা কখনো অতিথির অনিষ্ট করেন না। বরং সারারাত ধরে ওঁরাই তোকে রক্ষা করবেন। কিন্তু ভোর হতেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বি। এক মুহূর্তও দেরী করবি নে।

'আচ্ছা' বলে লাল রুমালখানা আমি আমার কোটের পকেটে রাখলাম। কাকীমা বললেন, দেখেশুনে যাস বাবা, দেখেশুনে থাকিস। আর ভোর হওয়া মাত্র ওখান থেকে বেরিয়ে পড়িস। দেরী করিস নে যেন। খুব চিন্তায় থাকব।

না, না চিন্তা কোরো না। আমি ভালভাবে যাব, ভালভাবে থাকব এবং ভালয় ভালয় ফিরেও আসব।

আমার কথা শুনে কাকীমা ম্লান হাসলেন।

হাতঘড়িতে দেখলাম প্রায় সাতটা বাজে। ওঁদের দু'জনকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, সময় হয়ে গেছে। এবার আম্মাকে যেতে হবে।

একটু এগিয়ে যেয়ে আমি ওঁদের দু'জনকে প্রণাম করলাম। তারপর তুফানের কাছে যেয়ে আমি ওর পিঠে চেপে বসলাম। বিদায় জানাতে ওঁদের দু'জনের উদ্দেশ্যে আমি হাত নাড়ালাম। ওঁরা দু'জন একসঙ্গে বলে উঠলেন, "দুগ্গা দুগ্গা"।

আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। শীতের ধুলো উড়িয়ে তুফান ছুটে চলল।

এ তল্লাটে সবই কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে এসব রাস্তায় কাদা থাকে, এখন শুধুই

ধুলো। প্রায় চার মাইল পথ ছুটে চলার পর আমি তুফানকে দাঁড় করালাম। রাস্তার বাঁ পাশে রয়েছে বহুকালের পুরনো মহাকাল শিবের মন্দির। চৈত্র, বৈশাখ আর শ্রাবণ মাসে এখানে খুব ধুমধাম করে উৎসব হয়। মেলা বসে। তখন বহু ভক্তের সমাগম হয় এখানে। অন্য সময়ের জন্য একজন নিত্য পূজারী আছেন। রোজ সকালে এসে তিনি পূজো করে যান। আমি দিনের বেলায় এদিকে এসেছি কয়েকবার। এসেছি মেলা দেখতেও। তবে রাতে এই প্রথম।

একটু দূরেই গ্রাম। গ্রামে চাষি-গেরস্ত আর মৎস্যজীবীর বাস। কয়েক ঘর বামুন কায়েতও আছে শুনেছি। দূর থেকে তাদের ঘরের টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছিল

আমি তুফানের পিঠ থেকে নীচে নামলাম। দেখলাম, মন্দিরের দরজা বন্ধ। একটু এগিয়ে যেয়ে আমি মন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম। তারপর হাতজোড় করে আমি মহাকাল শিবের উদ্দেশে প্রনাম করলাম। আর তারপর তুফানের লাগাম ধরে আমি হেঁটেই কিছু দূরের মহাকাল শ্মশানের কাছে গেলাম। রাস্তার ডান পাশে একটু নীচুতে মহাকাল শ্মশান। সুবিস্তৃত শ্মশানভূমি। আশপাশের দশ-বারখানা গ্রামের মানুষ এই শ্মশানে মৃত দাহ করতে আসে।

শ্মশানের পাশেই বিশাল-বিস্তৃত জলাশয়। নাম বিশাল বিল। বিলের ধারে ধারে জমাট বাঁধা কচুরি-পানা। ভোরবেলায় এই বিলে জেলেরা মাছ ধরতে আসে। এখন সব সুনসান

তুফানের লাগাম ধরে আমি আরও একটু এগিয়ে গেলাম। আমার সম্মুখে সুবিস্তৃত মহাকাল শ্মশান। লক্ষ লক্ষ তারার আলোয় অমাবস্যার গাঢ় অন্দকার কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছিল। আর সেই ফিকে আলোয় আমার যা নজরে এল তাতে মনে হল কিছুক্ষন আগেই এখানে কোন মৃত দাহ করা হয়েছে। চিতা থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আর বিলের কোল ঘেঁষে কতকগুলি শেয়াল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করছিল। তাদের খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

শুনেছি, এতল্লাটে যারা অত্যন্ত গরিব, তারা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ যোগাড় করতে পারে না। তাই ওই গরিব মানুষগুলো বাধ্য হয়ে তাদের প্রিয়জনের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ বিলের ধারের কাদায় পুঁতে দেয়, অথবা তা জমাট-বাঁধা কচুরি-পানার নীচে চালান করে দেয়। তারপর তারা তাদের চরম দারিদ্রের দুঃখ ভুলতে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে ঘরে ফিরে যায়।

শেয়ালগুলোর ঝগড়া-মারামারির খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ শুনে আমার মনে হল, তারা ওই রকমই কোন অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ তুলে এনে নৈশ ভোজ সমাধা করছে। আর অসমান ভাগ-বাটোয়ারার জন্যই তারা ঝগড়া-মারামারি করছে।

জানি না আমি কতক্ষন ধরে ওই মহাকাল শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জানি না আমি কতক্ষন ধরে ওই শেয়ালগুলোর ঝগড়া-মারামারি দেখছিলাম। তাদের খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ শুনছিলাম। হঠাৎ একটা কাল পেঁচার তীক্ষ্ণ কিচ্ কিচ্ কিচ্ শব্দ কানে যেতেই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। আর সম্বিত ফিরে পেতেই আমার মনে

ুল এই মহাকাল শ্মশান সম্বন্ধে কাকার সতর্কবাণীর কথা—'জায়গাটা কিন্তু ভাল
া, বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে'। কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে আমি মন্দ কিছু
খতে পেলাম না। যা দেখলাম তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। রোজকার ঘটনা।

এখান থেকে রাস্তা আস্তে আস্তে ডান দিকে মোড় নিয়েছে। আমি প্রায় আধ
ইল রাস্তা ছুটে গেলাম। আর তারপর নীল সায়রের সমুখের তেমাথা রাস্তায় এসে
ানাকে দাঁড় করালাম। আমার বাঁদিকে একটা মেঠো পথ বিস্তৃর্ণ মাঠের বুক চিরে
দূরে চলে গেছে। কাকার কথা অনুযায়ী ওই মেঠোপথ ধরেই এক আলো ঝলমলে
াভাযাত্রা এগিয়ে আসবে।

আমার ডানদিকে নীল সায়র। বিরাট দীঘি। বহুকালের পুরনো দীঘি। প্রচুর
াফুল ফোটে। দীঘির ধারে ধারে ফোটে নানা বর্ণের ছোট ছোট ফুল।

নীলসায়রের অদূরেই রয়েছে ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা অনেক কালের এক ভগ্ন অট্টালিকা।
ন্ধকারে ডুবে থাকায় দূর থেকে সেটাকে বড় কিম্ভূত কিমাকার দেখাচ্ছিল। বুনো শূয়োর
র বিষধর সাপের রাজ্য এটি। এখানে তাই মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

তুফানের পিঠ থেকে নেমে আমি তেমাথা রাস্তায় পায়চারী করতে লাগলাম।
াথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। পৃথিবী এখানে স্তব্ধ। পৃথিবী এখানে ধ্যানমগ্ন।

পুবাকাশে চেয়ে দেখলাম, শিকারীবেশী কালপুরুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে
য়ে রয়েছে। আর কালপুরুষের দক্ষিণ পদ সংলগ্ন লুব্ধক একখণ্ড বৃহৎ নীলকান্ত
নির মতো আকাশ থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

দূর আকাশের কালপুরুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে ধ্যানমগ্ন পৃথিবীর দিকে চেয়েছিল। আর
নমগ্ন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে শিকারীবেশী কালপুরুষের দিকে
য়েছিলাম। আর ঠিক তখনই এক বৃহদাকার উল্কা আমার মাথার অনেক ওপর
য় জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে মহাকাল শ্মশানের দিকে ছুটে গেল। এবং
রপর মুহূর্তেই সেটি দপ্ করে নিভে গেল। সেটি চিরকালের মতো শেষ হয়ে
ল। সেটি ভস্মীভূত হয়ে গেল। আর সেই ভস্মীভূত উল্কার এক মুঠো ভস্ম
াকাল শ্মশানের বুকে যুগ যুগ ধরে জমে থাকা ভস্মরাশির সঙ্গে মিলেমিশে
কাকার হয়ে গেল। পার্থিব মানুষ আর অপার্থিক উল্কার দেহাবশেষের মিলন ঘটল।
র দাঁড়িয়ে সাক্ষী রইলাম একা আমি।

রাত বাড়ছিল। আমি আবার পায়চারী করতে লাগলাম। পায়চারী করতে করতে
মার কাকার কথা মনে পড়ল। কাকা বলেছিলেন, তোকে কিছুক্ষণ নীল সায়রের
রে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কাকার সেই 'কিছুক্ষণ' যে কতক্ষণ, কে জানে।

অগণিত তারার মালার ফিকে আলোয় ছেয়ে থাকা নির্জন প্রান্তরের অখণ্ড
রবতা যে কতটা অস্বস্তিকর আমি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। আর তাই একটু
ালোর রোশনাই দেখার আশায় আমি বার বার সেই মেঠোপথের দিকে চাইছিলাম।
ন্তু মেঠোপথের চরম উদাসীনতায় আমি বার বার হতাশ হচ্ছিলাম।

একদিকে ওই নির্জন প্রান্তরের অখণ্ড নীরবতায় আমার অস্বস্তি বাড়ছিল অন্যদিকে আমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় আমাকে আর এক ধন্দে ফেলে দিয়েছিল। সে-ও আমার আর এক অস্বস্তি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে বার বার বলছিল, অলক্ষ্যে থেকে কেউ তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। অথচ বহু চেষ্টা করেও আমি অলক্ষ্যে অবস্থানকারীর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফলে আমার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

মনের যখন এইরকম অবস্থা, দূর থেকে তখনই আমার নজর গেল মহাকা শ্মশান তথা মহাকাল মন্দিরের দিকে। আর সেদিকে নজর যেতেই, কয়েক মুহূর্তে জন্য সেথায় আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। যা দেখে আমার বুকের ভেতর একবার ছাঁক করে উঠল। বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেলাম আমি।

আমি দেখলাম, এক জ্যোতির্ময় অগ্নিশিখা অনবচ্ছিন্নভাবে মহাকাল শিবমন্দিরে চূড়া ছাড়িয়ে উঠে শূন্যে বিলীন হচ্ছে। দর্শনটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের। কিন্তু কার আমি বুঝতে পারলাম না। তাই বড় অদ্ভুত মনে হল।

ক্ষণিকের বিরতির সঙ্গে সঙ্গে গণেশ বলে উঠল, এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হ গেল, কাকা। একমাত্র পরম শিবভক্ত ছাড়া এই ধরনের দুর্লভ দর্শন লাভ আর কা হতে পারে না। এই ধরনের—।

গণেশকে বাধা দিয়ে রামলোচন খুড়ো বললেন, আঃ গণেশ! তুই চুপ কর তে কম বয়সে ভায়া বাউন্ডুলে দিল, ছন্নছাড়া ছিল। আর সেই জন্য তার শিব ভক্তি খামতি ছিল— এমন কথা তুই বলিস কেমন করে? বরং বাবার বসন-ভূষন এ রকম-সকম দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে বাউন্ডুলে আর ছন্নছাড়াদের প্রতিই ত অধিক কৃপাদৃষ্টি। ওইসব মানুষদেরই তিনি তাঁর দলে আগে ভেড়াতে চান। ওই মানুষদেরই তিনি তাঁর পরম এবং চরম ভক্ত করে ছাড়তে চান, বুঝেছিস?

তারপর আগন্তুকের দিকে চেয়ে খুড়ো বললেন, ভায়া, তুমি এগিয়ে যাও।

তখন আগন্তুক বললেন, তো কিছুক্ষণ আগে যখন আমি ওই মহাকাল পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন ওখানে আমি কোন শব বা শবযাত্রী দেখি নাই ইতিমধ্যে যদি ওখানে দু'একটি শব এসেও থাকে, এবং দাহকার্য শুরু হয়ে থা তাহলেও সেইসব চিতাগ্নির শিখার অমন জ্যোতির্ময় এবং সুউচ্চ হওয়ার কথা ন তাহলে? তাহলে ব্যাপারটা কী?

প্রশ্ন শুনে আমার মন বলল, হয়তো মহাকালের ওই জ্যোতির্ময় অগ্নিশি অনবচ্ছিন্ন ভাবেই ঊর্ধ্বে বিলীন হয়ে চলেছে। হয়তো কোন এক অজানা কারণে মুহূর্তের তরে তোমার নজরে ধরা দিয়েছে। তবে যে জ্ঞানে মহাকালের মাহা সম্যকরূপে বোধগম্য হয়, সে জ্ঞান তো তোমার নেই, বন্ধু। অতএব দূর হতে ও মহাকাল শিবের উদ্দেশে একবার প্রণাম জানিয়ে ব্যাপারটায় ইতি টান।

সুতরাং মনের পরামর্শ মেনে নিয়ে আমি দূর হতে ওই মহাকাল শিবের উদ্দে একবার প্রণাম জানালাম। ব্যাপারটায় ইতি টানলাম।

রাত বেড়ে চলেছিল। দিগন্তব্যাপী জমাট বাঁধা নীরবতার মধ্যে আমি আবার পায়চারী শুরু করেছিলাম। আর আলো ঝলমলে শোভাযাত্রা দেখার আশায় আমি বার বার সেই মেঠো পথের দিকে চাইছিলাম। এবং প্রতিবারেই আমি হতাশ হচ্ছিলাম। এমন সময় তুফানের হ্রেষারবে নীল সায়রের মাঠের সেই জমাট বাঁধা নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আমি একটু সরে যেয়ে তুফানের লাগাম ধরলাম। ওর পিঠে কয়েকটা চাপড় মেরে ওকে আমি শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ও শান্ত হল না। ও হ্রেষারব করতে লাগল। চেয়ে দেখলাম, ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অদূরের এক ঘন ঝোপের প্রতি নিবদ্ধ।

আমি কান পাতলাম। আমার মনে হল, অদূরের ওই ঘন ঝোপের আড়ালে কয়েকটি বন্যপশু লুকিয়ে রয়েছে। শুকনো ঝরা পাতার ওপরে তাদের পায়ের খস খস শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝলাম, তুফানের আস্ফালনের কারণ সেটাই।

তখন পিঠ থেকে গুলি ভরা বন্দুক নামিয়ে নিয়ে আমি ওই ঘন ঝোপের দিকে তাক করে দাঁড়ালাম। খস খস শব্দ সাময়িক ভাবে বন্ধ হল। তুফানের আস্ফালন ও সাময়িকভাবে বন্ধ হল। কিন্তু ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সেই ঝোপের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে রইল।

খানিকক্ষণ ওভাবেই চলল। কিন্তু বেশীক্ষণ ওইভাবে চলল না। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পশুগুলো অধিক সময় ঘাপটি মেরে থাকা পছন্দ করল না। ওরা আবার উস-খুস করে উঠল। আর উস-খুস করে উঠতেই ঝরা পাতার ওপরে ওদের পায়ের শব্দ আবার শোনা গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তুফানও আবার হ্রেষারব করে উঠল। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। পা ঠুকতে লাগল। হেলে-দুলে নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। এবং শেষে তীক্ষ্ণ হ্রেষারব তুলে তুফান ওই ঘন ঝোপের দিকে ছুটে যেতে গেল। ওর ওই বেপরোয়া রনংদেহী ভাব লক্ষ্য করে আমি দৃঢ়ভাবে ওর লাগাম টেনে ধরলাম। ওকে শান্ত করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। ও শান্ত হল না। আর আগের মতোই ওর সতর্ক দৃষ্টিও সেই ঝোপের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে রইল।

মনে হল, তুফানের ওই জঙ্গীপনা লক্ষ্য করে বন্যপশুগুলো এবার প্রমাদ গুনল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে 'আলোচনায় বসল।' ওদের আলোচনার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

এবং একটু পরেই ওদের দলপতি ওর সহযোদ্ধাদের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে সতর্ক করে দিল। এবং তার পর মুহূর্তেই দলপতি নিজ লেজে কয়েকটি পাক মেরে নিয়ে, ঝোপের আড়াল হতে ছিটকে বেরিয়ে মাঠের দিকে ছুটতে শুরু করল। আর তার অব্যবহিত পরেই আরো গোটা সাতেক বন্যপশু বিরক্তি ভরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে ওদের দলপতিকে অনুসরণ করল।

ওই সহযোদ্ধা বন্যপশুগুলোর বিরক্তিময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে আমার তো মনে

হল যে ওদের দলপতির অমন অসম্মানজনক পশ্চাদপসরণ নীতি ওদের মোটেও পছন্দ হয়নি। আর তাই বিরক্তিময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে ওরা ওদের দলপতিকে ধিক্কার জানাল। আর নেহাৎই দলের শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বিবেচনা করে ওরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের দলপতিকে অনুসরন করে তীব্র গতিতে ছুটে পালাল।

সযোদ্ধা বরাহপুঙ্গব মুহূর্ত মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তুফানও শান্ত হল। লক্ষ তারার আলোয় ছেয়ে থাকা ঝাপসা প্রান্তরে ঝুপ্ করে আবার ক্লান্তিকর নীরবতা নেমে এল।

রাত বাড়ছিল। আর সেই সঙ্গে পৌষের কুজ্ঝটিকাময় প্রান্তরে শীতও জেঁকে বসছিল। আমি তেমাথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ মেঠো পথের দিকে চেয়েছিলাম। কোথাও যদি একটু আলোর রোশনাই দেখা যায়, এই আশায়। কিন্তু কোথায় কি! নীল সায়রের বিস্তৃর্ন বোবা প্রান্তর আলোহীন, জনহীন, বিবর্ন এবং ক্লান্তিকর। আলোর আশা এখানে দুরাশা মাত্র!

কিন্তু একটু পরে সেই বোবা প্রান্তর ও হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল। বিস্তৃর্ণ প্রান্তরের ঝোপ-ঝাড় হতে যাম ঘোষণা শুরু হল।

প্রথমে মাত্র একটি শেয়াল কা-হুয়া রবে ডেকে উঠে প্রহর ঘোষনা শুরু করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কুটুম্বরা তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আকাশ ফাটানো কা-হুয়া রব তুলে সেই ক্লান্তিকর বোবা প্রান্তরকে মুহূর্তে মুখর করে তুলল। এবং খানিকক্ষণ ওভাবেই চলল।

লক্ষ্য করলাম, তুফান কিন্তু যামঘোষদের ওই গগনভেদী যামঘোষণাকে মোটে আমলই দিল না। সে আগের মতোই শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবখানা এই যেন এমনটা যে ঘটবে তা তার আগেই জানা ছিল। এখন থেকে সাত দন্ড পরে দুনিয়ার তাবৎ যামঘোষ যে আবার একবার কা-হুয়া রবে আকাশ ফাটাবে, তুফানের তা-ও জানা আছে।

নীল সায়রের তেমাথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি এসব কথাই চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আবার আমাকে সেই একই সংকেত দিল, তোমার অলক্ষ্যে থেকে কেউ তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। সংকেত পাওয়া মাত্র আমি ঝট করে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে দাড়ালাম। কিন্তু কোথায় কে! আমি আমার সমুখে দেখলাম। আমার বামে দেখলাম, ডাইনে দেখলাম। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

ভূত দেখতে এসে শেষে হতাশ হয়ে আমি পৌষের কুহেলিকাময় নির্জন প্রান্তরে ভূতের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল তুফান।

* * *

সব প্রতীক্ষারই শেষ আছে। এক সময় আমার প্রতীক্ষাও শেষ হল। মেঠো পথের শেষ প্রান্তে আলোর রোশনাই দেখা গেল। আর তা দেখা মাত্র আমার মন আনন্দে নেচে উঠল।

দূর থেকে আলো ঝলমলে শোভাযাত্রা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে আসতে লাগল।

: কিছুক্ষণের মধ্যেই শোভাযাত্রার বাদ্যি-বাজনার শব্দ বাতাসে ভেসে আসতে লে। আলো এবং বাজনার শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল।

বহু প্রতীক্ষার পর শোভাযাত্রার দেখা মেলায় আমার আর তর সইল না। তাই ী না করে আমি একলাফে তুফানের পিঠে চেপে বসলাম। তারপর মেঠো পথ আমি ছুটে গেলাম শোভাযাত্রার দিকে।

শোভাযাত্রা থেকে কিছুটা দূরে, রাস্তার 'পরে আমি তুফানকে দাঁড় করালাম। পর কাকার দেওয়া সেই রুমালখানা কোটের পকেট থেকে বের করে নিয়ে আমি াকে আন্দোলিত করতে লাগলাম। বর এবং বরকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ম অমনটা করলাম। কিন্তু তাতে উল্টো ফল ফলল। শিকারীর বেশে, ঘোড়ায় প আমাকে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোটা শোভাযাত্রী দলটাই স্তব্ধ য়ে থমকে দাঁড়াল। সম্মুখে ভূত দেখার মতোই গোটা দলটা অবাক বিস্ময়ে ার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাকে ওভাবে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্ত মধ্যে শোভাযাত্রার র সমস্ত বাজনা থেমে গেল। শোভাযাত্রার সম্মুখের সাদা ঘোড়ার সওয়ারী জ্জিত বর রাস্তা আগলে দাঁড়ানোর কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে আমার ক চেয়ে রইল। বরের পেছনে কুড়ি-পঁচিশ জন যুবক বাজনার তালে তালে নাচতে তে এগিয়ে আসছিল। তারা নাচ থামিয়ে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ল। তাদের পেছনের ছয়-সাতখানা জুড়ি গাড়ির সমস্ত বরযাত্রী অবাক বিস্ময়ে ার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ সুমুখে ভূত দেখলে আমরা যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হই, টা দলটার অবস্থাও হল ঠিক তেমনই। আর হঠাৎ অমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির ীন হয়ে আমার যে কী করা উচিত, আমি তাই ভেবে পেলাম না। আর তাই ্য হয়ে আমি হাবা-কালার মতো চুপ করে তুফানের পিঠে বসে রইলাম। হাঁ-করে য় রইলাম সামনের দলটার দিকে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি পেছনের ড়ি গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। দেখলাম, ভদ্রলোকের লম্বা-ড়া-ফর্সা চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী। কাঁধে কাশ্মীরী-শাল। হাতে শৌখিন লাঠি। লাম, ইনিই বরকর্তা।

ভদ্রলোক কাছে আসতেই আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নীচে নামলাম। উনি ক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি?

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম, আজ্ঞা, আমার নাম দীপক। বাস হুতোমপুরে।

তা তুমি এভাবে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তোমার উদ্দেশ্যটা কী?

আজ্ঞা, এই যে— বলে কাকার দেওয়া সেই লাল রুমালখানা আমি ওঁর হাতে ল দিলাম।

উনি রুমালখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। রুমালের সাংকেতিক ভ পড়লেন। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে উনি সহাস্যে বললেন, দ্যাখো ক আরে তুমি তো আমাদের সম্মানীয় অতিথি হে! এসো, এসো, আমার সঙ্গে এ এই বলে রুমালখানা উনি আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, চলুন। ডান হাতে তুফানের লাগাম ধরে আমি বরক সঙ্গে শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে চললাম। চেয়ে দেখলাম, গোটা শোভাযাত্রা তত আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের গুঞ্জনধ্বনি যাচ্ছে।

শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বরকর্তা আমায় বললেন, আসলে হ কি, কয়েক মাস আগে এক সাহেব-শিকারী এদিকে শিকার করতে এসে শেষে নিজেই একপাল হিংস্র বুনো শূয়োরের শিকার হয়ে গেছে। আর তারপর থে সেই সাহেব ভূত হয়ে এই অঞ্চলে উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। তাই তোমাকে ওত রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমরা ভাবলাম বুঝি—, কথা শেষ না ক উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

যেহেতু বরকর্তা হাসছেন তাই আমাকেও হাসতে হল। যেহেতু বর শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তাই আমাকেও ওঁর সঙ্গে এগিয়ে যেতে কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় আমার মনে একটা খটকা লাগল। ভাবলাম, আচ্ছা, সেই ভূতের বিয়ের শোভাযাত্রা তো, কাকা আমাকে যে শোভাযাত্রার বলেছিলেন? নাকি ভুল করে আমি অন্য কোন বড়লোকের ছেলের বি শোভাযাত্রায় সামিল হতে চলেছি। খটকা লাগার কারণ অবশ্য একটাই। সেটা আচ্ছা, ভূতেদেরও কী ভূতের ভয় থাকে? নইলে আমাকে সাহেব-ভূত ভেবে দঙ্গল ভূত অমন থমকে দাঁড়াল কেন? ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে না?

বরকর্তার প্রশ্নে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন পদ্মিনীবাঈ তোমার কে হন?

আমি ওঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, কে পদ্মিনীবাঈ? ওই নামের কাউকে আমি না তো!

তাহলে তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছেন?

আমার রতনকাকা।

উনি আর কোন প্রশ্ন না করে আমাকে বললেন, শোন। আমাদের এ অনেকটা পথ যেতে হবে। তা তোমার সঙ্গে তো ঘোড়া আছে দেখছি। তা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তুমি আমাদরে সঙ্গে এগিয়ে চল।

আর শোন। আমি পেছনের জুড়ি গাড়িতে আছি। তোমার কোন অসুবিধা আমাকে বোলো। আর তুমি আমাদের এই শুভকর্মে যোগ দেওয়ায় আমরা খুব

য়েছি। তারপর উনি হেসে বললেন, একটু মানিয়ে নিও। আমি এগোচ্ছি।

উনি শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু এগিয়ে যেয়ে উনি অশ্বারূঢ় বরের পাশে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উনি বরকে কিছু বললেন। বর আমার দিকে চেয়ে খুশির হাসি হাসলেন।

আরো একটু এগিয়ে যেয়ে বরকর্তা জুড়ি গাড়িতে উঠলেন। আর আমি তুফানের পিঠে চেপে শোভাযাত্রার পেছনে চলে গেলাম।

আবার বাজনা বেজে উঠল। বাজনার তালে তালে ছেলেরা নাচতে শুরু করল। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর শোভাযাত্রা ধীর গতিতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। আর সবার পেছনে থেকে, তুফানের পিঠে চেপে আমিও এগিয়ে চললাম। তবে আমার মন কিন্তু সংশয়মুক্ত হল না। সংশয়ের কারণ?

কারণ আনন্দের আতিশয্যে সেদিন আমি কাকার কাছ থেকে তেনাদের চেহারার বিবরণ নিতে ভুলে গেছলাম। আর আজ আমি যাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি তাদের চেহারার সঙ্গে আমাদের মনগড়া তেনাদের চেহারার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিনা। আর শুধু চেহারার মিলের কথাই বা বলি কেন! কোন কিছুরই মিল খুঁজে পাচ্ছি না। আজ আমি যাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি তাদের অভিজাত চেহারা, অভিজাত সাজ-পোষাক, অভিজাত আচার ব্যবহার। তো এতসব দেখার পরে আর আমার মন সংশয় মুক্ত হয় কী করে? মন থেকে সন্দেহ দূর হয় কী করে? তাই মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। বার বার মনে প্রশ্ন জাগল, এটা সেই ভূতের বিয়ের শোভাযাত্রা তো? নাকি ছল করে—? কিন্তু তবুও আমি এগিয়ে চললাম। উপায়ন্তর নেই দেখে এগিয়ে চললাম।

মনে সংশয় নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। নানান কথা চিন্তা করতে করতে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। আর তাই আমার অজ্ঞাতসারেই আমি শোভাযাত্রা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় একটি দশ-বার বছরের অশ্বারোহী কিশোর আমার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, ও কাকু, তুমি পিছিয়ে পড়লে কেন? ঘোড়াকে দানাপানি দাওনি নাকি?

আমি বললাম, না, না, ওকে আমি দানাপানি দিয়েছি। আমার পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে ওর কোন দোষ নাই। বোধহয় আমি কিছু চিন্তা করছিলাম। আর চিন্তা করতে করতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আর অন্যমনস্ক হওয়ার কারণে আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। চল, এখন যাওয়া যাক।

অশ্বারোহী কিশোরটির সঙ্গে আমি এগিয়ে চললাম। এগিয়ে যেতে যেতে ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা তোমার নাম কি?

কিশোরটি উত্তর দিল, আমার নাম রত্নবাহু।

রত্নবাহু? বাঃ, সুন্দর নাম তো! আমি ওর নামের তারিফ করলাম।

আমি ওর নামের তারিফ করায় ও খুব খুশি হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ও গড় গড়

করে বলে চলল, আমার বাবার নাম স্বর্গীয় বিশালবাহু। কিছুদিন হল উনি স্বর্গলাভ করেছেন। আর ওই যে বরকর্তা সেজে জুড়ি গাড়িতে বসে আছেন, ওঁর নাম মান্যবর বজ্রবাহু। বজ্রবাহু সূক্ষ্মদেহী। উনি আমার ঠাকুর্দা। আর যেহেতু তুমি আমাদের সম্মানীয় অতিথি, তাই তোমার দেখ-ভাল করার দায়িত্ব উনি আমাকে দিয়েছেন।

বুঝলাম, একজন সম্মানীয় অতিথির দেখ-ভাল-করার দায়িত্ব পেয়ে রত্নবাহু যথেষ্ট গর্বিত।

একটু থেমে রত্নবাহু আবার বলল, ওই যে দেখছ অশ্বারূঢ় বর, উনি আমার কাকা। ওঁর নাম বীরবাহু। আমাদের বাড়ি ঈশানপুর গ্রামে। আর সেখানে বিয়ে হবে, সেটা হল মারিগ্রাম। কনের নাম দেবারতি। আর কনের বাবার নাম বৃষবাহন।

আমি বেশ ধৈর্যশীল শ্রোতার মতো রত্নবাহুর সব কথা শুনছিলাম। এমন সময় প্রথঙ্গ পাল্টে রত্নবাহু আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা কাকু বল তো, আমি কী খুব বেশি কথা বলছি?

আমি উত্তর দিলাম, কই না তো! এ আর এমন বেশি কথা কি! এমন তো সবাই বলে।

অথচ দেখ, আমার ঠাকুর্দার ধারণা আমি খুব বেশি কথা বলি। আমি জানি, এখান থেকে ফিরে গেলেই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কীরে রত্নবাহু, ওখানে যেয়ে বেশি বকবক করিস নি তো?

যাক, আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার কোন অসুবিধা হলে আমাকে বোলো।

আমি বললাম, আচ্ছা।

রত্নবাহু দ্রুত ওর ঠাকুর্দার জুড়ি গাড়ির দিকে ছুটে গেল। আমাকে সংশয়ে ফেলে দিয়ে, আমাকে ধন্দে ফেলে দিয়ে ও ছুটে চলে গেল।

আচ্ছা, রত্নবাহু বলে গেল, ওর ঠাকুর্দার নাম বজ্রবাহু সূক্ষ্মদেহী। তাহলে কী উনি সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করছেন? এঁরা সবাই কী সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করছেন?

মৃত্যুর পরে মানুষ সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করে। যাকে বলা হয় লিঙ্গদেহ। আর তা যদি হয়, তবে আমি সঠিক দলের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছি। এটা ভূতের বিয়ের শোভাযাত্রা বটে।

কিন্তু তবুও যে একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। সংশয় থেকেই যায়। ধন্দ থেকেই যায়। কারণ, রত্নবাহু বলল, ওর বাবার নাম স্বর্গীয় বিশালবাহু। অর্থাৎ ওর বাবা স্বর্গলাভ করেছেন। অর্থাৎ তিনি মারা গেছেন। 'কিন্তুটা' এখানেই। সংশয় ও এখানেই। ধন্দের কারণও এটাই।

মানুষ মরার পরে ভূত হয়। অবশ্য ভূত হতেও তার অনেকটা সময় লাগে। আবার মানুষেরও তো স্তর ভেদ আছে। মৃত্যুরও তো প্রকার ভেদ আছে। যারা নিম্নস্তরের মানুষ, অথবা যারা আত্মহননকারী, মৃত্যুর পরে তারা বহুদিন ধরে মোহগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ তারা যে মারা গেছে, সেই জ্ঞান হতেও তাদের কয়েক বছর

সময় লেগে যায়। ভূত হওয়ার ব্যাপারটা ঘটে তারও পরে। তবে যেন তেন প্রকারে একবার ভূত হতে পারলে তার আর কোন চিন্তা থাকে না। সে তখন দিব্যি হেসে খেলে ভেসে বেড়াতে পারে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তখন আর অবাধ গতি। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, একবার মরে ভূত হতে পারলে তার আর দ্বিতীয় বার মরার ভয় থাকে না। এটাই হল তার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট। অথচ রত্নবাহু বলে গেল, তার বাবা স্বর্গলাভ করেছেন। অর্থাৎ তিনি মারা গেছেন। তাহলে? এনারা যদি সব কাকার সেই তেনারাই হবেন তাহলে রত্নবাহুর বাবা দ্বিতীয় বার মারা গেলেন কেমন করে? না, সংশয় কাটল না! ধন্দ কাটল না! 'কিন্তু'টা থেকেই গেল!

আর যে পরিবেশে, যে পরিস্থিতিতে আমি এদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি, তাতে মনের সংশয় কাটানোর, ধন্দ কাটানোর কোন পথও তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কেননা, আমার মনের সংশয় কাটানোর জন্য, ধন্দ কাটানোর জন্য আমি তো আর এদের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না যে হ্যাঁগো, তোমরা কি সব ভূত? অথবা, হ্যাঁগো, এটা কি ভূতের বিয়ের শোভাযাত্রা?

এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। কেমন যেন অর্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি এগিয়ে চলছিলাম। তবে কতক্ষণ যে আমি এইভাবে এগিয়ে চলেছিলাম, তা জানি না। এক সময় বাজনদারদের অপূর্ব সুরমুর্ছনা কানে যেতেই আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। আমি সামনের দিকে তাকালাম। এবং সামনের দিকে তাকিয়েই আমি যা দেখলাম তাতে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

খানিকক্ষণ আগে এরা আমাকে সাহেব-ভূত ভেবে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন আমি তুফানের পিঠে বসে, মাটি থেকে ত্রিশ ডিগ্রি উপরে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লাম। কি দেখলাম? বলছি।

আমি দেখলাম, আমার সম্মুখের সেই ছয়-সাত খানা জুড়ি গাড়ি বরযাত্রী সমেত অবলীলাক্রমে শূন্যে ভেসে এগিয়ে চলেছে। জুড়িগাড়ির সম্মুখের সেই কুড়ি-পঁচিশ জন যুবক মহানন্দে নাচতে নাচতে ভাসমান অবস্থায় এগিয়ে যাচ্ছে। আরও একটু এগিয়ে বাজনদারেরা, আলোকবহনকারীরা এবং অশ্বারূঢ় বরও সেই একই ভাবে শূন্যে ভেসে এগিয়ে চলেছে। আর শূন্যে ভেসে চলা ওই অলৌকিক শোভাযাত্রার উজ্জ্বল আলো কুযাশায় প্রতিহত হয়ে এক স্বপ্নময় আবর্ত সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। আরো দেখলাম, নিশুতিরাতের এই অতি উজ্জ্বল শোভাযাত্রায় একমাত্র আমিই শুধু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এগিয়ে চলেছি। আর কারোরই মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ওরা সবাই শূন্যে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে। গোটা শোভাযাত্রী দলটাই শূন্যে ভেসে এগিয়ে চলেছে।

অবাক বিস্ময়ে আমিও তখন সেই মাটি থেকে ত্রিশ ডিগ্রি উপরের অতি ভাস্বর শোভাযাত্রার দিকে চেয়ে এগিয়ে চললাম। একটা ঘোরের মধ্যে আমি এগিয়ে

চললাম। অর্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি এগিয়ে চললাম। এবং ওই অর্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, আচ্ছা, শূন্যে ভাসমান ওই অতিভাস্বর শোভাযাত্রা কী বাস্তবে সম্ভব? নাকি অমন শোভাযাত্রা কোন ভূত-প্রেতের সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যায়? না! তা মানা যায় না! এমনটা ভাবা যায় না! এমনটা ভাবার কোন কারণ থাকতে পারে না! তাহলে?

তাহলে কী আমি স্বপ্ন দেখছি? হতে পারে। হওয়া সম্ভব। কারণ, রটন্তী অপেরার কৃষ্ণা এমন স্বপ্ন অনেকবার দেখেছে। সে স্বপ্নলোকের স্বপ্ন দেখেছে। সুদূরের স্বপ্নলোকের স্বপ্ন দেখেছে। সেখানে নাকি এমন সব অলৌকিক ঘটনা আকছার ঘটে।

যা ভেবেছি তাই। ঠিক তাই। অনেকদিন পরে হঠাৎ আমি আজ কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কৃষ্ণা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু তার চেয়েও অধিক সুন্দর সুদূরের ওই স্বপ্নলোক সেথায় সৃষ্টি হয়েছে এক স্বপ্নালু পরিবেশ। আর সেই স্বপ্নালু পরিবেশে ঘটে কত রকমের সব অলৌকিক ঘটনা।

কৃষ্ণার ফিসফিসানি শুনে ওকে আমি আমার আশপাশে খুঁজলাম। ক্ষণিকের তরে ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু ওকে আমি খুঁজে পেলাম না। তবে আমার বাম কাঁধে আমি ওর হাতের স্পর্শ পেলাম। ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে আমি অভিভূত হলাম। আমি বিহ্বল হলাম। অস্ফুট স্বরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কৃষ্ণা, তুমি কোথায়? কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না।

জানি না কতক্ষণ আমি ওইভাবে এগিয়ে চলেছিলাম। তবে এক সময় আমার মনে হল, বহুদূর থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে। বলছে কাকু, ও কাকু, ঘোড়া থেকে নেমে এসো। আমরা মারিগ্রামে পৌঁছে গেছি।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা ওই ডাক শুনতে শুনতে এক সময় আমার ঘোর কেটে গেল। আমার সংজ্ঞা ফিরে এল। এবং আমি চেয়ে দেখলাম, দূরে নয়, আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রত্নবাহু। সেই আমাকে ডাকছে। আমাকে সে ঘোড়া থেকে নেমে আসতে বলছে।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। তারপর রত্নবাহুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

রত্নবাহু বলল, কাকু, তুমি আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলে। মনে হয়, আবার তুমি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলে, তাই না? আমি সেই কখন থেকে তোমাকে ডাকছি। কতবার বলছি যে আমরা মারিগ্রামে পৌঁছে গেছি। অথচ তুমি কোন সাড়াই দিচ্ছ না। কী ব্যাপার বল তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ রত্নবাহু, আমি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলাম। কিন্তু চিন্তা করেও কোন থেই পাচ্ছিলাম না। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। আর তাই তোমার ডাক আমি শুনতে পাইনি।

আমার কথা শুনে রত্নবাহু বলল, তা তুমি চিন্তা করতে গেলে কেন? আজকে আনন্দের দিন, আনন্দ কর। চিন্তা করবে কেন?

দেখ কাকু, আজকের রাতের জন্য তুমি আমাদের অতিথি হয়ে এসেছ। আর আমার ঠাকুর্দা তোমার দেখ-ভাল করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। তাই তোমার কোন অসুবিধা হলে তা আমাকে বল।

না, না, আমার কোন অসুবিধা হয়নি। তবে আজকের এই কুহেলিকাময় সমানিশায় আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এই একটু আগে আমি শূন্যে ভাসমান এক অলৌকিক শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করলাম। যা নাকি বাস্তবে সম্ভব নয়। যা নাকি শুধু স্বপ্নে ঘটতে পারে। স্বপ্নলোকে ঘটতে পারে। কিন্তু বাস্তবে নয়। অথচ—।

আমার কথায় বাধা দিয়ে রত্নবাহু বলল, শোন কাকু। একটু আগে তুমি যে শূন্যে ভাসমান এক অলৌকিক শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছ তা আসলে স্বপ্নলোকেই ঘটেছে। তবে সেই স্বপ্নলোক সুদূরের কোন স্বপ্নলোক নয়। সেই স্বপ্নলোক আসলে আমাদের সৃষ্ট এক চলমান স্বপ্নলোক। আমাদের সৃষ্ট এক মোহময় স্বপ্নলোক। যার বিরাট পরিধির মধ্যে তুমি রয়েছ, আমি রয়েছি, আমরা সকলেই রয়েছি।

রত্নবাহুর কথা আমার বোধগম্য হল না। তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি ওর মুখের পানে চাইলাম। রত্নবাহু আমার মনোভাব বুঝতে পারল। এবং আমাকে ও জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না, তাই তো?

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ রত্নবাহু, তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। তোমাদের সৃষ্ট চলমান স্বপ্নলোক, তোমাদের সৃষ্ট মোহময় স্বপ্নলোকের ব্যাপারটা আমার কাছে এক হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। আসলে কী ব্যাপার বল তো?

রত্নবাহু তখন মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্করের মতো মুখ করে বলল, একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ, কাকু! আজকের এই আনন্দের দিনে প্রকৃতি কেমন অকৃপণ হস্তে গাঢ় তমসা বর্ষণ করে চলেছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে পৌষের কুহকিনী কুয়াশা। বড়ই অনুকূল পরিবেশ। আমরা আমাদের দুরূহ কুহক বিদ্যা এবং এই অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করেছি এই চলমান স্বপ্নলোক, এই মোহময় স্বপ্নলোক। আজকের এই আনন্দের দিনে সকলের আনন্দ বর্ধনের জন্যই আমাদের এই মনোরম সৃষ্টি।

রত্নবাহুর কথা শুনে আমি অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আজকের এই অলৌকিক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোনজন সেই দুরূহ কুহক বিদ্যার অধিকারী? কোনজন এই অনুকূল পরিবেশ এবং তাঁর অধিগত বিদ্যার সাহায্যে এমন এক মোহময় স্বপ্নলোক সৃষ্টিতে পারঙ্গম? বরকর্তা বজ্রবাহু সূক্ষ্মদেহী কী?

রত্নবাহুর কথায় আমার চিন্তাজাল ছিন্ন হল। ওঃ কাকু! তুমি আবার চিন্তা করছ! বললাম না, আমরা মারিগ্রামে পৌঁছে গেছি। ওই দেখ, সম্মুখেই আলোক মালায়

সজ্জিত বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা। ওটিই আমাদের গন্তব্যস্থল। আজকের এই শুভ অমাবস্যা তিথির নিশীথ রাত্রে ওখানেই সেই অভিলাষিত শুভ বিবাহ নিষ্পন্ন হবে তাই চিন্তা নয়। চল আমরা এগিয়ে যাই। আজকের এই আনন্দের দিনে চল আমরা আমাদের মোহময় স্বপ্নলোকের সকল প্রকার আনন্দ উপভোগ করি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ রত্নবাহু, চল আমরা এগিয়ে যাই। চল আমরা মোহময় স্বপ্নলোকে আনন্দগুলো ভালভাবে উপভোগ করি।

অতঃপর আমরা এগিয়ে গেলাম। এবং দেখলাম, শুধু সেই বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা নয়, মারিগ্রামের ছোট বড় সব বাড়িই আলোক মালায় সজ্জিত হয়েছে চারদিকেই খুশির আমেজ।

আমরা আরো একটু এগিয়ে গেলাম। এবং সেই সুসজ্জিত দ্বিতল অট্টালিকার কাছাকাছি যেতেই কনে পক্ষের বাজনদারেরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল তখন দু'পক্ষের বাজনদারদের অপূর্ব সুরসৃষ্টিতে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হল আর সেই আনন্দময় পরিবেশকে সার্থক করতে, ঝকঝকে পোষাক পরিহিত কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে এসে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে ওরা শূন্যে ভাসল, আবার মাটিতে নেমে এল, আবার শূন্যে ভাসল। ওদের উৎসাহ দিতে বড়রাও ওদের সঙ্গ দিল। তারা নাচতে নাচতে শূন্যে ভাসল, আবার মাটিতে নেমে এল। শেষে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমিও ওদের সঙ্গে নাচলাম। আমিও ওদের সঙ্গে আনন্দে ভাসলাম। অবশ্য ওদের মতো আক্ষরিক অর্থে ভাসতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সেই সুসজ্জিত দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে যেয়ে হাজির হলাম। তখন কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা এসে বর এবং বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। একজন সহিস এসে আমার হাত থেকে তুফানের লাগাম চেয়ে নিয়ে ওকে পাশে নিয়ে গেল। আমি একা চুপ করে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু রত্নবাহু কোথায়? যার 'পরে আমার দেখ-ভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে কোথায়? না, রত্নবাহুকে আমি খুঁজে পেলাম না। আমি চুপ করে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর বাড়ির ভেতরে হাসি ঠাট্টা আনন্দ উল্লাস চলতে থাকল।

বাড়ির বাইরে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে আমি বিমর্ষ বোধ করতে লাগলাম। এমন সময় একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। পরে চন্দ্রাতপ শোভিত বিশাল অঙ্গনের একপাশে পাতা একখানা সুসজ্জিত খাট দেখিয়ে আমাকে উনি বসতে বললেন। আমি খাটের 'পরে বসলাম। আমার বন্দুকটা আমি খাটের উপর নামিয়ে রাখলাম।

তখন সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি আমাকে বললেন, আমার নাম বৃষবাহন সূক্ষ্মদেহী। আ

কনের পিতা। তুমি আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় আমরা খুব খুশি হয়েছি।

তারপর উনি বললেন, দেখ, বিয়ের ব্যাপারে আমি ব্যস্ত থাকব। সে কারণে তোমার দেখা-শোনা করার ভার আমি আমার কনিষ্ঠাকন্যা দেবযানীকে দিয়েছি। ও এখুনি এসে পড়বে। কিছু মনে কোরো না। আমি এখন আসছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আসুন।

কনের বাবা চলে গেলেন। আমি চুপ করে খাটের 'পরে বসে রইলাম।

একটু পরে খিল খিল হাসির শব্দে আমি মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম, রত্নবাহুর সঙ্গে দু'জন যুবতী হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

দু'জন যুবতীর মধ্যে একজন অবিবাহিতা এবং সুন্দরী। অন্যজন বিবাহিতা এবং ভয়ঙ্কর সুন্দরী।

প্রথমজন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। দ্বিতীয়জন ঝকঝকে ফর্সা। প্রথমজন দশজনের সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারেন। দ্বিতীয়জন শতজনের সঙ্গে মিশে গেলেও তন্মধ্যে তিনি অনন্যাই রয়ে যাবেন। প্রথমজনের অঙ্গে হাল্কা গোলাপী শাড়ি। দ্বিতীয়জন নীল বসনা। তবে আবরনে দু'জন ভিন্ন হলেও আভরণে অভিন্ন। দু'জনাই ফুল সাজে সজ্জিতা। ফুল ভারে ভারাক্রান্তা। ওরা দু'জন হাসিমুখে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে টাটকা ফুলের মিষ্টি গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে উঠল।

রত্নবাহু সেই অবিবাহিতা সুন্দরীকে দেখিয়ে আমাকে বলল, এঁর নাম দেবযানী। উনি কনের ছোটবোন। আর সেই বিবাহিতা এবং ভয়ঙ্কর সুন্দরীকে দেখিয়ে বলল, এঁর নাম দেবলা, ওঁর বান্ধবী।

ওঁরা দু'জন কিঞ্চিৎ চাতুর্য মিশ্রিত হাসি হেসে আমার মুখের পানে চাইলেন এবং হাত তুলে নমস্কার করলেন।

আমি ওঁদের দু'জনের মুখের পানে চেয়ে প্রতি নমস্কার করলাম। এবং দেখলাম, প্রথমজনের চাহনি শান্ত, কোমল এবং মায়া ভরা। কিন্তু দ্বিতীয়জনের চাহনিতে সর্বনাশের নেশা। দু'জনেই আকর্ষণীয়া তবে প্রথম জনের আকর্ষণ প্রতিরোধযোগ্য হলেও দ্বিতীয় জনের তা অপ্রতিরোধ্য।

রত্নবাহু এবপর আমার পরিচয় দিতে উদ্যত হল। এঁর নাম—।

দেবলা রত্নবাহুকে বাধা দিয়ে বললেন, ওঁর পরিচয় আমরা জানি। উনি হতোমপুরের দীপক, ওরফে দীপু, ওরফে দীপ। উনি আমাদের একরাত্রের অতিথি।

রত্নবাহু বলল, কাকু, তোমরা তাহলে কথা বল। বরকর্তা আমাকে তলব করেছেন। আমি চললাম। এখন থেকে তোমার দেখ-ভালের দায়িত্ব এঁদের।

রত্নবাহু চলে গেল। আমি চুপ করে খাটের ওপর বসে রইলাম। কনের ছোটবোনকে দেখে আমার সেদিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। অমি চিন্তান্বিত হলাম। আমি চিন্তান্বিত হলাম, কিন্তু ভয় পেলাম না। যেহেতু ভয় পেলাম না, তাই সেদিনের

মতো আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হল না। আর আমি প্রাণ নিয়ে পালানোর চেষ্টাও করলাম না। আসলে আমি পালাতে পারলাম না। কারণ?

কারণ, দেবযানী সুন্দরী। দেবযানী শান্ত। দেবযানীর চোখ দু'টি মায়া ভরা। ও চোখ মানুষকে আকর্ষণ করে। কাছে টানে। পালাতে দেয় না।

দেবলার কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা ভাই, তোমাদের হুতোমপুরে বুঝি শুধু হুতোমপেঁচাই বাস করে?

আমি উত্তর দিলাম, না, না, তা কেন! হুতোম পেঁচা, কাল পেঁচা, কোটর পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা, সব পেঁচাই আছে তো!

আছে বুঝি? অথচ তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের গ্রামে শুধু হুতোম পেঁচাই বাস করে।

যা! কি সব বাজে কথা বলছিস, দেবা! উনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি!

তাতে কি হয়েছে। তোর সম্মানীয় অতিথি আমার দেবর। গ্রাম সুবাদে, বুঝেছিস? তো দেবরের সঙ্গে একটু রঙ্গ-তামাসা করব না?

তারপর উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমার শ্বশুরবাড়ি তোমাদের লাগোয়া গ্রামে, জারুল গ্রামে। গ্রাম সবাদে তাই তুমি আমার দেবর, আমি তোমার বৌঠান।

সে কী! জানি নে তো! তা তোমার বরের নাম কী, বৌঠান?

পাশ থেকে দেবযানী বলল, মেঘনাদ।

মেঘনাদ! কিন্তু জারুল গ্রামের মেঘনাদদাদা তো গতবছর এক ফুলপরীকে বিয়ে করেছে। আশপাশের সাত-সাতটা গাঁয়ের মানুষ তা জানে।

কেন, আমাকে দেখে কি তোমার ফুলপরী বলে মনে হচ্ছে না?

না বৌঠান, তা নয়। দেখ, আমি কোনদিন ফুলপরী দেখিনি। তবে তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি ফুলপরীর চেয়েও সুন্দরী। তোমার রূপের তুলনা হয় না।

তাই বুঝি? তা তুমি শুধু আমাকেই সুন্দরী দেখলে, ঠাকুর পো? আমার বান্ধবী সুন্দরী নয়? ওকে তোমার মনে ধরেনি? যদি মনে ধরে থাকে তো বল, আগামী লগ্নেই—।

দেবলাকে ঠেলা দিয়ে দেবযানী বলল, আঃ দেবা! তুই বড্ড ঠোঁট কাটা! তোর মুখে কিছু আটকায় না।

তারপর দেবযানী বলল, দেখ সই, তোর দেবরের চেহারাটা পুরুষোচিত হলেও বাচ্চাদের মতো ভয় তরাসে। একটু আগে মোহময় স্বপ্নলোকের ধাঁধায় পড়ে বেচার মূর্ছা যেতে বসেছিল। তো অমন ভয়তরাসে মানুষকে কে পছন্দ করবে বল?

এমন সময় আঙিনার শেষ প্রান্ত হতে একজন বয়স্কা মহিলা ডাক দিলেন, ওরে দেবযানী, দেবলা, তোরা সব এদিকে আয়। তোদের অনেক কাজ রয়েছে।

দেবযানী বলল, মা ডাকছেন। একটু বোস, অতিথি। আমরা কাজ সেরেই ফিরে আসছি।

ওরা দু'জন চলে গেল। আমি খাটের ওপর বসে ওদের কথাই ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, কিন্তু অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেলাম না। তখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আশপাশের সাত-সাতটা গাঁয়ের মানুষ জানে যে গতবছর মেঘনাদ দাদা এক ফুলপরীকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছে। আর এখন আমি জানতে পারলাম যে সেই ফুলপরী আসলে এই দেবলা বৌঠান। তা এই দেবলা বৌঠান যদি ফুলপরীই হবে তাহলে বৌঠানের ডানা নেই কেন?

প্রশ্ন শুনে মন বলল, ডানা নেই, কারণ এরা কেউ ফুলপরী নয়। তবে হ্যাঁ, এরা যা ভেল্কি জানে তাতে ডানা গজানোটা এদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। তোমার বৌঠান চাইলে ওটা যে কোন সময় গজাতে পারে।

আচ্ছা বেশ। ধর, এরা যদি ফুলপরী না হয়, তাহলে এরা কী? এদের পরিচয় কী?

ভূত। এরা সবাই ভূত। যদি ভালয় ভালয় প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পার, তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, এরা সবাই ভূত। একেবারে নির্ভেজাল ভূত!

তো মহার্ঘ খাটে বসে আমি আমার মনের সঙ্গে এদের ব্যাপার নিয়ে সলা-পরামর্শ করছিলাম। এমন সময় আমার পাশ থেকে কে যেন খস খসে গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম দীপক বুঝি?

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, প্রশ্নকর্তা একজন অদ্ভুত দর্শন ব্যক্তি। এক কথায় যাকে দিগ্‌ধেড়েঙ্গা বলা হয়।

লোকটি অস্বাভাবিক লম্বা। আবলুস কাঠের মতন তার গায়ের রঙ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার চুলে জটা ধরেছে। সামনের দাঁতগুলো উঁচু। লোকটির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে চোখ পলকহীন। মুখ অভিব্যক্তিহীন। আমাকে নিরুত্তর দেখে সে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম দীপক বুঝি?

আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমার নাম দীপক।

লোকটি বলল, বা, বেশ সুন্দর নাম! আর তোমার চেহারাটাও বেশ সুন্দর। ঠিক যেন পাকা মাকালফল!

আমার চেহারার প্রশংসায় আমি খুশি হতে পারলাম না। কারণ, পাকা মাকাল ফলের ভেতরটা প্রশংসা-যোগ্য নয়।

তারপর লোকটি বলল, আমার নাম বিরিঞ্চি বোধ। আমি বিলের ধারের জঙ্গলে থাকি। তা তোমার কাছে আমি কেন এসেছি জান?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

বিরিঞ্চি বোধ বলল, তোমাকে সাবধান করতে। শোন। একটু আগে যে মেয়ে দু'টি তোমার কাছে এসেছিল, ওরা ভাল নয়। বিশেষ করে ওই বিবাহিতা মেয়েটি তো একটি কুহকিনী। মিথ্যেরূপের মোহবিস্তার করে ও তোমাদের সমাজের এক সুন্দর যুবককে বিয়ে করেছে। যুবকটির নাম মেঘনাদ। জারুল গ্রামে বাস।

একটু থেমে বিরিঞ্চি বোধ বলল, ওই কুহকিনীর নাম দেবলা। ও আমাদের সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর ওই জারুল গ্রামের মেঘনাদকেও ও ঠকিয়েছে।

একটু থেমে বিরিঞ্চি বোধ আবার বলল, পুরুষ হোক কিংবা নারী, এদের কাউকে তুমি বিশ্বাস কোরো না। বিশ্বাস করলেই ঠকবে। কারণ, এদের যে রঙ রূপ, ঠাটবাট দেখছ, সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। ব্যাপারটা তুমি পরে নিজেই বুঝতে পারবে। আর তুমি এও বুঝতে পারবে সে এই বিরিঞ্চি বোধ তোমাকে মিথ্যে কথা বলেনি।

আর শোন। ওই কুহকিনীর সঙ্গে যে অবিবাহিতা মেয়েটি এসেছিল, ওর নাম দেবযানী। ওর চোখ দু'টি মায়াভরা। আর ওর ওই মায়াভরা চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে। তুমি ভুলেও যেন ওর চোখে চোখ রেখ না। একবার ওর চোখে চোখ রেখেছ কি তুমি সম্মোহিত হয়ে পড়বে। তুমি মোহ প্রাপ্ত হবে। বিমুগ্ধ হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এবং তখন থেকে তোমাকে ওই মায়াবিনী দেবযানীর ইচ্ছাতেই চলতে হবে।

তারপর বিরিঞ্চি বোধ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোমরা বিয়ে কর কেন?

আমি উত্তর দিলাম, সন্তান লাভের জন্য। পুত্র লাভের জন্য।

ঠিক বলেছ। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। অথচ ওই দেবলা কিন্তু মেঘনাদকে কোন সন্তান দিতে পারবে না। ওই কুহকিনী কিন্তু স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার গড়তে পারবে না। স্বামীর সঙ্গে প্রেমে কামে সেই সংসারকে ও সুখ স্বর্গে পরিনত করতে পারবে না। শুধু স্বামীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেই ও জীবন কাটিয়ে দেবে।

তাই তোমাকে আমি সাবধান করতে এসেছি, তুমি যেন মেঘনাদের মতো কোন ভুল কোরো না।

এ ছাড়াও তোমাকে আমি আরো একটা ব্যাপারে সাবধান করতে চাই। কারণ তুমি একজন ভাল মানুষ। আর তোমাকে আমার ভালও লেগেছে। তাই তোমাকে সাবধান করাটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

দেখ, এই মারি গ্রামের কয়েকটি যুবক মাঝে মাঝে বড় হিংস্র হয়ে ওঠে। আর তখন তারা বড় নিষ্ঠুর কর্মে লিপ্ত হয়। তাদের সেই নিষ্ঠুর কর্ম এই মারি গ্রাম সমাজের পক্ষে কলঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে।

এই কিছুদিন আগের কথা বলছি। একবার দু'জন পথহারা পথিক অমাবস্যার অন্ধকারে এই মারি গ্রামে এসে পড়েছিল। আর সুযোগ বুঝে ক'জন হিংস্র যুবক ওই পথিকদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ওই পথিকদ্বয়কে তারা বিলের ধারের থক থকে কাদায় জ্যান্ত পুঁতে দিয়েছিল। এবং নিজেদের নিষ্ঠুর কেরামতি জাহির করার জন্য ওই পথিকদ্বয়ের চারটি ঠ্যাং তারা কাদার ওপরে খাড়া করে রেখেছিল। আর তা দেখতে পরদিন সকালে বিলের ধারে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল।

একটু থেমে বিরিঞ্চি বোধ বলল, অবশ্য তার জন্য তোমার ভয় পাওয়ার কোন

ারণ নেই। কারণ তুমি এদের অতিথি। এই মারি গ্রামের অতিথি। আর এরা কানদিন কোন অতিথির অনিষ্ট করে না। তাই আজকের রাতের জন্য তুমি সম্পূর্ণ রাপদ। তবে সকাল হতেই তুমি এই মারিগ্রাম ছেড়ে চলে যেও। আর কোনদিন মি এদিকে এসো না। কারণ এদিকে আসা মানেই প্রানের ঝুঁকি নেওয়া। এদিকে াসা মানেই ওই হিংস্র যুবকগুলোর হাতে খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভোগা। কথা 'টি মনে রেখো।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বিরিঞ্চি বোধ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমার চেহারাটা ক খুবই খারাপ?

আমি উত্তর দিলাম, কই, না তো! বরং তোমার নামের সঙ্গে চেহারাটার বেশ াল আছে।

আমার উত্তর শুনে বিরিঞ্চি বোধ খুশি হল। এবং আমাকে ও বলল, তুমি ভাল হলে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তাই আমার নামের সঙ্গে চেহারার মিলটা তুমি ঠিক ক ধরতে পেরেছ। আর এতক্ষনে তুমি এও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে এই বিরিঞ্চি বোধ কেমন স্পষ্ট ভাষী।

আসলে আমি কারো মন রেখে কথা বলতে জানি না। নিজের বিচার-বুদ্ধি মতো া ভাল বুঝি তাই বলি। আর এটাই আমার কাল হয়েছে। আমার এই স্পষ্ট কথার ন্যই এরা আমাকে এই মারিগ্রাম সমাজ হতে বহিষ্কার করেছে। এখন আমি বিলের ারের জঙ্গলে বাস করি। অথচ আমিও এদেরই একজন। এই মারিগ্রাম সমাজেরই কজন।

একটু থেমে বিরিঞ্চি বোধ আবার বলল, জান, এরা আমাকে শেয়াল কুকুরের তো তাড়া করে। আমার এই চেহারার জন্য এরা টিটকারি মারে। বিদ্রূপ করে। এরা ামাকে কানা বিরিঞ্চি বলে। এরা আমাকে বিরিঞ্চি ভূত বলে।

তারপর ধরা গলায় বিরিঞ্চি বোধ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দীপক, তুমি ক ঠিক বল তো, আমার চেহারাটা কি সত্যিই ভূতের মতো? আমি কি ভূত?

বিরিঞ্চি বোধের ওই করুণ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিতে পারলাম না আমি। ওর ই করুন জিজ্ঞাসায় আমি ব্যথা পেলাম। আমি ব্যথিত হলাম। আমি হাঁ করে ওর াথা-ভরা মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

এইভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর হঠাৎই শামিয়ানার শেষপ্রান্তে খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চি বোধ ত্রস্তপদে ছুটে যেয়ে ন্ধকারে মিলে গেল। আমি চেয়ে দেখলাম, দেবযানী এবং দেবলা বৌঠান খিলখিল রে হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

ওরা দু'জন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর ভুরু কুঁচকে দেবলা বৌঠান ামাকে জিজ্ঞাসা করল, ওই কানা বিরিঞ্চি তোমাকে কি বলছিল গো?

আমি উত্তর দিলাম, তেমন কিছু নয়। বিরিঞ্চি বোধ তোমাদের দু'জনের রূপের

ব্যাখ্যা করছিল। কিন্তু তার জন্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ অমন ইচ্ছে তো আমারও হচ্ছে। তবে নারীর রূপ-ব্যাখাটা আমার আবার ভাল আসে না। তাই দু'চোখ ভরে দেখেও চুপ করে বসে রয়েছি।

রঙ্গ কোরো না, ঠাকুরপো। ওই বিরিঞ্চি বোধকে তুমি চেন না। কানাটা মহাপাজী আমার বিয়েতে ও বাগড়া দিয়েছিল। আমাদের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে ও প্রশ্ন তুলেছিল। আমাদের পরিবারের সকলকে ও সমাজ থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

একটু থেমে বৌঠান বলল, ওই শয়তানটার রূপ ব্যাখ্যা যে কতটা নির্মম হতে পারে তা আমরা জানি, ঠাকুরপো। ও তোমাকে নিশ্চয় বলেছে যে মিথ্যে রূপের ফাঁদ পেতে আর নানান ছলাকলা করে তোমাদের মতো প্রিয়দর্শন যুবাদের আমরা বশে আনি। আর তারপর তোমরা আমাদের প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাক, এইসব।

আসলে ওই নচ্ছারটার চরিত্রই হল পরচর্চা, পরনিন্দা করা। ঝগড়া-বিবাদ করা ওই নিয়েই ওর দিন কাটে।

আর ওই কানাটা কতবড় দুর্মুখ জান? আমাদের সম্বন্ধে ও কেমন কু-গেয়ে বেড়ায় জান? ও গেয়ে বেড়ায়, অদূর ভবিষ্যতে আমরা নাকি এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমরা ইতিহাস হয়ে যাব। আমাদের কথা লেখা থাকবে শুধু মানুষের পুঁথিপত্রে।

এইসব নানান কারণে আর ওর ওই কুচুটে স্বভাবের জন্য আমরা ওকে সমাজ হতে বহিষ্কার করেছি। ও এখন বিলের ধারের জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছে। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানে ও ঠিক এসে হাজির হয় এবং পেট ভরে খেয়ে যায়। আবার খেতে না দিলে ও কোন্দল করে। কতবড় ঠ্যাটা বোঝ!

সব-ই তো বুঝলাম, বৌঠান। আর তোমাদের শ্রীমুখ হতে শুনলাম ও অনেক কিছু। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার মনে দুঃখ রয়ে গেল। মেঘনাদদাদার সঙ্গে তোমার প্রেমের গল্পটা আমার শোনা হল না!

সে গল্প কি আর আমার মুখ থেকে শুনতে তোমার ভাল লাগবে, ভাই। ওটা তুমি একদিন দেবযানীর মুখ থেকে শুনে নিও। আজ সময় বড় কম।

পাশ থেকে দেবযানী বলল, হ্যাঁ, আজ সময় বড় কম। ও গল্প তুমি পরে শুনো আমি তোমায় শোনাব। এখন ওঠ। ছাঁদনাতলায় চল। লগ্ন বয়ে যায়।

হঠাৎ ছাঁদনাতলায় যাওয়ার আহ্বান শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তবু যতটা সম্ভব অবিচলিত কণ্ঠে আমি দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, আমাকে ছাঁদনা তলায় যেতে হবে কেন?

ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তাই কথা ক'টি বলতে যেয়ে আমার গলা কেঁপে গেল আর তা বুঝতে পেরে দেবযানী এবং বৌঠান খিল খিল করে হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে আমি মাথা নীচু করলাম।

আমার অবস্থা দেখে বৌঠান বলল, তুমি কেমন পুরুষমানুষ, ভাই? আজকের এই অমানিশার শুভলগ্নে একজন সুন্দরী যুবতী তোমাকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যেতে চাইছে। আর তা শুনে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ! ভয়ে তোমার গলা কেঁপে উঠছে! এ যে বড় লজ্জার কথা, ভাই। তোমাদের জারুল গ্রামের মানুষটা যে আমাকে পাওয়ার জন্য একেবারে পাগল-পারা হয়েছিল!

একটু থেমে বৌঠান বলল, দেখ ভাই, বিরিঞ্চি বোধ তোমাকে যাই বলুক না কেন, জোর করে আমরা কাউকে প্রেমের ফাঁদে ফেলি না। যার ফাঁদে পড়ার ইচ্ছে হয়, সে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দেয়। জোর করতে হয় না।

দেবযানী আমাকে বলল, ওঠো, ছাঁদনাতলায় চল। বিয়ে দেখবে।

এবারে আমি হাঁপ ছাড়লাম।

* * *

বহু আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ের মূল অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু শেষ হল তড়িঘড়ি করে। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, পিতার কন্যা সম্প্রদান, বরকনের মালাবদল, কনেকে বরের সিঁদুর দান, সবই হল। কিন্তু সবই হল বড় তড়িঘড়ি করে। ভাবখানা এমন যেন সময় বড় কম। সময় বড় কম।

হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত তিনটে বাজে। বর-কনে ঘরে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ছাদে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেল। আমি ছাঁদনা তলা থেকে উঠে এসে খাটে বসলাম।

একটু পরে দেবযানী থালায় সাজানো কতকগুলো ফুলকো লুচি এনে আমার খাটের ওপরে নামিয়ে দিল। দেখলাম, থালার ওপর বাটিতে রয়েছে ছোলার ডাল, আলুর দম, পায়েস আর মিষ্টি। দেবযানীর সঙ্গে একপাত্র জল নিয়ে এসেছিল পরিচারিকা গোছের একটি মেয়ে। মেয়েটি জলের পাত্রটি খাটের ওপর নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দেবযানী আমাকে বলল, নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। রাত আর বেশি নেই।

আমি বললাম, বৌঠানকে নিয়ে এসো। খেতে খেতে সবাই মিলে গল্প করা যাক।

তোমার বৌঠানের এখন অনেক কাজ। ও আসতে পারবে না। তুমি চটপট খেয়ে নিয়ে এই খাটেই শুয়ে পড়। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। এখনও ঘরের কারো খাওয়া হয়নি।

তাহলে ওদের প্রেমের গল্পটা কবে শোনাবে?

সে তুমি শুনো একদিন। অন্য কোন দিন।

অন্য কোন দিন কেন? কাল সকালেই নয় কেন? বল তো কাল সকালটা এখানেই কাটিয়ে যাই।

তা যে হওয়ার নয়, অতিথি।

কেন হওয়ার নয়?

মুচকি হেসে দেবযানী বলল, সে তুমি কাল সকালেই বুঝতে পারবে।

শোন। ভোর হতেই এখান থেকে চলে যেও। একটুও দেরী কোরো না, বুঝলে?

আর যদি না যাই?

জিদ কোরো না। এটাই রীতি। তুমি আমাদের এক রাত্রের অতিথি হয়ে এসেছ। রাত পোহালেই চলে যাবে। এটাই নিয়ম।

দেবযানীর কথা আমাকে আঘাত করল। আমি মুখ নীচু করলাম।

দেবযানী বলল, রাগ কোরো না। আমি আমাদের রীতি-নীতির কথা বলেছি। আমাদের নিয়মের কথা বলেছি। তোমায় আঘাত দিতে চাইনি।

আমি কোন কথা বললাম না। দেবযানীর সুমুখে আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম। থালায় সাজানো গরম খাবার ঠাণ্ডা হতে থাকল।

দেবযানী আবার বলল, রাগ কোরো না। খাবারগুলো ঠাণ্ডা হচ্ছে। খেয়ে নাও।

তবুও আমি কোন কথা বললাম না। আগের মতোই আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

দেবযানী এবারে এগিয়ে এসে আমার খাটের ওপর বসল। তারপর আমার সামনা-সামনি বসে ও ফিসফিস করে বলল, আমার কথা শোন। মুখ তোল।

এবারে আমি মুখ তুললাম। মুখ তুলে আমি দেবযানীর মুখের পানে চাইলাম। ওর চোখে চোখ রাখলাম। ওর মায়াভরা চোখে চোখ রেখে আমি পুলকিত হলাম। ওর মায়া ভরা চোখে চোখ রেখে আমি শিহরিত হলাম। আর একই সঙ্গে আমার ইচ্ছাশক্তি একটু একটু করে নিষ্ক্রিয় হতে থাকল। একই সঙ্গে আমার বোধশক্তি একটু একটু করে হ্রাস পেতে থাকল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। আমার সারা শরীর ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নিজেকে ওই মায়াভরা চোখে হারিয়ে ফেললাম।

জানি না কতক্ষণ আমি দেবযানীর মায়াভরা চোখে চোখ রেখে বসেছিলাম। জানি না কতক্ষণের জন্য আমি ওই মায়াভরা চোখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তবে এক সময় আমার মনে হল কে যেন আমার শরীরটা ধরে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিল। আর ওই ঝাঁকুনিতেই আমার ঘোর কেটে গেল। আমার বোধশক্তি ফিরে এল। মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি আবার নিজেকে ফিরে পেলাম।

চেয়ে দেখলাম, দেবযানী আগের মতোই আমার সুমুখে বসে রয়েছে। আমার মুখের পানে চেয়ে ও মুচকি মুচকি হাসছে।

তারপর হাসি মাখা মুখে দেবযানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আর কতক্ষণ আমাকে এইভাবে বসিয়ে রাখবে? এবারে খেয়ে নাও। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। রাত যে শেষ হয়ে এল!

আমি থালা থেকে এক টুকরো লুচি তুলে নিয়ে মুখে দিলাম। দেবযানী খাট থেকে

নমে আমার সম্মুখে দাঁড়াল। তারপর বলল, আগামী অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে, নীল াযরের শান বাঁধানো ঘাটে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। ওখানেই আমাদের দখা হবে।

কথার মধ্যেই ওপাশের দাওয়া থেকে কে যেন ডাক ছাড়ল, ওরে দেবযানী, াড়াতাড়ি আয় এদিকে। সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে।

মা ডাকছেন। আমি যাই। দেবযানী দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা াগিয়ে যেয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত ও আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। ারপর ও চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে মন নিজে থেকেই মুখ খুলল। আমাকে ও জিজ্ঞাসা করল, দবযানী তোমার মুখের পানে চেয়ে মনে মনে কি বলছিল জান?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছিল?

মন উত্তর দিল, দেবযানী মনে মনে বলছিল, দেখ, জোর করে আমরা কাউকে প্রমের ফাঁদে ফেলি না। যার ফাঁদে পড়ার ইচ্ছে হয় সে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দেয়। জার করতে হয় না।

*

পরদিন প্রভাতে আকাশে উড়ে-যাওয়া এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখির ওয়াক্ ওয়াক্ াকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম, তখনও পৌষের হাল্কা য়াশায় চতুর্দিক ছেয়ে রয়েছে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম, আমি উন্মুক্ত াকাশের নীচে শুয়ে রয়েছি। গতরাত্রের সেই আঙিনা-জোড়া শামিয়ানা অন্তর্হিত য়েছে।

আমি উঠে খাটের ওপর বসলাম। দেখলাম, গতরাত্রে যে বহুমূল্য সুসজ্জিত খাটে ামি শুয়েছিলাম, আজ প্রভাতে তা একখানা অতি সাধারণ শববাহী খাটে রূপান্তরিত য়েছে। খাটের বিছানা-পত্রের দিকে চেয়ে আমার মনে হল যে শ্মশান যাত্রার আগে গুলো মৃতের পরিবার-পরিজনেরা এই খাটে পেতে দিয়েছিল। আর এই খাটখানা য়তো মৃতদেহ সৎকারের পরে শ্মশান-বন্ধুরা মহাকাল শ্মশানে ফেলে রেখে য়েছিল। তারপর বিবাহ-প্রস্তুতি-পর্বে এরা এই খাটখানাকে শ্মশান থেকে আকাশ ার্গে বহন করে এনে এই পোড়ো বাড়িতে রেখে দিয়েছিল। গতরাত্রে সেই শববাহী াটখানাকেই এরা অতিথি সৎকারের কাজে ব্যবহার করেছে। অতিথি-আপ্যায়ণে কান ত্রুটি রাখেনি।

আমি খাট থেকে নীচে নেমে পরিত্যক্ত ছাঁদনা তলার কাছে যেয়ে দাঁড়ালাম। াবং গতরাত্রের সেই ঝলমলে দোতলা বাড়িটির দিকে চেয়ে দেখলাম, আদতে সেটি াকটি বহুকালের ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ি। বাড়িটির স্থানে স্থানে ফাটল ধরেছে। স্থানে বটগাছ গজিয়েছে। আর ভাঙাচোরা, পলস্তারা-খসা ঘরগুলো চলে গিয়েছে

চামচিকে ও গোলা পায়রার দখলে। চামচিকের চিক চিক আর গোলা পায়রার বকম ডাক শোনা যাচ্ছিল।

পোড়োবাড়িটির বড় বড় ফাঁক-ফোকরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওই নিশ্চয় ভয়ঙ্কর গোখরো, কেউটে আর চন্দ্রবোড়ার দল সপরিবারে শীত-ঘুমে হয়ে পড়ে রয়েছে।

বিরাট আঙিনার মাঝখানে চেয়ে দেখলাম, গতরাত্রের বিয়ের সাক্ষী-স্বরূপ ছাঁদ তলার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটি কলাগাছ। ছাঁদনাতলা সাজানো হয়েছি গাঁদাফুল, বনফুল আর আমপাতা দিয়ে, সেগুলিও বিদ্যমান। সিঁদুর-চন্দনে সে ফুল আর আমের পল্লব মাথায় নিয়ে পেতলের ঘটটি ছাঁদনাতলার মাঝখানে ব রয়েছে,. যেমনটি ওকে বসে থাকতে দেখেছিলাম গতকাল নিশীথ রাত্রে। গতরা ভোজের এঁটো কলাপাতা আর মাটির ভাঁড়গুলো আঙিনার একপাশে ডাঁই করে র হয়েছে। পোড়োবাড়িটির চারদিকে চেয়ে দেখলাম, জীব আর জড়ের সহাব যথারীতি বিদ্যমান। তার নিজ স্থানে, নিজ রূপে বিদ্যমান। কিন্তু বে স্থানেই, কোন রূপেই তেনাদের দেখা গেলাম না।

পরিত্যক্ত ছাঁদনাতলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি এইসব দেখছিলাম। তেনাদের ব ভাবছিলাম। এমন সময় পোড়োবাড়ির একটি গাছের নীচু ডালে বসে হঠাৎই এ কোকিল তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, কু-উ, কু-উ। আর তার পরক্ষণেই সেটি উড়ে গে

কোকিলটির ওই কু-ডাক শুনে আমার বড় রাগ হল। কারণ আমার মনে হ ওই কালো, কুৎসিত পরিযায়ী কোকিলটি আসলে একটি নিন্দুক পাখি। এদেশে এ ও যার-তার খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। কু-গেয়ে বেড়াচ্ছে। নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। ওই ডালে বসে ও নিশ্চয়ই গৃহকর্তার নিন্দে করছিল। আর তারপর নিজের গা বাঁচা জন্য ও চটপট সরে পড়ল।

তবে ওই কোকিলটির মতো আমি কিন্তু গৃহকর্তার নিন্দে করতে পারলাম নিন্দে-বান্দা করার কথা আমার মনেও এল না। বরং আমার তো মনে হল, নি নয়, প্রশংসাই গৃহকর্তার প্রাপ্য। কারণ গৃহকর্তা যথেষ্ট অতিথি বৎসল। আর তাছা এদের সকলের সম্বন্ধেই এখন আমি দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি যে পরিচয় এ যাই হোক না কেন, এরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বি করে এদের অধিগত কুহকবিদ্যার তো তুলনা হয় না!

পরিত্যক্ত ছাঁদনাতলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি পোড়ো বাড়িটির চতুর্দিকে চে দেখলাম। দেখলাম, সব আছে। সবকিছু আছে। নেই শুধু তেনারা। ভাবলাম, য আমাকে এত আদর-আপ্যায়ন করলেন, পেট ভরে খেতে দিলেন, খাট পেতে শু দিলেন, যাওয়ার আগে একবার তাঁদের খোঁজ নেওয়া দরকার। তো যেমনি ভ তেমনি কাজ। হঠাৎই আমি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, দেবযানী, দে বৌঠান—তোমরা কোথায়?

আমার ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তবে আমার সেই উচ্চ-কণ্ঠ-নিনাদ নির্জন পোড়োবাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে প্রবেশ করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। আর তাতে ভয় পেয়ে এক ঝাঁক গোলা পায়রা তাদের পাখায় পতপত আওয়াজ তুলে খোলা আকাশে উড়ে গেল। আমি সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি জানতাম, মারিগ্রামের এই পোড়োবাড়ির মাইল তিনেকের মধ্যে কোন জনবসতি নাই। আর সেই পথিকদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর থেকে এদিকে কেউ আসেও না। মারিগ্রামের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পায়। ফলে এই পোড়ো বাড়িতে আমি কোন মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনতে পাব বলে ভাবিনি। আপন মনেই আমি সেই ভয়-পাওয়া গোলা পায়রাগুলোর আকাশে উড়ে যাওয়া দেখছিলাম। এমন সময় আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে, আমার পেছনের দোতলার বারান্দা থেকে কে যেন ঘড় ঘড়ে গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কিরে লাতি, ঘুম ভাঙল?

আমার পেছনে হঠাৎ ওই ঘড়ঘড়ে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আমি চমকে উঠলাম। এবং আগুপিছু না ভেবে চট্ করে আমি বন্দুক-হাতে ঘুরে দাঁড়ালাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি দোতলা বরাবর বন্দুক-তাক করে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে যতটুকু আমার নজরে এল, তাতে মনে হল দোতলার বারান্দায় একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘড় ঘড়ে কণ্ঠস্বর তাঁরই।

আমার বন্দুক তাক করা দেখে দোতলার বারান্দার ওই মহিলা ভয় পেয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি চিৎকার করে বললেন, গুলি মারিস না রে লাতি, গুলি মারিস না! হামি তোর লাতিমাসি আছি। হামি তোর রতনকাকার রুকমিনি মাসি আছি! হামি পদ্মিনীবাঈ আছি রে, ভাই!

লাতিমাসির পরিচয় পেয়ে আমি বন্দুক নামিয়ে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে লাতিমাসি পড়িমরি করে ভাঙাচোরা সিঁড়ি টপকে কোনক্রমে নীচে নেমে এলেন। তারপর ছুটতে ছুটতে আঙিনা পার হয়ে উনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

লাতিমাসিকে দেখে আমার খুব রাগ হল। আমি রাগতস্বরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে এসেছ কেন?

লাতিমাসি হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলেন, নিমন্ত্রণ খেতে।

কবে এসেছ?

কাল রাতের বেলা আসলাম।

কাল রাতের বেলা এসেছ! তার মানে কাল আসার পথে তুমিই আমার পিছু নিয়েছিলে, তাই না?

লতিমাসি বললেন, হামি তোর পিছু নিলম নাই। লেকিন তোর সাহানা কাকীমা হামাকে তোর উপরে লজর রাখতে পাঠাল। ওহ্ বহুত কান্নাকাটি করল। হামাকে বিশ রূপেয়া বকশিশ ভী দিল। তাই হামাকে আসতে হল।

লাতিমাসি ওঁর কুর্তার পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে আমাকে দেখালেন।

সাহানাকাকীমার মলিন মুখখানা আমার মনে পড়ল। বুঝতে পারলাম, মন মানেনি তাই বিশ-টাকা অগ্রিম বকশিশ দিয়ে উনি লাতিমাসিকে আমার ওপর নজর রাখার জন্য পাঠিয়েছেন। এতে আর লাতিমাসির দোষ কি। ওঁর কথা শুনে আমার রাগ পড়ে গেল।

একটু পরে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার নাম তো রুকমিনি বাঈ। ডাকলাম রুকি। তা রুকমিনি বাঈ থেকে তুমি পদ্মিনী বাঈ হতে গেলে কেন?

উনি উত্তর দিলেন, পদ্মিনী হামার বচপনের নাম আছে। হামি রুকমিনি সে পদ্মিনী হলুম নাই। লেকিন পদ্মিনী সে রুকমিনি হলুম।

কিন্তু কেন? কেন তুমি পদ্মিনী থেকে রুকমিনি হতে গেলে?

সে অনেক কথা। আখন বলা যাবে নাই।

তারপর লাতিমাসি আমাকে তাড়া দিলেন। বললেন, চল, ইখান থিকে চলে যাই। আখন ইখানে থাকা উচিত লয়। উরা আখন সাফাই-উফাই করবে। উদের আখন অনেক কাজ।

আমি বললাম, তুমি যাও। আমি এখন যাব না। এখানেই থাকব।

না, না, হামার সাথ তুকে ভী যেতে হবে। এটা লিয়ম আছে। লিয়মটা মানতে হবে। জলদি চল।

আঃ! বললাম তো আমি যাব না। তুমি যাও।

সেই সময় আমাদের কথাবার্তা শুনে তুফান বাড়ির বাইরে থেকে হ্রেষারব করে উঠল। মনে হল, লাতিমাসিকে সমর্থন করে তুফানও যেন একই কথা বলতে চাইছে। তুফানও যেন বলতে চাইছে, এটাই যখন এদের নিয়ম, তখন আর দেরী না করে চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

এমন সময় দোতলার ঘরে একটা শব্দ হতে লাগল। শব্দটা শুনে মনে হল, কে বা কারা যেন ওপরের ঘরে কাঠের আসবাবপত্র সরাচ্ছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা একঘর থেকে অন্য ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শব্দটা তেমনই। মনে হল যেন ফিসফিস করে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলছে।

ভাবলাম, তবে কি ওরা সব ওপরের ঘরগুলোতে রয়েছে? দোতলায় রয়েছে? তা যদি হয় তবে তো দেবযানী এবং দেবলা বৌঠানও ওখানেই রয়েছে। তাহলে তো যাওয়ার আগে আমাকে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে হয়। দেখা করতে হয় গৃহকর্তার সঙ্গেও। ভদ্রলোক বড়ই অতিথি বৎসল!

তো যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। আমি এক ছুটে আঙিনা পার হলাম। তারপর সমুখের ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। বেশ কয়েকটা ধাপ উঠলামও

এমন সময় সারা পোড়োবাড়ি জুড়ে একটা ঘূর্ণী ঝড় শুরু হল। একটা ধুলি ঝড় শুরু হল। আর সেই ঝড়ের দাপটে পোড়োবাড়ির চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধুলে বালি, ঝরাপাতা, ডাঁই-করে-রাখা এঁটো কলাপাতা, মাটির ভাঁড়, সবকিছু শূন্যে উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল। শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ওরা নাচতে লাগল। শূন্যে নাচতে নাচতে ওরা ঘুরপাক খেতে লাগল। মনে হল যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে ওরা সব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর জীবন্ত হয়ে ওঠার আনন্দে ওরা সব শূন্যে উঠে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা সব শূন্যে উঠে ঘুরপাক খেতে শুরু করে দিয়েছে।

ভাঙাচোরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি হাঁ করে ওদের ওই অদ্ভুত নাচানাচি দেখতে লাগলাম। ওদের ওই অদ্ভুত ঘুরপাক-খাওয়া দেখতে লাগলাম।

ততক্ষণে বোধহয় ওরাও আমাকে দেখতে পেয়েছিল। তাই মুহূর্ত মধ্যে ওরা নাচতে নাচতে, ঘুরপাক খেতে খেতে আমার কাছে ছুটে এল। তারপর আনন্দের আতিশয্যে ওরা আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওরা আমাকে ওদের বুকে টেনে নিল। ওরা আমাকে ওদের বুকে টেনে নিয়ে নাচতে লাগল, নাচতে নাচতে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু ওদের ওই আনন্দের অতিশয্য আমি বেশীক্ষন সহ্য করতে পারলাম না। তাই ওদের সঙ্গে আমি কয়েকবার ঘুরপাক খেলাম, খানিকক্ষণ নাচানাচি করলাম। তারপর বেসামাল হয়ে আমি সেই ভাঙাচোরা সিঁড়িতে আছড়ে পড়লাম এবং গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে নেমে এলাম। আমার হাত দু'খানা ছড়ে গেল।

চোখের সামনে আমার অমন দুর্দশা দেখে লাতিমাসি চীৎকার করে উঠলেন। বললেন, "নষ্ট কর দিয়া রে, সব কুছ নষ্ট কর দিয়া!" তারপর এক ছুটে উনি আমার কাছে যেয়ে দাঁড়ালেন। খপ্ করে আমার একখানা হাত ধরে উনি আমাকে টেনে তুললেন। তারপর আর এক ছুটে আমাকে নিয়ে উনি একেবারে পোড়োবাড়ির বাইরে চলে এলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। লাতিমাসি সেটা বুঝতে পারলেন। এবং আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে লাতি, ডর লাগছে?

আমি উত্তর দিলাম, না, না, অত সহজে আমার ডর লাগে না। আমি ঠিক আছি।

আমার অমন বেপরোয়া উত্তরে লাতিমাসি ক্ষেপে গেলেন। এবং বললেন, তুই একটা বেওকুফ আছিস। কারো কথা শুনিস না। তুহার কে হাম—খাঁটি দেশোয়ালী ভাষায় উনি আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করতে লাগলেন।

তারপর গালাগালি থামিয়ে আমাকে উনি বললেন, চল, বাড়ি চল। তোর সাহানা কাকীমা বহুত চিন্তা করছে।

আমি বললাম, আমি এখন তুফানের কাছে যাব। ও আশেপাশেই কোথাও আছে।

ঠিক আছে। তাই চল।

পোড়োবাড়ি থেকে একটু এগিয়ে যেতেই আমরা তুফানের দেখা পেলাম। আমাদের দেখে ও হ্রেষা রব করে উঠল। হ্রেষারব করে ও ওর আনন্দের কথা জানাল। ওর কুশলবার্তা দিল।

দেখলাম, একটা শেওড়াগাছে ওরা তুফানকে বেঁধে রেখেছে। আর ওরা ওকে খেতে দিয়েছে কাঁচা ঘাস, গোটা ছোলা আর একটা মাটির গামলায় পরিষ্কার জল। আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেনি।

তুফানকে ওরা যথাযথ সমাদর করেছে দেখে আমি খুশি হলাম। এবং আমি লাতিমাসিকে বললাম, দেখেছ, এরা কত ভাল। তুফানকে এরা কেমন খাতিরদারি করেছে।

আমার কথা শুনে লাতিমাসি রাগতস্বরে বললেন, হাঁ, হাঁ, হাসি জানে। উরা ভাল আছে। উদের খাতির দারি ভী ভাল আছে। লেকিন তু ভাল নেই। তুকে খাতিরদারি করা উদের উচিত হল না।

আহা, রাগ করছ কেন? চল বাড়ি যাই।

তুফানের লাগাম ধরে আমি বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। লাতিমাসি আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন।

খানিকটা এগিয়ে এসে আমি পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। চেয়ে রইলাম পোড়োবাড়ির দিকে। পোড়োবাড়ির ভেতরের সেই ঘূর্ণীঝড়, ধুলিঝড় ততক্ষণে থেমে গিয়েছিল। ক্ষণিকের ঝড়-ঝাপটার পরে নীরব নিস্তব্ধ পোড়োবাড়িটি তখন এক স্থবিরের মতো দাঁড়িয়েছিল। পোড়োবাড়ির কোন এক বৃক্ষশাখে বসে একটা ঘুঘুপাখি তখন একটানা ঘু-ঘু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু, ঘু-ঘু-ঘু রবে ডেকে চলেছিল। আর ঘু ঘু পাখিটির ডাকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা বাউরা বনটিয়া (ব্রেন ফিভার) তখন কুক্, কুক্ কুক্, কুক্ রব তুলছিল। ওদের ওই যুগলবন্দী শুনতে শুনতে আমি পোড়োবাড়িটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার দেবলা বৌঠানকে মনে পড়ল। মনে পড়ল বৌঠানের গতরাত্রের রসিকতার কথা—"আজকের এই অমানিশার শুভ লগ্নে একজন সুন্দরী যুবতী তোমাকে ছাঁদনা তলায় নিয়ে যেতে চাইছে। আর তা শুনে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ! ভয়ে তোমার গলা কেঁপে উঠছে! এ বড় লজ্জার কথা, ভাই!"

আমার মনে পড়ল দেবযানীকে। মনে পড়ল দেবযানীর মিষ্টিমাখা অনুযোগের কথা—"আর কতক্ষণ আমাকে এইভাবে বসিয়ে রাখবে? এবারে খেয়ে নাও। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। রাত যে শেষ হয়ে এল!

আমি তন্ময় হয়ে ওদের দু'জনার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় লাতিমাসি এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর আমার ছড়ে যাওয়া হাত দু'খানায় উনি ভেষজ পাতার রস লাগিয়ে দিলেন। শেষে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, চল ইবারে বাড়ি চল। তোর সাহানা কাকীমা বহুত চিন্তা করছে।

আমি ওঁর অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর বললাম, হ্যাঁ, চল।

তুফানের লাগাম ধরে কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর আমি লাতিমাসিকে বললাম, ও, এবারে ঘোড়ায় ওঠ। আমার সামনে বোস। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরি। কাকীমা চিন্তায় আছেন।

লাতিমাসি বললেন, না, হামি হেঁটে যাবে। তু ঘোড়ায় চেপে তুরন্ত চলে যা।

ওঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি ওঁকে বললাম, এই সাত মাইল পথ তুমি হেঁটে ! গতকাল রাত্রে এতটা পথ কী তুমি হেঁটে এসেছিলে?

কিন্তু উনি সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

তখন আমি বললাম, আচ্ছা, সাহানাকাকীমা বলেন তুমি নাকি ভূতপ্রেতের কাঁধে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও! তো কাল আঁধার রাতে—।

আমার কথার মধ্যেই লাতিমাসি বাচ্চা মেয়ের মতো খিল খিল করে হেসে তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, তুই বহুত বুদ্ধু আছিস! কুছু বুঝিস না। ারে ভূতের কাঁধে আদমী থোড়াই চড়ে! লেকিন হাঁ, আদমীর কাঁধে ভূত জরুর ড়ে। তো তাখন হামি ওহ্ ভূত কে কাঁধ থিকে লামিয়ে দিহ। উকে হামি ভাগিয়ে ই।

ওঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে সত্যি করে বল া, কাল আসবার পথে তুমি কী ভাবে এসেছিলে?

উনি উত্তর দিলেন, তখন আঁধেরা ছিল। হামি রণপায়ে চলে আসলাম।

এতটা পথ তুমি রণপায়ে এসেছিলে?

হাঁ, আসলাম তো!

একটু থেমে লাতিমাসি বললেন, বহুত দিন আগে হামি দুমকা সে বীরভূম শহর া রনপায়ে ছুটে আসলাম। তাই হামার জানটা বাঁচল। নেহি তো ওহ্ শালে অর্জুন ং হামার জান লিয়ে লিত। ওহ্ শালে ঠাকুর বহুত বদমাশ থা। উসিকো ডরসে ামি পদ্মিনী বাঈ সে রুকমিনি বাঈ বনলাম।

লাতিমাসির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। তারপর জ্ঞাসা করলাম, কে সেই ঠাকুর অর্জুন সিং? সে কেন তোমার জান নিতে য়েছিল? কী দোষ করেছিলে তুমি?

দোষ তো হামি কুছু করলাম না। কসুর তো হামার কুছু ছিল না। লেকিন হামার ব সুরতী হামার সাথ বেইমানী করল। হামার সাথ দুশমনী করল। ওহি শালে খুব রতী হামার জানটা বরবাদ করে দিল। ওহি খুব সুরতী কী ওয়াস্তে হামি অর্জুন ংয়ের লজরে পড়লাম। হামি বরবাদ হয়ে গেলাম।

তারপর ভাঙা চোরা হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে লাতিমাসি যা বললেন, সংক্ষেপে তা ল—মধ্যপ্রদেশের বিলাশপুর থেকে বিশ মাইল দূরের এক পাহাড় ঘেরা গাঁয়ে জন্ম য়েছিল লাতিমাসির। ওরা ছিলেন চার ভাই বোন। দুই ভাই, দুই বোন। লাতিমাসি র্ব কনিষ্ঠা। নাম পদ্মিনী। পদ্মের মতোই সৌন্দর্য ছিল লাতিমাসির, তাই পদ্মিনী। ওঁর

বাবা ছিলেন বিত্তবান চাষী। তো সেই সচ্ছল, সুখী কৃষক পরিবারের রূপসী কন্যা হলেন লাতিমাসি।

একদিন ধুমধাম করে পদ্মিনীর দিদির সাদি হয়ে গেল। আর তার পরদিন পনেরোয় পা দেওয়া পদ্মিনীর জন্য ওঁর ঠাকুর্দা ছেলেকে পাত্র খুঁজতে বললেন কারণ, জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে অধিক দিন ঘরে রাখা নিরাপদ নয়। কারণ, রূপের আগু ধ্বংস করে দিয়ে পারে অনেক কিছু। কারণ, যুগে যুগে, দেশে দেশে রূপের আগু ধ্বংস করে দিয়েছে অনেক কিছু। এমন কী গোটা একটা রাজ্যও। তাই আ গোত্রান্তর প্রয়োজন। সৎপাত্রে শীঘ্র সম্প্রদান প্রয়োজন।

তো পরদিন থেকেই সৎপাত্রের খোঁজে, উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে ঘটক ছুটল দি দিকে। কিন্তু মন-পছন্দ পাত্র পাওয়া গেল না সহজে। রূপসী কন্যের পাশে দাঁড়ানে মতো রূপবান বর পাওয়া গেল না সহজে। আবার অনকে খোঁজাখুঁজির পর ম ছন্দ বর পাওয়া গেল তো ঘর একেবারেই না-পছন্দ। আবার মন-পছন্দ ঘর পাও গেল তো বর না-পছন্দ। তো এইভাবে মন-পছন্দ বর আর ঘরের খোঁজ করা করতেই কেটে গেল গোটা একটা বছর। রূপসী পঞ্চদশী কন্যে হলেন পূর্ণযৌব ষোড়শী।

যাহোক, অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রূপসী কন্যের জন্য রূপবান ব জুটল। সঙ্গে মন-পছন্দ ঘরও। এ ঘরও বিত্তবান চাষীর ঘর। পাত্রের নাম রোহ তবে খানিকটা দূরে। বিহারের দুমকায়। তাতে কী! রাজযোটক সম্বন্ধ যে! পা পাত্রীর এক রাশি। গ্রহ বৈরিতা, গণদোষ, বর্ণদোষাদির ভয় নাই। তাই শুধু খানিব দূরে বলে তো আর এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া করা যায় না! সুতরাং বৃথা কালক্ষয় করে শুভ দিনে, শুভক্ষণে ধুমধামের মধ্য দিয়ে রোহনের সঙ্গে পদ্মিনীর সাদি হ গেল।

তো সাদির পরে রোহন ও পদ্মিনীর দাম্পত্যজীবন বেশ সুখেই কাটছি শান্তিতেই কাটছিল। বছর তিনেক ওদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখ-শান্তিতেই কে ছিল। পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি ততদিনে আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছি আর গ্রামের মানুষ একবাক্যে স্বীকার করেছিল যে পদ্মিনী সত্যিই প্রকৃত সুন্দরী। ত নির্ভুল কোষ্ঠীবিচার ও জ্যোতিষ গণনার ফলে ওদের সাদিও হয়েছে
তাই জীবনে ওরা সুখী হবে, শান্তি পাবে।

কিন্তু কোষ্ঠীবিচার ও জ্যোতিষ গননা কী সত্যিই নির্ভুল ছিল? সঠিক ছি ওদের দু'জনের সাদি কী সত্যিই রাজযোটকে হয়েছিল? গ্রহবৈরিতা, গণদে বর্ণদোষাদির কোন আভাষই কী গণনায় মেলেনি? সাদির তিন বছর পরে এ সন্দেহই দেখা দিয়েছিল লাতিমাসির মনে। ততদিনে লাতিমাসির কপাল পুড়েছি মৃত্যুভয় লাতিমাসিকে তাড়া করে ফিরছিল। আর অন্যদিকে ব্যর্থ আক্রো লাতিমাসির মন তখন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল!

ঠাকুর অর্জুন সিং-এর ধনবল ছিল, জনবল ছিল, সমাজে প্রতিপত্তি ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বহু সম্ভাবনাময় ঠাকুর ছিদ্র মশকবাহী ছিলেন। রূপসী নারীর প্রতি তাঁর অহেতুক আকর্ষণ ছিল। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল। সাকী আর সুরা তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল। সাকী আর সুরা তাঁর দুরন্ত যৌবনের তপস্যা ছিল। তাই পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি খল-রূপপিয়াসীর কানে পৌঁছতে বেশি দেরী হয় নাই।

কিন্তু, যেহেতু রূপসী পদ্মিনী ছিলেন এক বিত্তবান কৃষক পরিবারের কুলবধু, তাই তাঁর রূপে কদর্য থাবা বসানো ঠাকুর অর্জুন সিং-এর পক্ষেও সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই অর্জুন সিং অপেক্ষা করছিলেন। গৃধ্রের মন নিয়ে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। একবার সামনা-সামনি দেখার জন্য তাঁর গৃধ্র-রূপী মন ছটফট করছিল।

তো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শেষে একদিন সেই সুযোগ এল। ঠাকুর অর্জুন সিং-এর নিয়োজিত এক দুশ্চরিত্রা নকরানি এসে তাঁর কানে কানে খবর দিল যে আগামী শুভ পূর্ণিমা তিথিতে সন্তান লাভেচ্ছু পদ্মিনীবাঈ দূরের রামসীতা মন্দিরে পুজো চড়াতে যাবেন। যেহেতু ভগবান রাম সকল মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করে থাকেন, তাই ঠাকুর সাহাবের উচিত ওই শুভ পূর্ণিমা তিথিতে ভগবানের উদ্দেশে পুজো চড়ানো। আর তাহলেই ভগবানের কৃপায় তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হবে। সুযোগটা যেন তিনি নষ্ট না করেন।

না, ঠাকুর সাহাব যে সুযোগ নষ্ট করলেন না। সেদিন সকাল হতেই দলবল নিয়ে ঠাকুর সাব অশ্বারোহনে বেরিয়ে পড়লেন রামসীতা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। পুজো করতে। কাঙিক্ষত বস্তু লাভ করার অভিলাষে।

তারপর রামসীতা মন্দিরে পৌঁছে ঠাকুর অর্জুন সিং পুজো চড়ালেন কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের অভিলাষে। আর ওদিকে পদ্মিনীবাঈ পুজো চড়ালেন সন্তান লাভের মানসে। তারপর দু'জন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পদ্মিনীবাঈ যখন অদূরের অপেক্ষমান শকটের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, ঠাকুর অর্জুন সিং এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন। এবং প্রথানুযায়ী হাত জোড় করে নমস্কার করে ভাবিজীকে তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। তারপর ভাবিজীর রূপের প্রশংসায় দেবরজী একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আর শেষে মিষ্টি হাসি হেসে ভাবিজীকে তাঁর গরিবখানায় একবার পদার্পণ করার আমন্ত্রণ জানালেন।

অপরিচিত দেবরজীর মুখ থেকে অমন রূপের প্রশংসা শুনে ভাবিজী আপ্লুত হলেন, বিগলিত হলেন; এবং হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার করার পর দেবরজীকে তিনি তাঁর গরিবখানায় প্রথমে আসার আমন্ত্রন জানালেন। সঙ্গে তাঁর রূপসী ধর্মপত্নীকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। আর তারপর তিনি অদূরের সুসজ্জিত শকটের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর পেছনে দাঁড়িয়ে অভিভূত দেবরজী গৃধ্রের মন নিয়ে রাজহংসীর গমন পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পদ্মিনীবাঈ-এর সঙ্গের পরিচারক-পরিচারিকারা ঠাকুর অর্জুন সিংকে ভাল ভাবেই চিনত। তাই ঠাকুরকে অমন পথ রোধ করে দাঁড়াতে দেখে তারা শঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেল দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এবং তারা তাদের মালকিনকে নিয়ে চটপট বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে পত্নীর মুখ থেকে ঠাকুর অর্জুন সিং সম্বন্ধে সব কথা শোনার পর রোহন অস্বস্তিতে পড়লেন। এবং পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে গেলে যে যথেষ্ট সুখের কারণ হবে, স্বস্তির কারণ হবে পত্নীকে তিনি তা বুঝিয়ে বললেন।

কিন্তু ভাবি তো মায়ের সমান হন! তাই অর্জুন সিং সম্বন্ধে পতির অস্বস্তির কারণ পত্নী ঠিক বুঝতে পারলেন না। যাহোক, তখনকার মতো অর্জুন সিং প্রসঙ্গে ইতি টেনে পতি-পত্নী দু'জনে শুতে গেলেন।

ব্যাপারটার ওখানেই ইতি ঘটলে পদ্মিনীবাঈ জীবনে সুখী হতে পারতেন। শান্তি পেতে পারতেন। রাজরানীর মতো জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তেমনটা হল না। আর তাই কয়েকদিন পরেই পদ্মিনী বাঈ-এর জীবনে এক মহা দুর্যোগ ঘনিয়ে এল।

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় হয়। রোহন বাড়িতে ছিলেন না। এমন সময় ঠাকুর অর্জুন সিং সস্ত্রীক পদ্মিনী ভাবির বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। অতিথি নারায়ণ। তাঁর সেবা করা গৃহস্থের ধর্ম। পদ্মিনীবাঈ তাই পরিচারক-পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে, হৃষ্ট মনে অতিথি সেবা করলেন। পদ্মিনীবাঈ-এর সেবায় ঠাকুর দম্পতি খুশি হলেন। এবং ফিরে যাওয়ার আগে তাঁরা বড়ে ভাই ও ভাবিজীকে তাঁদের গরিবখানায় পদার্পণ করার আমন্ত্রন জানালেন। তাঁরাও অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ চাইলেন।

পত্নীর পীড়াপীড়িতে পতিকে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর সাহাবের হাবেলিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হল। অতিথি আপ্যায়নে ঠাকুর দম্পতি কোন ত্রুটি রাখলেন না। কিন্তু ভাবিজীকে একান্তে পেয়ে দেবরজী তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করলেন তা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এক কথায় তা অভব্য। দেবরজীর আচরণে ভাবিজী তাই ক্ষুব্ধ হলেন। এবং তিনি ক্ষুন্ন মনে পতি সাথে ঘরে ফিরলেন। ঠাকুরের আচরনে পত্নী যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ক্ষুন্ন হয়েছেন পতির তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এবং তিনি মনে মনে স্থির করলেন, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এখানেই শেষ।

কিন্তু রোহন মনে মনে যাই স্থির করুন না কেন, পদ্মিনী মনে মনে যতই হোন না কেন, রিপু তাড়নায় অস্থির অর্জুন সে সবের ধার ধারলেন না। আর তাই তিনি দু'দিন বাদেই গ্রীষ্মের ভর দুপুরে ভাবিজীর গৃহে এসে হাজির হলেন। এবং পরিচারকের মাধ্যমে তাঁর অন্দরমহলে খবর পাঠিয়ে তিনি ঠাণ্ডা পানীয় চাইলেন। কারণ তিনি বিশ মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে অশ্বারোহণে ছুটে এসেছেন। তাই তিনি পিপাসার্ত। আর ভাবিজীর আপত্তি না থাকলে তিনি তাঁর আমির খানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চান। কারন দীর্ঘ পথশ্রমে তিনি পরিশ্রান্ত।

পরিচারকের মুখে সব কথা শুনে পদ্মিনীবাঈ অর্জুন সিংকে ঠাণ্ডা পানীয় দিতে বললেন। এবং বারমহলে তাঁর জন্য তিনি বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। নিজে অন্দরমহলে থেকে তিনি পরিচারক-পরিচারিকাদের মাধ্যমে অতিথি-আপ্যায়ন সারলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। কিন্তু পদ্মিনীবাঈ অন্দর মহল থেকে বারমহলে এলেন না। বারমহলে এসে তিনি সম্মানীয় অতিথির কুশল বার্তা নিলেন না। নিজেদের কুশল বার্তা দিলেন না। মানী লোকের মান রাখলেন না। এতে ঠাকুর অর্জুন সিং ক্ষুণ্ণ হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তাঁর চোখে বিদ্যুত ঝিলিক দিয়ে উঠল। তাঁর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা মাথা ঝাঁকানি দিল। কালক্ষয় না করে তিনি দ্রুত অশ্বারোহনে হাবেলিতে ফিরে গেলেন।

আর তার ঠিক দু'দিন বাদেই রাত দুপুরে রোহন-পদ্মিনীর বাড়িতে ডাকাত পড়ল। মুখে কালো কাপড় বাঁধা বাইশ জনের অশ্বারোহী ডাকাত দল ওঁদের বাড়িতে ডাকাতি করল। ওঁদের ঘরে আগুন দিল। পদ্মিনীবাঈ-এর সামনেই তারা ওঁর স্বামীকে গুলি করে মারল। ঘন্টাখানেক ধরে তান্ডব চালিয়ে তারা সব কিছু তছনছ করে দিল। তারপর ফিরে যাওয়ার সময় পদ্মিনীবাঈ-এর হাত মুখ বেঁধে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তারা ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

পদ্মিনীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে ডাকাতদল জঙ্গলের পথে ছুটে চলল। এবং প্রায় আধঘণ্টা ছুটে চলার পর ওরা এক বাংলো বাড়ির সম্মুখে যেয়ে থামল। তারপর পদ্মিনীকে ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে ওঁর হাত ও মুখের বাঁধন খুলে দিল। তখন একজন নকরানি এসে ওঁর হাত ধরে নিয়ে যেয়ে ওঁকে বাংলো বাড়ির এক স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর সে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

পদ্মিনী প্রথমে বুঝতে পারলেন না নকরানি ওঁকে কার ঘরে ঢকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মদ্যপ অর্জুন সিংকে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে দেখে ওঁর কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। পতিহন্তাকে সম্মুখে দেখে পদ্মিনীর মাথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

নিজের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য পদ্মিনী ওঁর কোমরে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ডাকাতদলের হাত থেকে ইজ্জত রক্ষা করার জন্য উনি আত্মহতার পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ গজের মধ্যে স্বামীহন্তাকে দেখে ওঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ওঁর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলে উঠল। উনি আত্মহত্যার কথা ভুলে গেলেন। ওঁর ভেতরের জ্বলন্ত আগুনে ছাই চাপা দিয়ে উনি মদ্যপ অর্জুনের সামনে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে উনি সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে উনি স্বামীহন্তাকে চরম শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন।

পদ্মিনীকে অমন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অর্জুন উৎসাহিত হলেন, আনন্দি হলেন। উনি টলতে টলতে পদ্মিনীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। অধিক মদ্যপানে ফলে অজুনের কথাবার্তায় শ্লীলতা বোধের অভাব ঘটল। তবুও পদ্মিনী দাঁতে দাঁত চে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শয়তান অর্জুনকে চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য উনি অপেক্ষা করতে লাগলে।

মদ্যপ অর্জুন টলতে টলতে পদ্মিনীর কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর দুই হা প্রসারিত করে উনি পদ্মিনীকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পদ্মি ঝটিতে পাশে সরে গেলেন। আর মদ্যপ অর্জুন বেসামাল হয়ে কাটা কলা গাছে মতো উবুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

পদ্মিনী এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ঝটিতে উনি কোমর থে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে নিলেন। এবং বিষাক্ত শঙ্খচুড়ের ছোবলের মতো সেটাকে উনি অর্জুনের পিঠে বসিয়ে দিলেন। তারপর গরাদহীন জানালা গলে উ নীচে লাফিয়ে পড়লেন। নীচে লাফিয়ে পড়ে উনি ছুটতে লাগলেন। লক্ষ তারা আবছা আলোয় উনি লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটে চললেন। শয়তান অর্জুন এবং তাঁর দলব থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়াই তখন ওঁর একমাত্র লক্ষ্য।

পদ্মিনী জানেন না উনি কতক্ষণ ধরে ছুটে চলেছিলেন। পদ্মিনী জানেন না উ কোথায় ছুটে চলেছিলেন, কোনদিকে ছুটে চলেছিলেন। ওঁর মাথায় তখন একা চিন্তাই ঠাঁই পেয়েছিল। আর তা হল অর্জুন এবং তাঁর দলবল থেকে দূরে পালি যাওয়া। কারণ ওদের হাতে ধরা পড়লে ওরা ওঁকে জংলী কুকুরের মতো ছিঁড়েখুঁ খাবে। তাই উনি ছুটে চলেছিলেন। লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলেছিলেন।

এই ভাবে ছুটতে ছুটতে পদ্মিনী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অবসন্ন বো করছিলেন, ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে আসা কোন এক নৃত্যগীতের আসরের শ ওঁর কানে গেল। এবং তখন উনি সেই নৃত্যগীতের আসরের শব্দ লক্ষ্য করে চললেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি লক্ষ্যে পৌঁছলেন। লক্ষ্যে পৌঁছে উনি একা টিলার পাশে দাঁড়িয়ে আসরের দিকে চেয়ে রইলেন। উনি বুঝতে চেষ্টা করলেন ে ওটি কাদের আসব। কারা ওই আসরে নৃত্যগীত করছে। কারা ওখানে মেতেছে।

খানিকক্ষণ টিলার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পদ্মিনী বুঝতে পারলেন যে ওরা যাযাবর ওরা জিপসি। ওরা বনজারা। ওরা ভ্রাম্যমান মানুষ। তাই এক জায়গায় ওরা থাকে না। ওদের ঘর নাই। তাই তাঁবুই ওদের ঘর।

জিপসিরা নৃত্যগীত প্রিয়। সারাদিনের কাজের শেষে রাত্রে ওরা নৃত্যগী আসর জমায়। নাচগান করে। হৈ-হল্লোড় করে। আনন্দ-স্ফূর্তি করে। তবে ওরা এক জায়গায় থাকে না। কিছুদিন এক জায়গায় থাকার পরে ওরা তাঁব গুটায় অন্য কোথাও চলে যায়।

পদ্মিনী জানতেন যে কিছুদিন হল বনজারাদেব এই বৃহৎ দলটি এ তল্লাটে এসে তাঁবু ফেলেছে। ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা নানারকম খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা ভানুমতির খেলা দেখাচ্ছে। কসরতের খেলা দেখাচ্ছে। আবার ওদেরই কোন ছোট দল বাতের ওষুধ দিচ্ছে, দাঁতের ওষুধ দিচ্ছে, ঘায়ের ওষুধ দিচ্ছে, দুরারোগ্য রোগের ওষুধ দিচ্ছে। আবার ওদেরই কোন ছোট দল ভূত নামাচ্ছে, জিন তাড়াচ্ছে, ঝাড়ফুঁক করে অপদেবতা ভাগাচ্ছে। এভাবেই ওরা জীবিকার্জন করছে।

পদ্মিনীর মনে পড়ল, মাত্র এক সপ্তাহ আগে ওদেরই একটি ছোট দল ওঁদের বাড়িতে কসরতের খেলা দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আব্দার করে ওরা অনেক টাকা বকশিশ আদায় করেছিল। আর আজ!

কথাটা মনে পড়তেই পদ্মিনীর দু'চোখ হতে অশ্রু ঝরে পড়ল। আর ঠিক তখনই দু'জন জিপসি তরুণী দু'দিক থেকে এসে ওঁর হাত দু'খানা চেপে ধরল। তারপর ওরা ওঁকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করছ? তোমার মতলব কী?

পদ্মিনী বললেন, হাত ছাড়। এখানে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের নাচ গান দেখছি।

তরুণী দু'টি ওঁর হাত ছেড়ে দিল। তারপর ওদের একজন পদ্মিনীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?

পদ্মিনী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তার সাহায্য চাই।

তুমি আমাদের চেন?

হ্যাঁ, চিনি। এক সপ্তাহ আগে তোমাদের একটি ছোট দল আমাদের বাড়িতে কসরতের খেলা দেখিয়েছিল।

পাশ থেকে অন্য তরুণীটি বলল, তোমার মুখখানা খুব সুন্দর। তাই তোমাকে আমার মনে আছে। আচ্ছা, তোমাদের বাড়িতে তিনটি চামেলী ফুলের গাছ আছে, তাই না?

হ্যাঁ, আছে।

তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। ওই কসরত খেলার দলে সেদিন আমিও ছিলাম। আমার নাম গীতা।

তারপর ওর সঙ্গের তরুণীকে দেখিয়ে গীতা বলল, ওর নাম রূপা। আমার সহেলী। ও আমাদের সর্দারের মেয়ে।

ওই যে ছোট টিলার ওপরে বসে নাচ গান দেখছে, ওই আমাদরে সর্দার। লালজী সর্দার। আর ওর পাশে বসে আছে আমাদের সর্দারনী। ভীমা সর্দারনী।

রূপা বলল, চল, সর্দারের সঙ্গে দেখা করবে। ওরা দু'জন পদ্মিনীকে নিয়ে লালজী

সর্দারের কাছে গেল। তারপর রূপা সর্দারের কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে পদ্মিনীর সম্বন্ধে বলল। সর্দার রূপা ও পদ্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে গেল।

ততক্ষনে নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড় সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁবুতে বসে শান্ত পরিবেশে, ঠাণ্ডা মাথায় সর্দার পদ্মিনীর মুখ থেকে সব কথা শুনল। এবং সব কথা শোনার পর সর্দার বলল, দেখ বেটি, প্রায় মাস খানেক হল আমরা এখানে এসেছি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নানা রকম খেল দেখাচ্ছি। বাত সারাচ্ছি, ভূত নামাচ্ছি, জিন তাড়াচ্ছি। এখানকার গ্রামের মানুষগুলো ভাল। সরল, সাদাসিধে।

ক'দিন আগে আমাদের একটি দল ঠাকুর অর্জুন সিংয়ের হাবেলিতে যেয়েও খেল দেখিয়ে এসেছে। আর ওই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার কানে কিছু কথা এসেছে। সে সব কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে অর্জুন সিং মানুষটা ভাল নয়। বহু খতরনক আদমী!

শোন বেটি, তোর ছুরার ঘায়ে যদি অর্জুন সিংয়ের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে পুলিশ তোকে ছাড়বে না। আর অর্জুন সিং যদি বেঁচে থাকে তবে ওর দল তোকে ছাড়বে না। ওরা তোকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবে।

দেখ বেটি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তোর পতিকে তুই তো আর ফিরে পাবি না। তাই এখন তুই দেশে ফিরে যা। তোর বাবা মায়ের কাছে ফিরে যা। তুই তোর নিজের জানটা বাঁচা। আমার লোক তোকে তোর বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

লালজী সর্দারের কথা শুনে পদ্মিনী বললেন, সর্দার তুমি আমাকে বেটি ডেকেছ আমি ও তোমাকে বাপ ডাকছি। রূপার মতো আমিও তোমার আর একটি বেটি। আমাকে তুমি তোমাদের দলে আশ্রয় দাও। তোমাদের সঙ্গে থাকতে দাও। একজন বনজারা মেয়ের মতো জীবন যাপন করতে দাও। এই মুখ নিয়ে আমি আর দেশে ফিরে যেতে চাই না।

শোন বাপ। আমার ছুরার ঘায়ে যদি অর্জুনের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আমি কিছুটা তৃপ্তি পাব। পতিহন্তাকে চরম শাস্তি দিতে পেরেছি ভেবে মনে কিছুটা শান্তি পাব কিন্তু অর্জুন যদি বেঁচে থাকে তবে আমি আবার ঝাঁপাব। এবারে আমি ওই শয়তানটার কলিজায় ছুরা বসাব। আমি বদলা নেব। আমাকে তুই সাহারা দে। আমার শপথটা পুরা করতে দে। আমাকে তুই ভাগিয়ে দিস না, বাপ।

পদ্মিনীর কথা শুনে সর্দার বলল, বাপ কখনো বেটিকে ভাগিয়ে দেয় না। ভাগিয়ে দিতে পারে না। ঠিক আছে। তুই আমার দলে থেকে যা। লেকিন বনজারা বনে যা

অর্জুনের দলকে ধোকা দেওয়ার জন্য তুই পুরা বনজারা লেড়কী বনে যা। নেহি তো ওহ্ লোক বহুত ঝনঝট করবে। তোকে জানে মেরে দেবে।

তো সর্দারের কথা মতো সেদিন থেকেই পদ্মিনীবাঈ, আমার লাতিমাসি রুকমিনি বাঈ হলেন। যাযাবরদের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে থেকে গেলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা, খাদ্য-খানায় উনি যাযাবর হলেন। যাযাবরদের সাথে উনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। গ্রামে শহরে ঘুরতে লাগলেন। যাযাবরদের মতো উনি বাত সারালেন, ভূত ভাগালেন, আবার ভূতের সঙ্গে সম্পর্কও গড়ে তুললেন। উনি কসরতের খেলা শিখলেন, ভানুমতির খেলা শিখলেন, আবার রনপায়ে ছুটতেও শিখলেন। উনি পুরোপুরি যাযাবর বনে গেলেন। বনজারা বনে গেলেন। কিন্তু উনি বদলা নেওয়ার কথা ভুললেন না। পতিহন্তা অর্জুন সিংয়ের কলিজায় ছুরা বসানোর কথা ভুললেন না।

আর ওদিকে, কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করার পর লালজী সর্দার অর্জুন সিং সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হল। এবং সর্দারের সংগৃহীত সংবাদ অনুযায়ী অর্জুন সিং বেঁচে আছে। সে মরেনি। তবে আজও সে শয্যাশায়ী। আজও তার চিকিৎসা চলছে।

পদ্মিনীর ছুরার ঘায়ে অর্জুন সিং সেদিন গুরুতর জখম হয়েছিল। সে জ্ঞান হারিয়েছিল। কিন্তু মরেনি। এখনও তার চিকিৎসা চলছে। এবং সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

কয়েক মাস ধরে চিকিৎসার পর অর্জুন সিং এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে এবং সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্বিগুণ সংখ্যক লোক নিয়োগ করে পদ্মিনীর খোঁজ করতে শুরু করেছে। পদ্মিনীকে ধরতে পারলে সে যে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে, এমন মনোবাসনার কথাও সে তার দলবলের কাছে ব্যক্ত করেছে। আর তাই তার দলবল এখন খ্যাপা কুকুরের মতো পদ্মিনীকে খুঁজে ফিরছে।

লালজী সর্দারের দলের এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পরিচারকের কাজ নিয়ে অর্জুনের হাবেলিতে প্রবেশ করেছিল। এবং সে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছিল। তার মতে পদ্মিনীর পক্ষে এখন দুমকায় থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে দুমকা ছেড়ে পালাতে হবে। অন্যথায় তাঁকে অর্জুনের হাতে মরতে হবে। অর্জুন তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

ওই ব্যক্তি আরও খবর এনেছে সে এই ব্যাপার নিয়ে অর্জুন সিং আর থানা-পুলিস করেনি, লোক জানাজানি হতে দেয়নি। কারণ, এক হাসিনার হাতে মার খেয়ে ঠাকুর অর্জুন সিংয়ের মতো দাপুটে লোক চব্বিশ ঘন্টা ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এবং এখনও সে বিছানায় পড়ে আছে, তাঁর চিকিৎসা চলছে। এটাই ঠাকুরের পক্ষে যথেষ্ট লজ্জার ব্যাপার, অপমানের ব্যাপার। তারপর আবার থানা-পুলিস করলে, লোক জানাজানি হলে তার নাক কাটা যাবে। ব্যাপারটা তাই সে বেমালুম চেপে গেছে।

আর হাবেলির আশপাশের বাসিন্দারা ঠাকুরসাহাব সম্বন্ধে যা জেনেছে তা হল, অধিক রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছেন। আর তাই চিকিৎসার জন্য তাঁর মহলে দু'বেলা ডাক্তার যাতায়াত করছেন। যিনি দশের মাথা, দেশের মাথা তাঁর রক্তচাপ তো বাড়তেই পারে। এ আর নতুন কথা কী!

শেষে ঠাকুর অর্জুন সিংয়ের মতো খতরনক আদমীর হাত থেকে জান বাঁচানোর জন্য পদ্মিনীকে দুমকা ছাড়তে হল। পদ্মিনীর সহেলী রূপাকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মিনী ছুটে চললেন বীরভূমের দুবরাজপুরে। আঁধার রাতে। রনপায়ে। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার আর জল নিয়ে। দিনে বিশ্রাম আর রাতে ছুটে চলার রীতি মেনে।

সেই সময় লালজী সর্দারের বহিন তোতা, রূপার ফুফী, দলবল নিয়ে তাঁবু ফেলেছিল দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে। সর্দারের ব্যবস্থা মতো পদ্মিনী ছুটে চললেন মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে, সহেলী রূপাকে সঙ্গে নিয়ে। আঁধার রাতে। ফুফীর সঙ্গে মিলিত হতে। ফুফীর কাছে আশ্রয় নিতে। অর্জুনের হাত থেকে জান বাঁচানোর তাগিদে। সময় আর সুযোগ বুঝে অর্জুনের ওপর চরম আঘাত হানার সঙ্কল্প মনে নিয়ে।

একদিকে তাঁর ছুরার ছোবল ব্যর্থ হয়েছে এবং অর্জুন সিং এখনও বেঁচে আছে, এমন সংবাদ শুনে পদ্মিনী ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছিলেন। পতিহন্তাকে চরম শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প তাঁর মনকে কঠিন করছিল, কঠোর করছিল। অন্যদিকে অর্জুনের দলবল তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলে তারা তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে বলে স্থির করে রেখেছে। এমন সংবাদ তাঁকে বিচলিত করছিল। ভীত করছিল। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বিচক্ষণ সর্দার তাই তার রুকমিনি বেটিকে সাময়িক ভাবে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সাময়িক ভাবে গা-ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এর পর প্রায় দেড় বছর কেটে গিয়েছিল। বীরভূম জেলার দ্বারকা, ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছিল। রুকমিনি তাঁর তোতা ফুফীর দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। তোতা ফুফীর দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। গ্রামে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি নানা প্রকার খেলা দেখাচ্ছিলেন। বাত সারাচ্ছিলেন। জিন তাড়াচ্ছিলেন। ভূত ভাগাচ্ছিলেন। আবার ভূতের সঙ্গে তিনি সখ্যতাও গড়ে তুলেছিলেন। সেদিনের পদ্মিনী বাঈ ওরফে রুকমিনি, আমার লাতিমাসি ততদিনে পুরোপুরি বনজারা বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পতিহন্তার কলিজায় ছুরা বসানোর কথা ভোলেননি। পতিহন্তাকে চরম শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্পের কথা ভোলেননি। আর তাই প্রায় দেড় বছর পরে তিনি আবার দুমকায় ফিরে এসেছিলেন। পতিহত্যার বদলা নেওয়ার জন্য তিনি দুমকায় ফিরে এসেছিলেন।

ওদিকে অর্জুন সিং কিন্তু ততদিনে পদ্মিনীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। পদ্মিনীকে

ু পুড়িয়ে মারার বাসনাও সে বিস্মৃত হয়েছিল। হাসিনার হাতে মার খাওয়ার াতেও ততদিনে সময়ের প্রলেপ পড়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁকে না য সে এবং তার দলবল পদ্মিনীর ব্যাপারটায় ইতি টেনে দিয়েছিল। ব্যাপারটা া বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

আসলে ওসব কথা ওদের মতো লোকেরা বেশীদিন মনে রাখে না। বেশীদিন রাখলে ওদের চলে না। একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা বেশীদিন ছুটোছুটি করে না। টা ব্যাপার নিয়ে ওদের বেশীদিন ছুটোছুটি করলে চলে না। কারন নিত্য-নতুন য় ওদের দিন কাটে। নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকিরে ওদের দিনগুলো অতিবাহিত অতিক্রান্ত হয়। অনাদৃত হয়। নষ্ট হয়ে যায়। ওরা দিনের হিসেব রাখে না। ওরা য়র হিসেব রাখে না।

যাহোক, প্রায় দেড় বছর পরে রুকমিনি বাঈ দুমকায় ফিরে এসেছিলেন। এবং া ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ছট পূজোর উৎসব শুরু হয়েছিল। গ্রাম ও বর মানুষজন উৎসবের আনন্দে মেতেছিল। আর সেই উৎসবের মধ্যেই একদিন ল থেকে আকাশের মুখ ভার হয়েছিল। ঘন মেঘ আর হাল্কা হাওয়ার ল্পনা দেখে সকাল থেকেই আকাশ সেদিন মুখ গোমড়া করে রেখেছিল। া মাঝেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল। প্রায় সারাটা দিনই ঝির ঝিরে বৃষ্টির মধ্য া কেটেছিল।

তারপর সন্ধ্যে হয়েছিল। আর সন্ধ্যে হতেই সেদিন অকাল বর্ষণের সম্ভাবনা দেখা াছিল। ভারী বর্ষনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সারাদিনের সেই হাল্কা হাওয়া া হতেই সেদিন ঝোড়ো হাওয়া হয়ে ছুটোছুটি শুরু করেছিল। আকাশ-ঢাকা ঘন া আর সেই ঝোড়ো হাওয়া ছুটোছুটি করে সেদিনের রাতটাকে তারা দুর্যোগপূর্ণ া তুলেছিল। সরাসরি তারা অকাল বর্ষণের খেলায় মেতেছিল। আর সেই াগপূর্ন রাত, অকাল বর্ষনের রাতই রুকমিনিবাঈকে তাঁর শপথ পূরণের পথ সুগম া দিয়েছিল।

ছট পরবের কারণে অর্জুন সিং-এর হাবেলির বেশির ভাগ পরিচারক-পরিচারিকা, ারাদারই ছুটি পেয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। মাত্র মুষ্টিমেয় ক'জন বলিতে রয়ে গিয়েছিল। আর তারা সেই দুর্যোগের রাতে যে যার খুপরিতে ঢুকে য়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছিল। যেন ই মিলে রুকমিনিবাঈকে তাঁর শপথ পূরনের পথ সুগম করার প্রতিযোগিতায় লিখিয়েছিল।

তো বদলা নেওয়ার এমন একটা সুযোগ রুকমিনিবাঈ নষ্ট করলেন না। ঝড়-নর গভীর রাতে, কালো কাপড়ে সারা শরীর ঢেকে, হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরা নিয়ে ন অর্জুন সিং-এর হাবেলিতে ঢুকে পরলেন। তারপর সেই পরিচারক বেশি ঢের নির্দেশ মতো সোজা যেযে হাজির হলেন অর্জুন সিং-এর খাস মহলে।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছিল। রুকমিনিবাঈ কালো কাপড়ে সারা শরী ঢেকে, হাতে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরা নিয়ে, বনমার্জারীর পদক্ষেপে অর্জুনের শোয়ার ঘরে দিকে এগিয়ে গেলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শোয়ার ঘরের কাছাকাছি এ পৌঁছলেন। আর ঠিক তখনই এক নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ ধমক শুনে তিনি চম উঠলেন। থমকে দাঁড়ালেন। সেই নারীকণ্ঠ তীক্ষ্ণস্বরে ধমক দিয়ে বলল, সাবধা পদ্মিনীবাঈ, সাবধান! আর এক পা এগোনোর চেষ্টা করলেই আমি তলোয়ারের এ কোপে তোমার মাথা মাটিতে ফেলে দেব। তাই বাঁচতে চাও তো পালাও। অং মরবার জন্য প্রস্তুত হও!

কে তুমি? কোথা থেকে কথা বলছ? আমার সামনে এসো। বললেন রুকমিনি বা

রুকমিনির কথা শুনে খোলা তলোয়ার হাতে এক গৃহবধু অন্ধকার থেকে বেরি এসে বারান্দার আবছা আলোয় দাঁড়াল। তার পর সে বলল, আমি তো অপরিচিতা নই, পদ্মিনীবাঈ। আমি ঠাকুর সাহাবের ধর্মপত্নী মনোরমা। আমি জানত তুমি আসবে। একদিন না একদিন তুমি আসবে। পতিহত্যার বদলা নিতে আস আর তাই আজ দেড় বছর ধরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি। তোমা হত্যা করে আমি আমার পতির জীবন নিরাপদ করার জন্য প্রহর গুনে চলো খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে আমি রাত জেগে চলেছি। আর আজ সেই প্রহর গো শেষ হবে। রাত জাগার শেষ হবে। তুমি মরবার জন্য প্রস্তুত হও, পদ্মিনীবাঈ।

তুমি বড় ভুল করছ, মনোরমা! আমি মরবার জন্য আসিনি। আমি আজ মার জন্য এসেছি। অর্জুন সিং-কে হত্যা করে আমি আমার পতি হত্যার বদলা নি এসেছি। কারণ অর্জুন সিং আমার নিরপরাধ পতিকে হত্যা করেছে। আমাদের সো সংসার ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ আমার পালা। আজ আমি বদলা নেব। অ আমি অর্জুন সিংকে হত্যা করে আমার নিরপরাধ পতির হত্যার বদলা নেব। অ আমি অর্জুনের সংসারে আগুন জ্বালাব, যেমন করে সে আমাদের সংসারে আ জ্বালিয়েছে। আজ আমি তার সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব, যে করে সে আমাদের সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। তুমি আ সামনে থেকে সরে যাও!

শোন পদ্মিনী। তোমার পতি যদি নিরপরাধ হন তবে আমার পতিরও কে অপরাধ নাই। তিনি অপরাধী নন। অপরাধী তুমি। অপরাধ তোমার। অপরাধ তো অধিক রূপ যৌবনের। কারণ নারীর অধিক রূপযৌবন তার বিপদের হেতু হ নারীর অধিক রূপ যৌবন তার বিপদ ডেকে আনে। অহল্যা, সীতা, যাজ্ঞসে মেহেরুন্নিসাদের অধিক রূপযৌবন তাদের বিপদের হেতু হয়েছিল। তাদের বি ডেকে এনেছিল। তোমার অধিক রূপ যৌবন ও তোমার বিপদের হেতু হয়ে তোমার বিপদ ডেকে এনেছে। আর একদিন না একদিন তুমি বিপদে পড়তেই। ত আমার পতি এক্ষেত্রে নিমিত্ত মাত্র। আসল অপরাধী তুমি। আসল অপরাধ তোমা

মনোরমার কথা শুনে পদ্মিনী বাঈ হিস্ হিস্ করে বললেন, চুপ কর মনোরমা, চুপ কর! তোমার ওই অন্তঃসার শূন্য যুক্তি আমি মানি না। আর তোমার ওই সাফাইও আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

তোমার নির্বুদ্ধিতায় আমি আশ্চর্য হচ্ছি, পদ্মিনী! সামান্য এক গন্ধমুষিকা হয়ে তুমি সিংহের গুহায় প্রবেশ করেছ। সিংহের গুহায় প্রবেশ করে তুমি নির্বোধের মতো আচরণ করছ। তুমি কিচকিচ শব্দ করছ। কিচ কিচ শব্দ করে তুমি তোমার নিজের বিপদকে কাছে ডাকছ। তুমি তোমার মৃত্যুকে কাছে ডাকছ। নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চাইছ। তুমি নির্বোধ ছাড়া আর কী? কথায় বলে, দেবদূতেরা যেখানে পা ফেলতে ভয় পায়, নির্বোধেরা সেখানে আগ বাড়িয়ে ঝাঁপ দেয়। তুমি নির্বোধ তাই আগুপিছু না ভেবে তুমি সিংহের গুহায় ঝাঁপ দিয়েছ। সিংহের গুহায় ঝাঁপ দিয়ে তুমি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছ।

কথার মধ্যেই অদূরের এক ঘর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, কার সঙ্গে কথা কইছিস মা, বউ?

মনোরমা উত্তর দিল, সুরতিয়ার সঙ্গে কথা বলছি, মা।

সুরতিয়া! আজ রাতে ও ঘরে ফেরেনি?

কি করে ঘরে ফিরবে, মা! যা ঝড়-জল শুরু হয়েছে!

তা বটে। ওপরওয়ালার মর্জি কে বুঝতে পারে, বাছা। অসময়ে এই ঝড়-জল!

মনোরমা বলল, আমাদের কথাবার্তার শব্দে আমার শাশুড়ি মায়েব ঘুম ভেঙেছে। এবপর আমার পতির ঘুম ভাঙবে। চীৎকার চেঁচামেচি হবে। প্রহরীরা ছুটে আসবে। তোমাকে ধরে ওরা পেটাই করবে। তোমাকে ওরা শেষ করে দেবে। তাই এখনও সময় আছে। তুমি পালিয়ে যাও। বাঁচতে চাও তো তুমি এখনই পালিয়ে যাও, পদ্মিনী।

আমাকে তুমি মিথ্যে ভয় দেখিয়ো না, মনোরমা। আমি আটঘাট জেনেই এসেছি। সবকিছু জেনে বুঝেই আমি এই ঝড়-জলের রাতকে বেছে নিয়েছি। আর এই ঝড়-জলের রাতেই আমি আমার কাজ হাসিল করব। তাই এই শেষ বারের মতো বলছি, তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

নির্বোধের মতো কথা বোলো না। আমি এখনই চিৎকার করে প্রহরীদের ডাকব। আমার পতিকে জাগিয়ে তুলব। তারপর তোমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? তাই তোমাকে আমি শেষ বারের মতো বলছি, তুমি পালিয়ে যাও, পদ্মিনী।

আমাকে তুমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ, মনোরমা। আমি জানি, পরবের জন্য তুমি আশপাশের সব প্রহরীদের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছ। দেউড়িতে যে ক'জন আছে এই ঝড়-জলের শব্দে তাদের কানে তোমার ডাক পৌঁছবে না। তারা কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে

আর তোমার পতির কথা বলছ? আকণ্ঠ মদ গিলে যে মানুষটা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তার কথা বলছ? আমি জানি, কাল সকাল ন'টার আগে তোমার ওই পতি দেবতার ঘুম ভাঙবে না, হুঁশ ফিরবে না।

পদ্মিনীর কথা শুনে মনোরমা বুঝতে পারল যে ওর প্রতিপক্ষ সব কিছু খোঁজখবর নিয়েই হাবেলিতে প্রবেশ করেছে। এই মুহূর্তে ওদের এই খাস মহল যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে পদ্মিনীর তা জানা আছে। আর তাই দুশমনির এ সুযোগ ও নষ্ট করবে না। ও দুশমনি করবে! ও পতিহত্যার বদলা নেবে!

এইসব কথা চিন্তা করে মনোরমা এবারে শঙ্কিত হল। ওর কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক তখনই অর্জুন দম্পতির শোয়ার ঘরে এক দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গেল।

ওই ছোট্ট শিশুর কান্নার শব্দ শুনে পদ্মিনী অবাক হয়ে অর্জুন দম্পতির শোয়ার ঘরের দিকে চাইল। মনোরমা পদ্মিনীর মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, আমার বিন্দিয়া কাঁদছে। আমার ছোট্ট গুড়িয়া কাঁদছে। ওর ক্ষিদে পেয়েছে। ওর গলা শুকিয়ে গেছে ও আমার বুকের দুধ চাইছে।

দিদি, আমায় তুমি দয়া কর। আমায় তুমি করুণা কর। দয়া করে, করুণা করে তুমি আমার পতির প্রাণ ভিক্ষা দাও। পতি বাঁচলে আমি বাঁচব। আমি বাঁচলে তবেই আমার বিন্দিয়া বাঁচবে। আমার ছোট্ট গুড়িয়া বাঁচবে।

পদ্মিনী মনোরমার কথায় কোন সাড়া না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে মনোরমা বলল, দিদি, আমি পর পর দু'টি সন্তানকে হারিয়েছি। জন্মের তিনদিনের মধ্যেই তারা মারা গেছে। আমার বুকে শেল বিদ্ধ করে তারা চলে গেছে আর আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি।

পদ্মিনী কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনোরমা বলল, জীবনে আমরা অনেক পাপ করেছি। আর তাই আমরা আমাদের দু'টি সন্তানকেই অকালে হারিয়েছি। কিন্তু বিন্দিয়া বেঁচে আছে। ওর তিনমাস বয়স হল। ও আজও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে। ওকে তুমি বাঁচতে দাও। ওর প্রাণ ভিক্ষা দাও, দিদি।

কিন্তু মনোরমার কথায় কোন সাড়া না দিয়ে পদ্মিনী আগের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন কয়েক পা এগিয়ে এসে মনোরমা পদ্মিনীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসল। তারপর হাতের খোলা তলোয়ারখানা পদ্মিনীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে ও হাতজোড় করে বলল, দিদি, বিন্দিয়াকে কোলে পেয়ে আমি স্বর্গসুখ লাভ করেছি। সেই স্বর্গসুখ হতে আমায় তুমি বঞ্চিত কোরো না। দয়া কর দিদি, দয়া কর। দয়া করে আমাকে তুমি আমার পতির প্রান ভিক্ষা দাও। আমার বিন্দিয়ার প্রান ভিক্ষা দাও।

সেই সময় মনোরমার শাশুড়িমা ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠলেন, ও বউ ঘুমোলি নাকি? মেয়েটা যে কেঁদে কেঁদে সাড়া হল! ওকে মাই দে!

মনোরমা পদ্মিনীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসেছিল। ওর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ারছিল। পদ্মিনীর চোখ দু'টিও বাষ্পায়িত হয়ে উঠেছিল। পদ্মিনী বুঝতে পারছিলেন য তিনি হেরে গেছেন। ওই ছোট্ট বিন্দিয়ার কাছে তিনি হেরে গেছেন। তাঁকে এবার ফিরে যেতে হবে। তাই মনোরমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, যাও, ঘরে যাও। বিন্দিয়া কাঁদছে। ওকে বুকের দুধ দাও।

বিন্দিয়া একনাগাড়ে কেঁদে চলেছিল। মনোরমা পদ্মিনীর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে শোয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পদ্মিনী কিছুক্ষণ মনোরমার চলার পথের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্ধকারে মিশে গেলেন। বাইরে তখন ও প্রবল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছিল।

রুকমিনিবাঈ চুপ করতেই আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কী তুমি তোমার পথ রক্ষা করতে পারনি? পতিহত্যার বদলা নিতে পারনি, লাতিমাসি?

না, পারলাম না। ওই বিন্দিয়ার জন্য পারলাম না।

বাত হল কী, অর্জুনের বউটা অর্জুনকে বহুত পেয়ার করত। অর্জুনের কলিজায় ছুরা বসালে ওর বউটা হয়তো আত্মহত্যা করত। আউর বউটা আত্মহত্যা করলে বিন্দিয়া বাঁচত না। ও বেচারী মারা যেত। তো ইহ্ সব বাত চিন্তা করে হামি ফিরে আসলাম। বদলা নিতে পারলাম না।

শেষে লাতিমাসি বললেন, বহুত বুরা কহানী শুনালাম তোকে। আখন একটা খুশ খবর ভী শুনাচ্ছি। শুন। তোর সাহানা কাকীমার বাচ্চা হোবে। বহুত জলদী হোবে।

কথায় কথায় আমরা অনকেটা পথ চলে এসেছিলাম। নূরপুরের তেমাথা রাস্তায় পৌঁছে গেছিলাম। লাতিমাসি বললেন, ইবারে তু ঘর যা। হামি আর যাবে না। কথা ক'টি বলেই উনি বাঁ হাতের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন।

ডান হাতে তুফানের লাগাম ধরে আমি নূরপুরের তেমাথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। লাতিমাসির চলার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি ওঁর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলাম। ওঁর মানবিকতার কথা, ওঁর উদারতার কথা ভাবতে লাগলাম।

* * *

আগন্তুক থামলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর রামলোচন খুড়ো বললেন, তা ভায়া, রাত যে শেষ হতে চলল। তোমার দেবলাবৌঠান আর দেবযানীর উপাখ্যান শুরু কর এবারে।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতারাও একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবারে আপনি আপনার দেবলা বৌঠান আর দেবযানীর উপাখ্যান শুরু করুন।

তখন আগন্তুক বললেন, তো দেবযানীর কথা মতো পরবর্তী অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে আমি যেয়ে হাজির হলাম নীলসায়রের শান বাঁধানো ঘাটে। তারপর তুফানকে একটা গাছের নীচু ডালে বেঁধে রেখে আমি ঘাটের শান বাঁধানো সিঁড়িতে যেয়ে

বসলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম দেবযানীর জন্য। হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে।

আমি বসে রইলাম। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারী করতে লাগলাম। এরপর রাত দেড়টা বাজল। দু'টো বাজল। কিন্তু দেবযানীর দেখা পেলাম না। ভাবলাম, দেবযানী কি ব্যাপারটা ভুলে গেল! ও যে কথা দিয়েছিল! সে কি মিথ্যে?

কিন্তু না। মিথ্যে নয়। খানিক বাদেই বুঝলাম দেবযানী মিথ্যে কথা বলেনি। একটা মস্তবড় অ্যালবাট্রসের মতো দেবযানী আকাশ পথে ভেসে এসে সিঁড়ির চাতালের অদূরে নামল। তারপর হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ও বলল, একটু দেরী হয়ে গেল। তুমি রাগ করোনি তো? আসলে আজ অমাবস্যা কিনা। তাই গ্রামে একটা অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে যেতে হয়েছিল।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আঁধার রাতে এতটা পথ তুমি একা একা এসেছ। তোমার ভয় করেনি তো?

ও জিজ্ঞাসা করল, কিসের ভয়, ভূতের? সেই সাহেব-ভূতটার কথা বলছ? সেটা পালিয়েছে। কিছুদিন উৎপাত করেছিল। এখন নেই।

তারপর ও বলল, আমাদের সমাজের মেয়েরা আঁধার রাতে একা একাই চলাফেরা করে। স্বেচ্ছাবিহার করে। কিন্তু তাই বলে তারা স্বেচ্ছাচারিণী নয়। সমাজ সেদিকে কড়া নজর রাখে।

তারপর ও আবার বলল, আমাদের সমাজের মেয়েরা তাদের নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করতে পারে। তাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু পরে সে বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি নিতে হয়। সদস্য-সভার অনুমোদন নিয়ে সভাপতি সে বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দেন। কিন্তু সদস্য-সভা অনুমোদন না করলে মেয়েদের নিজের পছন্দের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি মেলে না। সেক্ষেত্রে ওই সভা তাকে এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ ও করতে পারে।

এছাড়া বাপ-মায়ের পছন্দ-করা ছেলে মেয়েদের সামাজিক বিয়েও আমাদের সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে।

দেবযানী সে রাতেও ফুলসাজে সেজেছিল। নীল সায়রের শান বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। আমার কাছাকাছি। খুব কাছাকাছি। ওর গা থেকে টাটকা ফুলের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছিল। ভারি ভাল লাগছিল। খু-উ-ব ভাল লাগছিল। কেমন যেন একটা সুখানুভূতি হচ্ছিল। সারা শরীরে শিহরন জাগানো সুখানুভূতি। অমন সুখানুভূতি আমার আগে কখনো হয়নি।

আমার সেই বাল্যবন্ধু, পাকা-পাকা-কথা-বলা রমেন বিয়ে করেছিল। ওর ফুলশয্যার রাতের সুখানুভূতির কথা ও আমাকে শুনিয়েছিল। আমার মনে হল ফুলশয্যার রাতে নববধূর সান্নিধ্যে এসে বরের ও বুঝি এমনই সুখানুভূতি হয়। সারা শরীরে শিহরণ জাগানো সুখানুভূতি!

এইসব কথা ভাবছিলাম। তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দেবযানী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সেদিন রাতে দেবলাকে দেখে তোমার ফুলপরী বলে মনে হয়েছিল, তাই না?

মুচকি হেসে আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, তেমনটাই মনে হয়েছিল। তারপর আমি বললাম, ফুলসাজে সেজে, আকাশ পথে ভেসে এসে তুমি যখন আজ ওই চাতালটার গাছে নামলে, তোমাকেও আমার ফুলপরী বলে মনে হচ্ছিল।

আমার কথা শুনে দেবযানী খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে ও বলল, আমাদের দু'জনকে দেখেই তোমার ফুলপরী বলে মনে হয়েছে, তাই না? কিন্তু ফুলপরীদের তো ডানা থাকে। আমাদের ডানা কোথায়?

একটু থেমে দেবযানী বলল, জারুলের চরায় দেবলার বিয়ে হয়েছিল। গান্ধর্ব মতে। আঁধার রাতে! তারার আলোয়। মেঘনাদদাদার সাথে। ওদের বিয়ের ফুল চরায় পড়েছিল। প্রচুর ফুল। পরদিন সকালে সেইসব ফুল গাঁয়ের ঝি-বউরা কাড়াকাড়ি করে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ফুলপরীর বিয়ের ফুল ভেবে। ও আবার হাসতে লাগল।

তারপর হাসি থামিয়ে দেবযানী বলল, মেঘনাদদাদা মানুষটা বড় ভাল। সরল, সাদাসিধে। ও কলকাতায় থেকে পড়ে। কালেজে। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সন্ধ্যা বেলায় নদীর চরায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাওয়া খাচ্ছিল। ওদিকে দেবলা ও সেদিন চরায় হাওয়া খেতে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই যায়। তো ওখানেই দু'জনের প্রথম দেখা।

দেবলাকে অমন একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখে মেঘনাদদাদা ওকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? কোথায় থাকেন? আপনাকে এর আগে তো কখনো দেখিনি?

মেঘনাদদাদার প্রশ্ন শুনে দেবলা মজা করতে চাইল। তাই ও উত্তর দিল, আমি পত্নী। নাম দেবলা। নদীর উঁচু পারের ওই বড় জারুল গাছটায় থাকি। আমরা দেখা না দিলে তোমরা আমাদের দেখতে পাওনা। তাই এর আগে কখনো আমাকে দেখতে পাওনি। তবে আমি তোমাকে অনেকবার দেখেছি। তুমি তো স্বর্গীয় যতীন পোদ্দারের ছেলে মেঘনাদ, তাই না?

দেবলার কথা শুনে মেঘনাদদাদা অবাক হল। তবে মেঘনাদদাদা সরল, সাদাসিধে হলেও নির্বোধ তো নয়! কালেজে-পড়া ছেলে। তাই দেবলার রসিকতা ও বুঝতে পারল। এবং ও দেবলাকে বলল, আমাকে তুমি চেন তবুও এতদিন দেখা দাওনি। বড় বেরসিক তো তুমি! ক'দিন আগে দেখা দিলে আমার ছুটিটা ভাল কাটত। একজন সুন্দরীর সান্নিধ্যে সন্ধ্যাগুলো সুখসন্ধ্যা হয়ে উঠত। সুখসন্ধ্যাগুলো স্মৃতি হয়ে থাকত।

পেত্নী জেনেও তুমি আমার সান্নিধ্য পেতে চাও? তোমার পরাণে ভয়-ডর নেই নাকি?

না, নেই। কারণ তুমি পেত্নী নও। তুমি একজন সুন্দরী যুবতী।

হ্যাঁ, আমি সুন্দরী। এবং যুবতীও। কিন্তু আমি মানুষ নই।

তুমি মানুষ নও! তবে কী পরী? এই জারুলের চরকে লোকে পরীর চল জারুলবনের আড়ালের এই সুন্দর চরে পরীরা রাত্রে হাওয়া খেতে আসে। জলে নেমে জলকেলি করে। খিল খিল করে হাসে। দূর থেকে তাদের দেখেছে। তাদের হাসির শব্দ শুনেছে। তুমি কী তাদেরই একজন?

ওরা দু'জন আলাপ-পরিচয়ে মগ্ন ছিল। তাই নদীর বুকে ভেসে আসা ডিঙি ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওরা শুনতে পায়নি। ডিঙিটাকে ওরা দেখতে পায়নি। কিন্তু ডি থেকে রমজান নিকিরী ওদের দু'জনকে দেখেছিল। ওদেরকে লক্ষ্য করেছিল। ত নদীর কিনারায় এসে সে হাঁক ছাড়ল, এই আন্ধাঁর রাইতে নদীর চরায় কারা তোমরা?

মেঘনাদ রমজান নিকিরীর গলা চিনতে পারল। এবং ও উত্তর দিল, আ রমজান কাকা। আমি মেঘনাদ।

অঃ, ম্যাঘনাদ! কিন্তু তোমার লগে আর একজন কেডা, বাপ?

মেঘনাদ চেয়ে দেখল, ওর পাশে দেবলা নেই। তাই ও উত্তর দিল, আমার স আর কেউ নেই, কাকা। আমি একাই চরায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। হাওয়া খাচ্ছি।

কেউ নাই! কিন্তু আমার য্যান মনে হইল তোমার পাশে সোন্দর মতন একত মাইয়া খাড়াইয়া আছে! তোমার লগে গল্প করতা আছে!

না কাকা, তুমি ভুল দেখেছ। এখানে আমি একাই রয়েছি।

ভুল দেখছি! কও কী?

রমজান নিকিরী ডিঙি থেকে চরায় নেমে এল। ডিঙিটাকে ঠেলে চরায় তু দিল। তারপর মাছের ঝুড়িটাকে মাথায় নিয়ে, টিমটিমে হ্যারিকেনটাকে হাতে ঝুলি নিয়ে সে মেঘনাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর সে বলল, এই জারুলে চর ভাল নয়রে, বাপ! আন্ধাঁর রাইতে বেহেস্তের হুরীরা এইখানে হাওয়া খাইতে আ তারা গাঙের ঘাটে নাইমা গোসল করে। পানি ছিলায়। খিল খিল কইরা হাসে। অ মন পছন্দ মর্দ পাইলে তারা তারে ফুসলাইয়া লইয়া যায়। সেবারে কায়েত দি যোয়ান ছাওয়ালডারে তারা ফুসলাইয়া লইয়া গেল। ছাওয়ালডা আর ফিরা আ না!

তারপর রমজান মেঘনাদকে বলল, আর হাওয়া খাওনের দরকার নাই, বা অখন আমার লগে বাড়ি চল।

যাব কাকা। এখুনি যাব। তুমি এগোও। আমি আসছি।

তারপর মেঘনাদ প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইল। আর তাইও রমজান জিজ্ঞাসা করল, আজ কি মাছ পেলে, কাকা?

একটা বড় আইড় পাইছি, বেটা। কিন্তু মালোর পো বড় দাম হাঁকাইছে।

তাতে কি হয়েছে। আড়টা তুমি আমাদের বাড়িতে দিয়ে যাও। বড়দিদি এসে

ও, পারমিতা মা আইছে। জামাই বাবাজী ও আইছে নিশ্চয়?

হ্যাঁ, এসেছে। ভাগ্নীটাও এসেছে। মাছটা তুমি আমাদরে বাড়িতে দিয়ে যাও।

হ, তাই যাইতে আছি।

রমজান নিকিরী মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, হ্যারিকেনটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে নদীর ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। খানিকটা উঠে যেয়ে রমজান পিছু ফিরে দাঁড়াল। এবং সে হেঁকে বলল, দেরী করিস না, বেটা। চইলা আয়। তারপর সে আবার নদীর ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

চরায় দাঁড়িয়ে মেঘনাদ হেঁকে বলল, হ্যাঁ আসছি, কাকা। তুমি এগোও।

রামজান ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গেল।

আর মেঘনাদ চেয়ে দেখল দেবলা ওর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেঘনাদ অবাক হল। ও দেবলাকে জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ কোথায় লুকিয়েছিলে? ওই ধোপার পাটার আড়ালে?

দেবলা উত্তর দিল, কই, আমি লুকোয় নিতো! আমি তোমার কাছেই ছিলাম। তোমার পাশেই ছিলাম। হাওয়ায় মিশে ছিলাম।

যাও! তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি ওই ধোপার পাটার আড়ালে লুকিয়ে ছিলে, তাই না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে দেবলা বলল, যাও, বাড়ি যাও। দিদি-জামাইবাবু এসেছে। চুমকী এসেছে। এখন তোমাকে ওদের সঙ্গে থাকা উচিত।

তা না হয় গেলাম! কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে? কাল সন্ধ্যায় আসবে তো?

আসব। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

কেন? বেশিক্ষণ থাকতে পারবেনা কেন?

কাজ আছে।

কাজ! সুন্দরীরা আবার কাজ করে নাকি?

না, সুন্দরীরা কাজ করে না। তারা সারাক্ষণ পটের বিবি সেজে বসে থাকে।

বেশ। কাল না হয় তোমার কাজ আছে। কিন্তু পরশু তো আর কাজ নেই। ওদিন হাতে অনেকটা সময় নিয়ে এসো।

পরশুও আসতে পারব না।

কিন্তু কেন?

সব 'কেন'-র উত্তব হয় না। এর মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

এর মধ্যে আর দেখা হবে না! তবে কবে দেখা হবে?

আগামী মাসের অমাবস্যার সন্ধ্যায়। এইখানে।

আগামী মাসের অমাবস্যার সন্ধ্যায়? সে তো অনেক দেরী! ততদিনে তো আমার কালেজ খুলে যাবে। আমি কলকাতায় থাকব।

সে প্রসঙ্গে আর না যেয়ে দেবলা বলল, বাড়ি যাও। দিদি-জামাইবাবু এসেছে। আর আমিও চললাম।

দেবলা ধীর পদে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে মেঘনাদ জিজ্ঞাসা করল, কাল আসবে তো?

দেবলা ক্ষণিকের তরে পেছন ফিরে দাঁড়াল। এবং বলল, আসব। তারপর সে এগিয়ে গেল।

* * *

রমজান নিকিরীর মুখ থেকে সব কথা শুনে পারমিতা চিন্তিত হল। এবং সে রমজানকে জিজ্ঞাসা করল, কাকা, তুমি ঠিক দেখেছ, মেঘনাদ চরায় দাঁড়িয়ে একটা পরীর সঙ্গে কথা বলছিল?

হমা, আমি ঠিক দেখছি। ম্যাঘনাদ চরায় খাড়াইয়া একখান আস্ত হুরীর লগে কথা কইতে আছিল! হুরীডা আমারে দেইখা হাওয়ায় মিশ্‌শা গেল।

সর্বনাশ! এযে বড় ভয়ের কথা, কাকা!

হ মা, ভয়ের কথাই তো!

পাশ থেকে চুমকী জিজ্ঞাসা করল, হুরী কি মা?

মা উত্তর দিল, স্বর্গের পরী।

পরী কি?

স্বর্গের বেটাছেলে-ধরা মেয়েছেলে।

তারপর পারমিতা রমজানকে জিজ্ঞাস করল, তা কাকা, তোমার মাছটার দাম কত?

রমজান উত্তর দিল, দাম লইয়া তোমারে চিন্তা করতে হইব না। ওইডা আমি সরকার মশয়ের কাছ থিকা বুইঝা লমু। অখন উঠি, মা।

রমজান মাছের খালি ঝুড়ি আর হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই পারমিতার বর জগদীশ এসে সেখানে হাজির হল। জগদীশকে দেখে পারমিতা বলল, এদিকে কী কান্ড হয়েছে জান? মেঘনাদকে পরীতে ধরেছে! রমজান কাকা এইমাত্র খবর দিয়ে গেল। জারুলের চরায় পরীটাকে কাকা নিজের চোখে দেখেছে। একেবারে আস্ত একটা হুরী!

পারমিতার কথা শুনে জগদীশ বলল, পরীগুলো বড় একচোখো। এখানে এলে আমিও তো জারুলের চরায় বেড়াতে যাই। হাওয়া খেতে যাই। কিন্তু কই, আমার দিকে তো পরীগুলোর নজর পড়ে না? আমাকে তো পরীতে ধরে না?

আহা, কথার কি ছিরি! আমাকে তো পরীতে ধরে না! বলি পরীতে ধরলে তার কি দশা হয় জান? পুরুষ মানুষকে ধরে নিয়ে যেয়ে পরী তাকে বিয়ে করে। তারপর তাকে দিয়ে সে গা টেপায়। পা টেপায়। ফাইফরমাশ খাটায়। সে তাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রাখে, বুঝেছ?

পরীদের দেশে বুঝি পুরুষমানুষের বড় আকাল?

তাই তো শুনতে পাই।

এমন সময় পারমিতার মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে, পারো?

পাশ থেকে চুমকী উত্তর দিল, মামাকে পরীতে ধরেছে। জারুলের চরায়। রমজান দাদা নিজের চোখে দেখেছে।

তুই চুপ কর! পারমিতা চুমকীকে ধমক দিল।

তারপর ও ওর মাকে বলল, রমজান কাকা এসেছিল। একটা বড় আড় মাছ দিয়ে গেল। কুসুমের মাকে মাছটা কুটতে বলি। আর আজ রাতের রান্নাটা আমিই করব, মা।

তা করিস। কিন্তু রমজান মেঘনাদের কথা কি বলল?

ও কিছু নয়, মা। রমজান কাকার বয়স হয়েছে। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছে। ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।

চিন্তা করব না! তুই বলিস কিরে, পারো? একটু আগেই অমাবস্যা লেগেছে। এই আঁধার রাতে ছেলেটা একা একা চরায় রয়েছে। চরার উত্তরদিকে অতবড় একটা শ্মশান। ওদিকে তাকালেই গা ছমছম করে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। অমন ভয়ঙ্কর জায়গায় ছেলেটা একা রয়েছে!

তারপর জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, বাবা জগদীশ, তুমি একবার চরায় যাও। বড় টর্চটা সঙ্গে নাও। আর যাওয়ার পথে মালোপাড়ার কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

হ্যাঁ, যাচ্ছি মা, বলে জগদীশ পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা হাতে নিয়ে জারুলের চরার দিকে রওনা হল। তবে সে মালো পাড়ার কাউকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

জগদীশ নদীর উঁচু পারে দাঁড়িয়ে সুমুখের চরায় টর্চের আলো ফেলল। কিন্তু সেখানে সে কাউকে দেখতে পেল না। তখন নদীর ঢালে সতর্ক পা রেখে সে আস্তে আস্তে চরায় নেমে এল। কিন্তু মেঘনাদকে সে আশে পাশে কোথাও দেখতে পেল না।

জগদীশ চরার উত্তর দিকে চেয়ে দেখতে পেল শ্মশানে দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। আর জ্বলন্ত চিতাকে ঘিরে কয়েকজন শ্মশানযাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে তাদের অপ্রাকৃতজনের মতো দেখাচ্ছে।

জগদীশের মনে হল, মেঘনাদ হয় তো ওখানে থাকতে পারে। তাই সে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল।

নদীর উঁচু পারে মালোপাড়া। সেখানে শতাধিক মৎস্যজীবী পরিবারের বাস। মালো পাড়ার কোন এক উঁচু গাছের ডালে বসে একটা রাতের 'কোক পাখি' তখন থেমে থেমে কোক, কোক, বলে ডাকছিল। সে তার সঙ্গিনীকে কাছে ডাকছিল। আর

মালোপাড়ার কোন এক গৃহবধূ পাখিটাকে তখন সমানে গালাগালি করছিল। বলছিল অলক্ষুণে পাখি, তোর মরণ হয় না! আঁশ-বঁটি দিয়ে তোর গলা কাটব। দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা! হতচ্ছাড়া পাখি!

তা শুনে গৃহবধুর ছ-সাত বছরের মেয়েটা মাকে প্রশ্ন করল, মা, পাখিটাকে তুই অমন গালি দিচ্ছিস কেন? ওকে তুই মরতে বলছিস কেন?

মা উত্তর দিল, গালি দেব না তো কি সোহাগ করব? দেখলি নে, পাঁচু হালদারের জোয়ান-মরদ ছাওয়ালটা ক্যামন তিনদিনের জ্বরে ধড়ফড় করে মরে গেল! আরো কয়ট মরবে কে জানে! কথায় বলে, যে দ্যাশে ডাকে কোক সে দ্যাশে থোয় না লোক!

মা আর মেয়ের কথোপকথন শুনতে শুনতে জগদীশ শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। এবং চিতার কাছাকাছি যেয়ে সে দেখতে পেল, মৃতদাহের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একজন শ্মশান যাত্রী কাঁচা বাঁশ দিয়ে চিতা উসকে দিচ্ছে। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। চিতাকে ঘিরে কয়েকজন শ্মশানযাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন বৃদ্ধ চিতা থেকে খানিকটা দূরে বসে রয়েছে। চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে আর মেঘনাদ ওই বৃদ্ধের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপলকে সে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মেঘনাদকে দেখে জগদীশের মনে হল, একটু আগেই ও কেঁদেছিল। ওর গন্ডদেশে চোখেব জলের শুকনো দাগ এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটু এগিয়ে যেয়ে জগদীশ মেঘনাদের কাঁধে হাত রাখল। মেঘনাদ চিতার আগুনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জগদীশের মুখের দিকে চাইল। তারপর ও ধরা গলায় বলল, পাঁচু জেঠার ছেলে শৈলেনটা কেমন অসময়ে চলে গেল! ও আমার বাল্য বন্ধু ছিল। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, জামাইবাবু!

জামাইবাবু ওকে সান্ত্বনা দিল। বলল, দেখ, ভগবানের ইচ্ছায় মানুষ এই পৃথিবীতে আসে। আবার ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের যাওয়া-আসার ব্যাপারে তাই ভগবানের ইচ্ছাই শেষ কথা। এতে মানুষের কোন হাত নাই। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছারও কোন মূল্য নাই।

একটু থেমে জগদীশ বলল, বাড়ি চল, মেঘনাদ। মা চিন্তায় রয়েছেন।

তারপর দেবযানী বলল, আর ঠিক তখনই আমি জারুলচরের শ্মশানে যেয়ে হাজির হলাম। কারণ আমি জানতাম, দেবলা চরে হাওয়া খেতে গেছে। কিন্তু দেবলাকে দেখে আমি অবাক হলাম। আমি অবাক হলাম, কারণ আমি দেখলাম যে দেবলা সূক্ষ্ম দেহে মেঘনাদদাদার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মেঘনাদ দাদার মতো দেবলার মুখখানাও বিষন্ন।

আসলে আমাদের সমাজের কুমারী কন্যেরা অমন পরপুরুষের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায় না। ওটা রীতি নয়। ওটা সহবত নয়। আর তাছাড়া দেবলার বিষন্ন মুখখানাও আমাকে ধন্দে ফেলে দিল। ভাবলাম, তবে কী ওদের দু'জনের মধ্যে—।

বাধা দিয়ে আমি দেবযানীকে বললাম, দেখ তুমি ও আমাকে বড় কম ধন্দে ফেলনি, দেবযানী! কারণ এখনও পর্যন্ত আমি জানিনা তোমরা কারা। কী তোমাদের পরিচয়।

তোমরা ভূত নও। প্রেত নও। পরী নও। হুরী নও। দৈত্য নও। দানো নও। তবে তোমরা কারা? কী তোমাদের পরিচয়?

আমার প্রশ্ন শুনে দেবযানী কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। লক্ষ তারার মায়াবী আলোয় ওর মুখখানাকে তখন ঠিক পটে আঁকা অপ্সরার মতো মনে হচ্ছিল। ওকে আমার অপ্সরা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু না। ওর মুখের পানে চেয়ে বসে থাকা সমীচীন হবে না। ওর চোখে চোখ রেখে বসে থাকা সমীচীন হবে না। কারণ ওর চোখ দু'টি মায়াভরা। ও চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে। অমন চোখে চোখ রাখা নিরাপদ নয়। এসব ভেবে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি মুখ নীচু করলাম।

দেবযানী আমার মনের কথা বুঝতে পারল। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে ও বিষণ্ণ হল। এবং ধরা গলায় ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার চোখ দু'টোকে তোমার বড় ভয়, তাই না? তা এতই যদি ভয় তো এলে কেন?

কথা ক'টি বলে দেবযানী মুখ নীচু করল। মুখ নীচু করে ও আমার পাশে বসে রইল। কারণ ওর অভিমান হয়েছিল।

আমি দেবযানীর মনোভাব বুঝতে পারলাম। আমার ব্যবহারে ও ব্যথা পেয়েছে। ওর অভিমান হয়েছে। আর তাই আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, তোমাকে আমার কিসের ভয়? আর ভয়ই যদি পাব তবে এই অমানিশায় আমি তোমার কাছে ছুটে এলাম কেন?

তারপর আমি বললাম, দেখ, তুমি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছ। আর আমার দিনগুলোও কাটে শুধু তোমার চিন্তায়। প্রতি রাতে ভোরের আলো ফোটার আগে আমি যেটুকু ঘুমোই, স্বপ্নে আমি তোমাকে নিবিড় করে পাই। আর তাতেই আমি উজ্জীবিত হই।

আমার অমন খোলামেলা কথা শুনে দেবযানী লজ্জা পেল। মাত্র এক ঝলক আমার মুখের পানে চেয়ে ও ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, যাও! তুমি না—!

দেবযানী আমার পাশেই বসেছিল। তবুও আমি ওকে বললাম, আরো একটু কাছে এসো, দেবযানী। তোমার ওই তিলোত্তমা সম দেহটাকে একবার স্পর্শ করি। মাত্র একবার। মাত্র একবার স্পর্শ করে আমি ধন্য হই। আমার জীবনটাকে আমি সার্থক করি।

আমার কথা শুনে দেবযানী আমার মুখের পানে চাইল। তারপর বলল, কিন্তু তা যে সম্ভবনয়, বন্ধু!

কেন সম্ভব নয়? একটুকু ছোঁয়াতে তোমার এত আপত্তি?

আপত্তির কারণ আছে, বন্ধু।

একটু থেমে দেবযানী বলল, দেখ, আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছি। গ করছি। আর তুমি তোমার চক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করছ। তোমার কর্ণ দ্বারা আমা কথা শ্রবণ করছ। তোমার নাসিকা দ্বারা তুমি আমার দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছ। ব্যস এতেই সন্তুষ্ট থাক। এর বেশি কিছু চেও না। এর বেশি কিছু আমি তোমায় দি পারব না।

দেবযানীর কথা আমাকে আঘাত করল। আমি মুখ নীচু করলাম। দেবযানী পাশে আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

এবারে দেবযানী আমার কাছে সরে এল। তারপর গলা নামিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি, রাগ করলে?

কিন্তু আমি দেবযানীর জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলাম না। চুপ করে বসে রইলাম তখন দেবযানী বলল, দেখ, তোমরা মানুষ। তোমরা স্থূল দেহী, কিন্তু আমর সূক্ষ্মদেহী। তোমরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আমাদের অতি প্রিয়। তিথি বিশে আমরা বায়বীয় দেহ ধারণ করে তোমাদের কাছে আসি। আর শুধু তখনই তোমর আমাদের দেখতে পাও। আমাদেব কথা শুনতে পাও। এবং আমাদের সঙ্গে তোমর কথাবার্তা বলতে পার। কিন্তু সাধারণভাবে তোমরা আমাদের বায়বীয় দেহকে স্প করতে পার না। স্পর্শ করলেও তা অনুভব করতে পার না। উপলব্ধি করতে পা না। আর তাই তা স্মৃতিতেও ধরে রাখতে পার না। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, এটাই বাস্তব।

একটু থেমে দেবযানী বলল, তোমাদের মতো আমরাও জন্ম-মৃত্যু চক্রে বাঁধ তোমাদের মতো আমাদেরও জন্ম হয়। মৃত্যু হয়। যৌবন আসে। সাতরঙের রঙি যৌবন। আর সে যখন আসে, আমাদের মনেও অনুরনিত হয়ে ওঠে হাজারো আশা আকাঙ্ক্ষা। হাজারো চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা।

তারপর দেবযানী বলল, তুমি আমার বন্ধু এবং অতি প্রিয়জন। আর তোমা আমার ভালও লেগেছে। তাই আমার এই সূক্ষ্ম দেহটাকে একবার স্পর্শ করেই যা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হত। তুমি সুখী হতে, শান্তি পেতে। তবে আমার তাতে আপ ছিল না। কিন্তু তা যে হবার নয়।

দেবযানীর কথা শুনে আমি অবাক হলাম। ওর মুখের পানে চেয়ে আমি ও প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, মেঘনাদ তো দেবলাকে বিয়ে করেছে। ওদের দাম্পত্য প্রেম ক তাহলে দৈহিক সম্পর্ক শূন্য?

আমার প্রশ্ন শুনে দেবযানী মুখ নীচু করল। এবং মুখ নীচু করে ও উত্তর দি হ্যাঁ, তাই।

তারপর দেবযানী বলল, এক বছর আগে হাসি, আনন্দ আর পুষ্প বৃষ্টির ম দিয়ে মেঘনাদ এবং দেবলার বিয়ে হয়েছিল। গান্ধর্ব মতে। আঁধার রাতে। তারা

আলোয়। জারুলের চরায়। তারপর থেকে প্রতি মাসের অমানিশায় ওরা দু'জন জারুলের চরায় একত্রিত হয়। দু'জন দু'জনার মুখোমুখি বসে।. প্রেমালাপ করে। পাশাপাশি হাঁটে। গল্প করে। উন্মুক্ত চরায় ছুটোছুটি করে। তারপর এক সময় ক্লান্তিতে ওরা দু'জন চরায় ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হতেই পাখির কাকলি আর নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ওদের ঘুম ভাঙে। তখন ওরা দু'জন দু'জনার ঘরে ফিরে যায়। তারপর ওরা অপেক্ষা করে থাকে পরবর্তী অমানিশার জন্য। তো এই হল ওদের দাম্পত্য জীবন। এই হল ওদের দাম্পত্য প্রেম।

কিন্তু এমন দাম্পত্য প্রেমের পরিণতি কী?

জানি না। আমরা তা কেউ জানি না। এমন দাম্পত্য প্রেমের কোন্ পরিণতি ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষা করে রয়েছে, আমরা তা কেউ জানি না!

একটু থেমে দেবযানী বলল, বহুদিন আগে আমাদের গ্রামে এমনই এক অভূতপূর্ব প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল। তবে সে প্রেমের পরিণতি কিন্তু শুভ হয়নি। সে প্রেম পরিণয় অবধি গড়ায় নি। মাঝপথেই শেষ হয়ে গেছে। চির বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সে প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গল্পটা আমি তোমায় আগামী অমানিশায় শোনাব। এইখানে।

একটু পরে দেবযানী বলল, দীপ, রাত শেষ হয়ে আসছে। এবারে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে! তুমিও বাড়ি ফিরে যাবে। আগামী অমানিশায় আবার আমাদের দেখা হবে। এইখানে।

আসার সময় দেবযানী একটা মস্তবড় অ্যালবাট্রসের মতো আকাশ পথে ভেসে এসে সামনের চাতালটার কাছে নেমেছিল। এখন, যাওয়ার সময়ও বেদযানী সেই চাতালটাব কাছে এগিয়ে গেল। ক্ষনিকের তরে ও ফিরে দাঁড়াল। ফিরে দাঁড়িয়ে ও আমার মুখের পানে চেয়ে একবার মিষ্টি করে হাসল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে ও আকাশে ভাসল। আমি অবাক হয়ে ওর ভেসে চলার পথের দিকে চেয়ে রইলাম।

* * *

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, তো দেবযানীর কথা মতো আমি পরের মাসের অমানিশায় আবার যেয়ে হাজির হয়েছিলাম নীলসায়রের শান বাঁধানো ঘাটে। তারপর দেবযানীর মুখ থেকে শুনেছিলাম আমি সেই অভূতপূর্ব প্রেমের গল্প। যদিও সেটা ছিল এক বিয়োগান্ত গল্প। তবুও রাতের শেষ প্রহরে এখন আমি সেই গল্পটাই শোনাচ্ছি আপনাদের।

একটু থেমে আগন্তুক আবার বললেন, লক্ষ তারার আবছা আলোয়, শ্বেত শুভ্র বসন পরে, ফুল সাজে সজ্জিতা হয়ে সে রাতেও দেবযানী আমার পাশে বসেছিল। পা ঝুলিয়ে। নীল সায়রের সেই শান বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে।

বহুদিন আগের সেই অভূতপূর্ব প্রেমের গল্প শোনানোর আগে দেবযানী আমাকে

বলল, জান, দেবলার বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে সেবারে বেশ জটলা হয়েছিল। বিরিঞ্চি বোধ প্রথমে বাগড়া দিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে ও ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকেনি। উপরন্তু সেবারে ওকে সভা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

আমি বললাম, দেখ, বিরঞ্চি বোধকে তোমরা যতই অপছন্দ কর না কেন, ওর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। আর ও একটা নীতি নিয়ে চলে।

তোমার দিদির বিয়ের রাতে বিরিঞ্চি বোধ আমায় বলেছিল, দেবলা মেঘনাদকে কোন সন্তান দিতে পারবে না। স্বামীকে নিয়ে ও সুখের সংসার গড়তে পারবে না। স্বামীর সঙ্গে প্রেমে-কামে সেই সংসারকে ও সুখস্বর্গে পরিণত করতে পারবে না। কথাগুলো তো ও মিথ্যে বলেনি, দেবযানী!

দেবযানী বলল, তোমরা, মানে ছেলেরা মেয়েদের দেহকে বড় বেশি গুরুত্ব দাও। যেন দেহ ছাড়া আর প্রেম হয় না!

দেখ, দেবলা মেঘনাদের প্রতি পুরোপুরি একনিষ্ঠা। মেঘনাদকে ও ওর হৃদয়ের সবটুকু প্রেম উজার করে দিয়েছে। প্রতিটি অমানিশায় ও মেঘনাদকে সঙ্গ দেয়। সামনা-সামনি বসে ওরা দু'জন প্রেমালাপ করে। জারুলের চরায় ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটে। গল্প করে। ছুটোছুটি করে। ওরা দু'জন পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটায়। এত সবেও কী মেঘনাদের মন ভরে না?

যদি না ভরে? এত সবের পরেও যদি মেঘনাদ তৃপ্তি না পায়। অতৃপ্ত থেকে যায়। তখন?

ওটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ভবিষ্যতেই ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাবে। এখন গল্প শোন।

তারপর দেবযানী বলল, সেদিন দেবলার বিযের সামাজিক স্বীকৃতির বিচার-সভা বসেছিল আমাদের বাড়ির আঙিনায়। সন্ধ্যা বেলায়। খোলা আকাশের নীচে। আর কোন রকম ভনিতা না করে দেবলার মা সভাকে জানালেন, আমার একমাত্র মেয়ে দেবলা মনুষ্য সমাজের এক অতি সুদর্শন যুবককে গতকাল রাতে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছে। যুবকের নাম মেঘনাদ। সে জারুলগ্রাম নিবাসী প্রয়াত যতীন পোদ্দারের একমাত্র ছেলে। এই বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য আমি এই সভার কাছে আর্জি জানাচ্ছি।

তখন সভাপতি হিসাবে আমার বাবা দেবলার মাকে বললেন, শোন চপলা, গান্ধর্ব বিয়েকে আমাদের সমাজ সব সময়ই সমর্থন করে। এবং সে বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতিও মেলে। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু তোমার মেয়ে দেবলা বিয়ে করেছে মনুষ্য সমাজের এক যুবককে। আর এধরনের বিয়ের ঘটনা আমাদের সমাজে এর আগে কখনো ঘটেছে বলে আমাদের জানা নাই। তাই এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

তারপর আমার বাবা বললেন, এই সভায় উপস্থিত আমার পূজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধ
ং জ্ঞান বৃদ্ধাদের আমি অনুরোধ করছি, এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ
ব্যক্ত করুন।

তখন সুনন্দা নামে এক বৃদ্ধা, গ্রাম সম্পর্কে আমার পিসি, বললেন, এই ধরনের
য়র কথা আমিও কোনদিন শুনি নি। তবে মানুষের সঙ্গে আমাদের সমাজের
ক-যুবতীদের প্রেম-পিরিতির গল্প আমি অনেক শুনেছি।

আর সেসব গল্পগুলো দুঃখে ভরা। দুঃখের মধ্য দিয়েই সে সব প্রেম-পিরিতির
গুলো শেষ হয়ে গেছে। বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় নি।

একটু থেমে সুনন্দা পিসি বললেন, মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আমাদের
ত প্রিয়। আর বোধহয় সেই কারনেই আমাদের সমাজের যুবক-যুবতীরা মানুষের
ঙ্গ প্রেম-পিরিতিতে লালায়িত হয় আর আগুপিছু না ভেবে তারা মানুষের কাছে
ঁ যায়। কিন্তু এতে তারা সুখ পায় না। শান্তি পায় না। শুধু দুঃখ পায়।

একটু থেমে পিসি আবার বললেন, যুবক-যুবতীদের সাত রঙে রঙিন উজ্জ্বল,
হ্ল যৌবন কোন কালেও তাদের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে দেয় না। ভবিষ্যতের
ক তাকাতে দেয় না। সে শুধু আবেগতাড়িত করে। আবেগ তাড়িত করে সে
দের অসম প্রেমের অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ দিতে বলে। অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ
য় সে তাদের সুখ নামক শুকপাখিটার খোঁজ করতে বলে।

সুনন্দার কথার মাঝেই কয়েকজন যুবতী বলে উঠল, ঠাকরুণ, সভাপতির রায়
নর আগে তুমি আমাদের একটা অসম প্রেমের গল্প শোনাও। অন্ধকারময় গহ্বরে
প দিয়ে সুখ নামক শুকপাখি খোঁজার গল্প। তোমার গল্পটা হয়তো আমাদের
বষ্যৎ জীবনে কাজে লাগতে পারে।

কিন্তু এ ব্যাপারে সভাপতির অনুমতি প্রয়োজন। বললেন সুনন্দা।

অনুমতি দেওয়া হল। তুমি গল্প শোনাও। বললেন সভাপতি।

তখন সুনন্দা পিসি বললেন, আমার গল্পটা বহুদিন আগের। এবং এটা একটা
য়োগান্ত গল্প। তবুও আজকের দিনেও গল্পটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

একটু থেমে পিসি বললেন, আমি যখন যুবতী, সুলতা ছিল আমার অন্তরঙ্গ
হলী। সে ছিল রূপসী। এবং নৃত্যগীত পটীয়সী।

তো অমাবস্যার এক অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় সুলতা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেছিল।
টু আগে সম্মুখের সুদীর্ঘ বাঁওড়ের ওপারে সূর্য ডুবেছিল। সূর্যের ঈষৎ রক্তিমাতা
নও উঁচু আকাশের গায়ে লেগেছিল। পাখিরা দ্রুত কুলায় ফিরছিল। কিন্তু বাঁওড়
ততক্ষনে অন্ধকার নেমেছিল। আর বাঁওড় তীরের অন্ধকার তৃণময় প্রান্তরে
সুলতা তখন সন্ধ্যা-পারের রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় পেছনে
শব্দ শুনে সে পিছু ফিরে চাইল। এবং পিছু ফিরে চেয়ে সে শ্বেতশুভ্র
রোহনে কুমার রাজশঙ্করকে দেখতে পেল।

কুমার রাজশঙ্কর হল জমিদার সৌভদ্র শঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আড়াল-আবডা হতে সুলতা তাকে অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু কোনদিন সে তার সম্মু যায়নি। কারণ কুমার ছিল নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং ক্রূরমতি।

কিন্তু কুমার আজ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে সুলতা উঠে দাঁড়াল। এব অবাক হয়ে সে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। দু'জনে দু'জনার পানে চেয়ে রইল

একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর ঘোর কে যেতেই কুমার সুলতাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? কোথায় থাক?

আমার সহেলী উত্তর দিল, আমার নাম সুলতা। থাকি মারিগ্রামে।

মারিগ্রামে! ও গ্রামে কোন মানুষ থাকে নাকি?

আমি মানুষ, এমন কথা তোমায় আমি বলেছি নাকি?

সে কী! তুমি মানুষ নও? কিন্তু তোমার চেহারাটা তো মানুষের মতোই!

মানুষের মতো চেহারা হলেই সে মানুষ হয় নাকি? তোমার চেহারাটাও তে মানুষের মতো, কিন্তু তাই বলে তুমি মানুষ নাকি? মানুষের কোন গুণ তোমার মধ্ আছে নাকি?

এই সত্যি কথাটা কেউ তার মুখের ওপর ছুড়ে দিতে পারে এমন কথা কুমা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই সে ক্রুদ্ধ হল। এবং অজান্তেই তার হাতের চাবু ঊর্ধ্বে উঠে গেল। কিন্তু সেটা নীচে নেমে এসে সুলতার মুখের ওপর আছড়ে পড় না। সুলতার হাড়-হিম-করা চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে কুমার স্তব্ধ হয়ে গেল। তা ডান হাতে ধরা উদ্ধত চাবুক অতি ধীরে বাম হাতের কাছে নেমে এল। সে সংয হল। আর সুলতা তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁওড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

সুলতা চলে যাচ্ছে দেখে কুমার তাকে পেছন থেকে ডাকল। বলল, যেও সুলতা, যেওনা। একটু দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কুমারের ডাক শুনে সুলতা ঘুরে দাঁড়াল। এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে কুমারে মুখের পানে চেয়ে রইল।

কুমার তখন তার শ্বেত অশ্ব হতে নীচে নেমে এল। এবং অশ্বের লাগাম ধরে সুলতার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর সে সুলতাকে বলল, আমি অমানুষ একথ সবাই জানে, সবাই বলে। তবে তারা ঠারেঠোরে বলে, আড়ালে-আবডালে বলে অথচ তুমি একজন মেয়েছেলে হয়েও আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে অমানু বললে। আমি তোমার সাহসের তারিফ করছি।

কুমারের কথা শুনে সুলতা বলল, কুমার, তুমি একজন জমিদার পুত্র হয়ে যথাযথ সহবত শেখনি। তোমার জানা উচিত যে ভদ্রজনেরা কাউকে মেয়েছে বলেন না। তাঁরা মহিলা বলেন, অথবা ভদ্রমহিলা বলেন।

সুলতার কথা শুনে কুমার লজ্জা পেল। এবং সে তাকে বলল, সুলতা, আমা

সব কিছুই লাগাম-ছাড়া। কেমন যেন ছন্নছাড়া। আমি শুধু অমানুষ নই, অভদ্রও। আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি চলি।

কুমার একলাফে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তারপর সে বাঁওড়ের উল্টোদিকের বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আর পেছনে দাঁড়িয়ে সুলতা অপলকে তার চলার পথের পানে চেয়ে রইল।

একটু থেমে সুনন্দা পিসি বললেন, গল্পটা এখানে শেষ হয়ে গেলেই ভাল হত। উচ্ছল যৌবনের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে সুলতা তাহলে আর অসম প্রেমের অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যেত না। অসম প্রেমের অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে সে সুখ নামক শুকপাখিটার খোঁজ করতে যেত না। আর তাহলে বিচ্ছেদ ও হত না। বেচারী দুঃখ ও পেত না।

কিন্তু তেমনটা হল না। সুলতার উজ্জ্বল, উচ্ছল যৌবন তেমনটা হতে দিল না। সে সুলতাকে প্ররোচনা দিল। সে সুলতাকে প্ররোচিত করল। সে তাকে অসম প্রেমের অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে সুখ নামক শুকপাখিটার খোঁজ করতে বলল। আর তাই তার পরদিন সন্ধ্যায় সুলতা আবার যেয়ে হাজির হল বাঁওড় তীরে। এবং বাঁওড় তীরে হাজির হয়ে সে দেখতে পেল, শ্বেত অশ্বটিকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে কুমার আগে থেকেই সেখানে বসে রয়েছে। উদাস নয়নে সে দূর দিগন্ত পারে চেয়ে রয়েছে। একটু আগেই যেখানেদিনের ক্লান্ত সূর্য ঢলে পড়েছে।

সুলতা তার মনিবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে কুমারের শিক্ষিত অশ্বটি হ্রেষা রব করে উঠল। হ্রেষারব করে উঠে সে তার মনিবকে সুলতার আগমন বার্তা পৌঁছে দিল।

অশ্বের হ্রেষারব শুনে কুমার পেছন ফিরে চাইল। এবং সে দেখতে পেল সুলতা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতাকে আহ্বান করল। বলল, এসো সুলতা, এসো।

সুলতা এগিয়ে এসে কুমারের সম্মুখে দাঁড়াল। কুমার সুলতাকে জিজ্ঞাসা করল, আবার এলে? অমানুষ জেনেও এলে?

মুচকি হেসে সুলতা উত্তর দিল, হ্যাঁ, এলাম। কারণ আমি নিজেও মানুষ নই কিনা, তাই এলাম।

মৃদু হেসে কুমার বলল, তাহলে ভালই করেছ। এসো, বসা যাক।

ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল।

আগন্তুক থামতেই পটসুন্দর বলল, নতুন খুড়ো, তোমার কাছে আমরা ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভূতের গল্পের নাম করে তুমি আমাদের একটার পর একটা প্রেমের গল্প শুনিয়ে চলেছ। এবারে তুমি আমাদের ভূতের—।

পটসুন্দরের কথায় বাধা দিয়ে রামলোচন খুড়ো বললেন, আঃ পট! ভায়া তো আমাদের প্রেমের গল্পের মধ্য দিয়ে ভূতের গল্পই শোনাচ্ছে। তুই আবার এতে বাগড়া দিচ্ছিস কেন?

খড়োর প্রশ্ন শুনে পটসুন্দর উত্তর দিল, ভয় ছাড়া আবার ভূতের গল্প জমে নাকি!

ভয়টাই হল ভূতের গল্পের আসল মশলা। তাই ভূতের গল্পে ওটা চাই-ই চাই। আসল ভূতের গল্পে ভূতগুলো তাই ভয় দেখায়, দাঁত খিঁচায়। কিন্তু এসব গল্পে সে সব কোথায়?

খুড়ো বললেন, দেখ পট, জমিদারের খাজনা দেওয়ার সময় এগিয়ে এলে ফি বছর তোরা ভয়ে সিটিয়ে থাকিস। ফি বছর তোরা পেয়াদার দাঁত খিঁচুনি শুনিস। বাড়িতে প্রতিদিন তোরা বউমাদের ভয়ে সিটিয়ে থাকিস। পান থেকে চুন খসলে তোরা তাদের দাঁত খিঁচুনি শুনিস। এত সবেও তোদের প্রাণ ভরে না!

তাছাড়া তোর তো আবার ফিটের ব্যামো আছে। এই রাত দুপুরে একটা কাণ্ড বাধাবি নাকি?

তারপর আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে খুড়ো বললেন, নাও ভায়া, তুমি তোমার মতো করে বলে যাও। আমরা শুনছি।

তো আগন্তুক তখন আবার সেই সুমন্দা পিসির গল্পই শুরু করলেন। এবং পটসুন্দর তা মুখ বেজার করে শুনতে লাগল।

কুমার এবং সুলতা পাশাপাশি বসে ছিল। একটু পরে কুমার বলল, আমার পাঁচ বছর বয়সে আমি মাকে হারিয়েছি। সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমি মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বাবা জমিদারীর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই আমি কোনদিন আমার বাবার স্নেহ ও পাইনি। কয়েকজন পরিচারক-পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে আমি বড় হয়ে উঠেছি। আমি বড় হয়ে উঠেছি, কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। আমি অমানুষ হয়ে উঠেছি।

আমার মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু আমার বিমাতাকে আমি কোনদিন মা বলে মেনে নিতে পারিনি। তবুও কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজশঙ্কর জন্মগ্রহণ করার পর সবকিছু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। কেন জানিনা, আমাকে একজন দক্ষ জমিদার করে গড়ে তোলার জন্য আমার বিমাতা একেবারে উঠেপড়ে লাগলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমার জন্য পাঁচজন যুবা বয়সের শিক্ষক নিয়োগ করলেন। সেই সব শিক্ষকগণ আমাকে লেখাপড়া এবং সহবত শেখাতে লাগলেন অস্ত্রশস্ত্র এবং শারীরিক কসরত শেখাতে লাগলেন। নানা প্রকার শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল।

একটু থেমে কুমার বলল, আমার সহবত শিক্ষার নমুনা তো তুমি গতকালই পেয়েছ। আমার অন্যান্য শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতেও তোমার বেশি দেরী হবে না।

আর এখানে তোমাকে আমি একটা কথা বলে রাখি, সুলতা। আমার বিমাতার নিয়োজিত সেই পঞ্চশিক্ষক এখনও আমার সঙ্গেই আছেন। শিক্ষান্তে আমি তাঁদের ত্যাগ করিনি। বরং আমি তাঁদের মিত্রপাশে আবদ্ধ করেছি। তাঁরা আমার 'পঞ্চমিত্র' যদিও বিমাতার অপপ্রচারে তাঁরা বর্তমানে 'দুষ্টপঞ্চক' নামে অখ্যাত হয়েছেন ব্যাপারটা দুঃখ জনক।

কুমারের কথা শুনে সুলতা বলল, কুমার, তুমি তোমার অতীতকে ভুলে যাও। অন্ধকারময় অতীতকে ভুলে তুমি বর্তমানের আলোয় এসে দাঁড়াও। তোমার ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা বিসর্জন দিয়ে তুমি মানুষকে ভালবাস। প্রজাদের ভালবাস। আগে তুমি একজন ভাল মানুষ হও। তাহলেই ভবিষতে তুমি একজন ভাল জমিদার হতে পারবে। আর আমাকেও তোমার পাশে পাবে। অন্যথায় তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

কুমার বলল, সুলতা, তোমার সঙ্গে আমার মাত্র দু'দিনের পরিচয়। তোমাকে আমি সম্যকরূপে চিনি না। সম্যকরূপে জানি না। কিন্তু তোমার কথাগুলো আমার ভাল লাগছে। তোমকেও আমার ভাল লাগছে। কারন এর আগে আমাকে কেউ এমন ভাল কথা বলেনি। এমন করে ভাল হতে বলেনি। আলোর দিশা দেখায়নি। সবাই আমাকে শুধু মন্দ বলেছে। অমানুষ বলেছে। সামনে বলতে সাহস পায়নি তাই আড়ালে-আবডালে বলেছে। সোজাসুজি বলতে সাহস পায়নি তাই ঠারেঠোরে বলেছে।

সুলতা, আমি জানি না, অতীতের অন্ধকারকে ভুলে আমি বর্তমানের আলোয় এসে দাঁড়াতে পারব কিনা। আর পাঁচজন ভাল মানুষের মতো আমিও একজন ভালমানুষ হতে পারব কিনা। মানুষকে ভালবাসতে পারব কিনা। প্রজাদের ভালবাসতে পারব কিনা। তবে তোমার কথাগুলো আমি মনে রাখব। আমি ভাল হতে চেষ্টা করব। তুমি আমায় ত্যাগ কোরো না। আমার সঙ্গে থাক। আমার পাশে থাক।

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, কুমার এবং সুলতা কাছাকাছি আসার কিছুদিন আগে জমিদার সৌভদ্রশঙ্কর একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুখ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। এবং তখন তিনি একখানি উইল করেছিলেন, যাতে করে নাকি তাঁর মৃত্যুর পরে সম্পত্তি নিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে কোন বিবাদ না হয়। কারণ তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিমাতার অহি-নকুল সম্পর্কের কথা সবিশেষ অবগত ছিলেন।

যদিও রাজাবাবু তাঁর মাতৃহারা-জ্যেষ্ঠপুত্র রাজশঙ্করকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন, তবুও কনিষ্ঠ পুত্র তেজশঙ্কর এবং ছোটরানী জগদম্বা দেবীকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার ইচ্ছা তাঁর মনে স্থান পায় নাই। আর তাই তাঁর উইলে তিনি পুত্রকে সম্পত্তির আটআনা অংশ দিয়েছিলেন। এবং বাকী আটআনা অংশ তিনি পুত্র ও ছোটরানীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

জ্ঞানী জনেরা বলেন, এদেশে উইল নাকি প্রায়ই গোপন থাকে না। তো এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। উইলে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার কথা অধিক দিন গোপন রইল না। কথাটা অতিশীঘ্র পাঁচকান হয়ে গেল।

আর রাজাবাবুর উইলের ভাগ-বাটোয়ারার কথা জ্ঞাত হয়ে ছোটরানী যার পর নাই অখুশি হলেন। আর শুধু অখুশি নয়, এহেন ভাগ-বাটোয়ারায় তিনি অপমানিত

বোধ করলেন। এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারনেই তিনি বড় কুমার রাজশঙ্করের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হলেন। তাঁর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কথায় বলে, কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। তো জমিদার সৌভদ্রশঙ্করের জমিদারীর শিওল গ্রামে এমনই এক সর্বনাশ ঘটে যাওয়ায় রানী জগদম্বা দেবীর কাছে তা পৌষমাস হয়ে দেখা দিল। তিনি একটা সুযোগ পেলেন। বড়কুমারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ তাঁর হাতে এসে ধরা দিল। তিনি মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

রাজাবাবুর জমিদারীর শিওল গ্রামে রাম রাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন গরিব ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী এবং অতি সুন্দরী বাল বিধবা কন্যা সুবর্ণলতাকে নিয়ে বাস করতেন। একদিন বিকালে গাঙের ঘাটে জল আনতে গিয়ে সুবর্ণলতা নিখোঁজ হল। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। কিন্তু সুবর্ণলতার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, বালবিধবা সুবর্ণলতা যৌবন-জ্বালা সহ্য করতে না পেরে জলে ডুবে মরেছে। কেউ বলল, গাঙের ঘাট থেকে তাকে জল দস্যুরা অপহরণ করেছে। আবার কেউ কেউ ফিস ফাস শুরু করল এই বলে যে এই দুষ্কর্ম নিশ্চয় জমিদার পুত্রদেরই কারো। হয় রাজশঙ্কর, নয়তো তেজশঙ্কর সুন্দরী সুবর্ণলতাকে তুলে নিয়ে যেয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাদের সন্দেহের অবশ্য সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত ছোট কুমার তেজ শঙ্করের দিকেই অধিক।

তো গ্রামে এমন একটা অঘটন ঘটে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা দুশ্চিন্তায় পড়ল। এবং তারা ভেবে দেখল সে তাদের প্রত্যেকের ঘরেই যুবতী কন্যা এবং যুবতী বধু আছে। সুতরাং এই দুষ্কর্মের একটা বিহিত করতে না পারলে তারা তাদের গ্রামে শান্তিতে বাস করতে পারবে না। তাই পরদিন গ্রামের ক'জন মাতব্বর একত্রিত হয়ে, ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাজসমীপে যেয়ে হাজির হল। এবং রাজসমীপে হাজির হয়ে তারা দেখতে পেল, রাজা সৌভদ্র শঙ্করের পাশে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রানী জগদম্বা দেবীও বসে রয়েছেন।

তো হঠাৎ এমন একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গ্রামবাসীরা প্রমাদ গুনল। কারন তেজশঙ্কর হল রানীজগদম্বা দেবীর একমাত্র সন্তান। এবং সম্প্রতি সে কতকগুলি কুকর্ম করা সত্বেও স্নেহান্ধ রানীমা তাঁর সন্তানের কোন দোষ খুঁজে পাননি। তো এহেন অবস্থায় গ্রামবাসীরা যদি তাদের সন্দেহের কথা রাজসমীপে নিবেদন করে তাহলে রানীমা ক্রুদ্ধ হবেন। এবং তাঁর ক্রোধানলে হয়তো সারা শিওল গ্রামটাই ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

গ্রামবাসীরা যখন নীচুগলায় এইসব বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল ঠিক তখনই রাজাবাবু তাদের আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। তখন সমবেত গ্রামবাসী ব্রাহ্মণকে এগিয়ে যেয়ে তাঁর বিধবা কন্যার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা রাজসমীপে নিবেদন করার জন্য অনুরোধ করল।

উপায়ন্তর না দেখে ব্রাহ্মণ তখন কম্পিত হৃদয়ে রাজাবাবুর নিকট এগিয়ে গেলেন। এবং তাঁর বালবিধবা কন্যা সুবর্ণলতার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা রাজাবাবুকে খুলে বললেন।

কিন্তু ঘটনার বিবরণ শুনে রাজাবাবু যখন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয় কিনা। ব্রাহ্মণ তখন মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে রানীমার উপস্থিতিতে গ্রামবাসীদের সন্দেহের কথা রাজাবাবুকে বললে সারা শিওল গ্রামটাই রানীমার বিষ নজরে পড়বে এবং তার পরিনতি হবে ভয়ঙ্কর।

আবার অন্যদিকে, রানীমার মন রাখতে যেয়ে যদি তিনি গ্রামবাসীদের সন্দেহের কথা রাজাবাবুকে না বলেন, তাহলে তিনি নিজে গ্রামবাসীদের বিষ নজরে পড়বেন। এবং তার ফল স্বরূপ গ্রামের মাতব্বরেরা তাঁকে অবশ্যই একঘরে করবেন। ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবেন। সে ও হবে তাঁর আর এক বিপদ।

এইসব কথা চিন্তা করে ব্রাহ্মণের মাথা ঘুরতে লাগল। গায়ে ঘাম দেখা দিল। রাজাবাবুর সম্মুখে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন।

ব্রাহ্মণের এহেন অবস্থা দেখে রাজাবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

তখন ব্রাহ্মণ বললেন, রাজা মশাই, আমাকে এক গেলাস খাবার জল দিতে বলুন।

রাজামশাই তখন একজন প্রহরীকে খাবার জল দিতে বললেন।

প্রহরী ব্রাহ্মণকে এক গেলাস খাবার জল এনে দিল। এবং জল খেয়ে ব্রাহ্মণ কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। তখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি অতি বিনয়ের সঙ্গে রাজামশাইকে বললেন, আজ্ঞা, রাজা হলেন প্রজার পিতার সমান। তাই অধম সন্তানকে অভয় দান করলে তবেই সে সত্য কথা বলার সাহস পায়।

রাজামশাই বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলুন। আপনার কাকে সন্দেহ হয়!

ব্রাহ্মণ তখন করজোরে বললেন, আজ্ঞা, অপরাধ নেবেন না, রাজামশাই। এ ব্যাপারে আমাদের বড়কুমার রাজশঙ্করকে সন্দেহ হয়।

ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনে রাজা সৌভদ্রশঙ্কর দাঁতে দাঁত চাপলেন। কিন্তু রানী জগদম্বা দেবীর মুখে তখন হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

যাহোক, রাজামশাই ব্রাহ্মণকে তাঁর নিখোঁজ কন্যার খোঁজ করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন।

ব্রাহ্মণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বিদায় হতেই রানীমা রাজাবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বক্রোক্তি করলেন। বললেন, শুনলেন তো স্বামী, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের গুণের কথা! এতদিন বিলিতি মদ, লক্ষ্ণৌয়ের বাইজী আর মোসাহেবদের মোসা হেবীতে মেতে

থেকেছে। মোসাহেবদের প্ররোচনায় সে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছে। তাদের পিঠে চাবুক মেরেছে। ঘরে আগুন দিয়েছে। আর এখন সে প্রজাদের ঘরের সুন্দরী যুবতীদের অপহরণ করতে শুরু করেছে। ব্যভিচারের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

একটু থেমে রানী বললেন, আপনি তো তালুকে-মুলুকে ঘুরে বেড়ান। আর তাই সব কথা আপনার কানে পৌঁছয় না। কিন্তু ওর অপকর্মের সব কথা আমার কানে আসে। সে সব কথা শুনলে আপনি আঁতকে উঠবেন, স্বামী!

একটু থেমে রানী আবার বললেন, আমাদের চন্দনপুর জমিদারীর প্রজারা যথেষ্ট ধৈর্যশীল। আর তাই তারা মুখ বুজে কুমারের সব অনাচার সহ্য করছে। সব ক্ষোভ চেপে রাখছে। কিন্তু তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যদি একদিন বিদ্রোহের রূপ নেয়, তখন কী হবে, স্বামী?

রানীর এতকথার পরেও রাজাবাবু কিন্তু তার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি গম্ভীর মুখে আসন ত্যাগ করে কাছারি বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আর রানীর মুখে তখন ক্রুর হাসি ফুটে উঠল।

রাজাবাবু কাছাড়ি বাড়ির দিকে চলে যেতেই রানীমা দু'বার হাতে তালি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রানীমার খাস পরিচারিকা পারুল এসে তাঁকে হাতজোড় করে প্রণাম করল। রানীমা তাকে বললেন, পারুল, ছিদাম ঢালিকে একবার এখুনি ডেকে দে বলবি খুব জরুরী দরকার।

পারুল পুনরায় রানীমাকে প্রণাম করে চলে গেল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিদাম ঢালি রানীমার খাস মহলে এসে হাজির হল তারপর হাতজোড় করে প্রণাম করে সে বলল, আদেশ করুন রানীমা।

ছিদামের পরনে খাটো মোটা ধুতি। গায়ে লাল ফতুয়া। কোমরে এঁটে বাঁধা গামছা মাথার ঝাঁকড়া চুল বাঁধা লাল রুমালে। পাকানো মোটা গোঁফ। কপালে লেপা গোল সিঁদুর। ডানহাতের কবজিতে মোটা তামার বালা। গলায় কাল কারে ঝুলছে রূপোর তক্তি-তাবিজ। এবং বাঁ হাতে ধরা পাকা বাঁশের লাঠি।

রানীমা ছিদামকে বললেন, আমাদের শিওল গ্রামের প্রজা বৃদ্ধরাম রাম ভট্টাচার্যের সুন্দরী বিধবা কন্যা গতকাল বিকালে গাঙের ঘাটে জল আনতে যেয়ে নিখোঁজ হয়েছে শুনেছিস বোধহয়?

আজ্ঞে, শুনেছি রানীমা।

তাহলে একথাও শুনেছিস নিশ্চয় যে প্রজারা এ ব্যাপারে বড়কুমারকেই সন্দেহ করছে

কিন্তু বড়কুমার এ কাজ—।

বাধা দিয়ে রানীমা বললেন, কোন 'কিন্তু' নয়, ছিদাম। কারণ সন্দেহটা অমূলক নয়। এব্যাপারে প্রজাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক তাই তুই তোর লোকদের চারদিকে খোঁজ করতে বল। ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে খুঁজে

বের করতে বল। আর তুই নিজে বড়কুমারের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ। যেমন যেমন খবর পাবি, আমাকে জানাবি।

এখন যা।

ছিদাম পুনরায় রানীমাকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর ছিদাম ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রানী দু'হাত পেছনে করে, পুরষালী ঢঙে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। এবং তিনি মনে মনে ভেবে দেখলেন, যে ছিদাম ঢালি হল রাজাবাবুর খাস লোক। আর তাই ওর আনুগত্যও রাজাবাবু এবং বড়কুমারের প্রতিই অধিক। সে ক্ষেত্রে ছিদাম এবং ওর লোকজন নিখোঁজ ব্রাহ্মণ কন্যার খোঁজখবর যথাযথরূপে করবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ এতবড় একটা সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। কারণ এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে যদি একবার, শুধু একবার বড় কুমারের লাম্পট্য প্রমান করা যায়, তবে রাজাবাবুর ওই অসম্মানজনক উইল চাপ দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। যে কাজ তিনি অনেক অনুরোধ, উপরোধ এবং অভিমান করেও অদ্যাবধি করতে পারেননি।

আর তাছাড়া তাঁর অতি স্নেহের পুত্র তেজশঙ্করের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও এটা করা প্রয়োজন। যাতে করে নাকি ওই লম্পট সতীন পুত্রের পরিবর্তে একদিন তাঁর নিজপুত্রই চন্দনপুরের জমিদার হতে পারে। কারণ, কোন লম্পটের হাতে জমিদারী গেলে সেটা আর লাটে উঠতে ক'দিন। রাজাবাবু এটা বুঝবেন না?

অবশ্য বিয়ের পর এই রাজবাড়িতে এসে রানীমা প্রথম থেকেই যে বড়কুমারের প্রতি বিরূপ ছিলেন, এমন নয়। বরং এ বাড়িতে এসে তিনি মা-মরা কুমারকে সন্তান স্নেহে কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। আদর, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তিনি তাকে বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পারেননি। এমনকি সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে কুমার তাকে কোনদিন মা বলে ডাকেনি। তাঁর স্নেহ ভালবাসার মূল্য দেয়নি। তাঁর শাসন মানেনি। উল্টে বিমাতা কে সে তার গর্ভধারিণী মায়ের শত্রু ভেবেছে। তার নিজের শত্রু ভেবেছে। আর এসব ভেবে সে মনে মনে গুমরে মরেছে। মনে মনে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

তারপর একটু বড় হতেই কুমার তার নিজের খেয়ালখুশি মতো চলেছে। যা খুশি করেছে। এবং এভাবেই সে তার বিমাতার মন বিষিয়ে তুলেছে। ফলে বিমাতা তার প্রতি বিরূপ হয়েছেন।

তারপর একসময় ছোটকুমার তেজশঙ্কর রানীমার কোলে এসেছে। এবং তেজশঙ্কর কোলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে মানুষ নয়, বড়কুমার অমানুষ হলেই ভাল হয়। কারণ বড়কুমার অমানুষ হলে, অত্যাচারী হলে, লম্পট হলে তবেই তাঁর অতি স্নেহের পুত্র তেজশঙ্কর প্রজাদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। প্রজাদের মন জয় করতে পারবে। আর

বড়কুমার নয়, ভবিষ্যতে একদিন ছোট কুমারই চন্দনপুর এস্টেটের জমিদার হতে পারবে।

তো এসব কথা চিন্তা করে রানীমা তখনই তাঁর একান্ত সংবাদ সংগ্রাহক ও পার্শ্বচর নিশিকে ডেকে পাঠালেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং, শক্তপোক্ত শরীর, কালো পোষাক পরিহিত নিশি রানীমার সম্মুখে এসে হাজির হল।

শোনা যায় রানীমা একবার রাজাবাবুর সঙ্গে উড়িষ্যায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। এবং সেখানেই তিনি বাপ মা-মরা, দুঃস্থ মামার কাছে মানুষ, সাত বছরের নিশির দেখা পান। তিনি ওর দেহলক্ষণ দেখে খুশী হন। এছাড়া তিনি ওর মামার কাছ থেকে জানতে পারেন যে নিশি রাতের বেলায় নিশাচর প্রাণীর মতোই সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু দিনের আলোয় ওর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। তো এহেন বিস্ময়কর মনুষ্য সন্তানের সন্ধান পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ওর দুঃস্থ মামার কাছ থেকে ওকে পুরো একশো টাকায় কিনে নেন।

তারপর তীর্থ শেষে ঘরে ফিরে এসে রানীমা নিশিকে রাজবাড়ির প্রবীণ সংবাদ সংগ্রাহক ভূকৈলাশের হাতে তুলে দেন। এবং তিনি নিশিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর একান্ত সংবাদ সংগ্রাহক ও পার্শ্বচর করে গড়ে তোলার জন্য তাকে নির্দেশ দেন।

তো রানীমার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক নিশি এখন তাঁর একান্ত সংবাদ সংগ্রাহক ও পার্শ্বচর। এবং সে তাঁর বিশেষ অনুগতও বটে।

রানীমা বললেন, নিশি, এখন পর্যন্ত তোকে আমি তেমন বড় কাজ দিইনি। এবারে একটা বড় কাজ দিচ্ছি, পারবি তো?

আদেশ করুন, রানীমা। আপনার আশীর্বাদ থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব।

তো রানীমা তখন নিশিকে ওই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার নিখোঁজ হওয়া এবং এ ব্যাপারে বড়কুমারকে প্রজাদের সন্দেহের কথা খুলে বললেন। তারপর তিনি ওকে ওই বিধবা কন্যাকে খুঁজে বের করার জন্য সেদিন থেকেই কাজে লেগে যেতে বললেন। তাছাড়া তিনি ওকে বড়কুমারের গতিবিধির ওপরও নজর রাখতে বললেন।

ব্রাহ্মণ কন্যার নিখোঁজ হওয়া এবং এ ব্যাপারে বড় কুমারকে প্রজাদের সন্দেহের কথা নিশি জানত। যদিও বড়কুমারকে সন্দেহ করাটা তার অমূলক বলে মনে হয়েছে। তবুও রানীমার সামনে দাঁড়িয়ে সে কোন মন্তব্য করল না। কারণ রানীমা তাতে রুষ্ট হবেন।

নিশি শুধু রানীমার আদেশ যথাযথরূপে পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল।

* * *

এরপর দিন গেল, মাস গেল। মাসের পর মাস চলে গেল। কিন্তু নিখোঁজ সুন্দরী সুবর্ণলতার খোঁজ কেউ আনতে পারল না। তখন সবাই ধরে নিল, সুবর্ণলতা হারিয়ে

গেছে। বেচারী সুবর্ণলতা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। আর ঠিক এমনি সময় একদিন সকাল বেলায় নিশি রানীমার ঘরে যেয়ে বলল, রানীমা, একটা সংবাদ আছে।

রানীমা কোন কথা না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিশির মুখের দিকে তাকালেন।

তখন নিশি বলল, কাল রাতে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম, রানীমা। সেই বিষয়েই আপনাকে জানাতে এসেছি।

রানীমা বললেন, বেশ তো, বল।

নিশি বলল, আপনার আদেশ মেনে গত ক'মাস ধরে আমি সুবর্ণলতার খোঁজ করে চলেছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। গত ক'মাস ধরে আমি বড়কুমারের গতিবিধির ওপরও নজর রেখে চলেছি। এবং ওঁর গতিবিধির সব সংবাদই আমি যথাসময়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু গতকাল রাতে যা দেখলাম তা আমার কাছে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনে হল। মনে হল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি, রানীমা!

আঃ নিশি! গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল ঘটনা খুলে বল। কী এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল যা দেখে তোর একেবারে স্বপ্ন বলে মনে হল?

তখন নিশি বলল, রানীমা, গতকাল খানিকটা রাত করে বড়কুমার ওঁর দুষ্টপঞ্চককে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ারণ্যের পথে রওনা হয়েছিলেন। এবং অন্যান্য দিনের মতোই নিরাপদ দূরত্বে থেকে, বেতালের পিঠে চেপে আমি ওঁর পিছু নিয়েছিলাম। আর পিছু নেওয়ার আগে আমি আমার মুখ ও মাথা কালো টুপিতে ঢেকে নিয়েছিলাম।

একসময় বড়কুমার এবং ওঁর দুষ্টপঞ্চক অশ্বারোহণে মৃগয়ারণ্যে পৌঁছলেন। এবং বড়কুমার অরণ্যের প্রমোদভবনে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আর ওঁর দুষ্টপঞ্চক ঝকঝকে ফলামুক্ত বল্লম হাতে নিয়ে অরণ্যের প্রবেশ পথে পাহারায় রত হল।

দূর থেকে এসব দেখে আমি বেতালকে পাশের জঙ্গলের মধ্যে বেঁধে রাখলাম। আর তারপর অনেক কষ্টে ওই পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে আমি প্রমোদভবনের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। এবং একটা হেনার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমি বড়কুমারের প্রতি নজর রাখলাম।

আমি যে হেনার ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলাম সেখান থেকে প্রমোদভবনের বিশ্রামকক্ষ বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। আর ঘরের আলোও জ্বলছিল বেশ ক্ষীণ ভাবে। কিন্তু তবুও আমার শ্বাপদসম দৃষ্টিতে ওই দূর থেকেই আমি কুমারকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং ওঁর প্রতি নজর রাখছিলাম।

একটু পরে কুমার বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে নিলেন। এবং আরাম কেদারায় বসে উনি মদের গেলাসে মৃদু চুমুক দিতে লাগলেন। এইভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। রাত বাড়তে লাগল। আমি হেনার ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খানিকবাদে কুমার মদের গেলাস হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। এবং খানিকক্ষণ উনি অরণ্যের উত্তরদিকের সবচেয়ে উঁচু গাছের মাথার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে

রইলেন। তারপর উনি ঘরে ফিরে গেলেন। এইভাবে বেশ কয়েকবার উনি ঘর-বার করলেন।

রাত বেড়ে চলেছিল। চর্তুদিকে জঙ্গলের নিঝুমতা নেমে এসেছিল। মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা নিশাচর পশু এবং পাখির ডাক ভেসে আসছিল। এমন সময় প্রমোদভবনের দেওয়াল ঘড়ি ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজার সংকেত দিল।

এক জায়গায় প্রায় ঘন্টা দুয়েক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় আমার একটু ঝিমুনি এসেছিল। এমন সময় ওই দেওয়াল ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ আমার কানে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ঝিমুনির ভাবটা কেটে গেল। এবং ঠিক তখনই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা আমার চোখে পড়ল। যা দেখে আমার স্বপ্ন বলে মনে হল।

রানীমা, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, অরণ্যের উত্তরদিকের সেই সবচেয়ে উঁচু গাছের মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে এক নীলবসনা অপ্সরী প্রমোদভবনের সম্মুখের তৃণময় ক্ষেত্রে অবতরণ করল। আমি আরো লক্ষ করলাম যে ওই অপ্সরী যখন দ্রুত নীচে নেমে আসছিল, ওর শরীর হতে একটা হাল্কা নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ওই অপ্সরীকে দেখে বড়কুমার ওঁর মদের গেলাস পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। এবং ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে উনি দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে উনি ওই অপ্সরীর সম্মুখে যেয়ে দাঁড়ালেন। আনন্দে ওঁদের দু'জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে ওঁরা দু'জন এগিয়ে যেয়ে মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ করলেন। সেথায় ওঁরা দোলনায় বসে গল্প করতে লাগলেন।

রানীমা, আমি যে হেনার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে মাধবীকুঞ্জ বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। এবং লতাপাতার আড়াল থাকায় ওঁদের দু'জনকে আমি সঠিকভাবে লক্ষ্য করতে পারছিলাম না। সেকারণে আমি হেনার ঝোপের আড়াল হতে চুপিসারে বেরিয়ে এলাম। এবং মাধবীকুঞ্জের নিকটবর্তী একটি ঝোপের আড়ালে লুকানোর জন্য আমি ছুট লাগালাম। কিন্তু আমার যথাযথ সতর্কতার অভাবে একটি গাছের শিকড়ে আমার পা জড়িয়ে গেল। এবং আমি সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়লাম।

আমার আছড়ে পড়ার শব্দ পেয়ে বড়কুমার 'কে ওখানে'—বলে চিৎকার করে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাহারারত দু'জন বল্লমধারী কালান্তক যমের মতো আমার দিকে ছুটে এল। ওদের ছুটে আসতে দেখে আমি প্রমাদ গুনলাম। এবং মুহূর্ত মধ্যে মাটি থেকে উঠে আমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু ওরা দুজন আমার পিছু ছাড়ল না। ওরা দুজন আমার পেছনে ছুটে আসতে লাগল। এবং এইভাবে ছুটতে ছুটতে হঠাৎই আমি আরো একবার মাটিতে আছড়ে পড়লাম। আর ওই আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম, দু'খানা তীক্ষ্ণফলা যুক্ত বল্লম শিস্ দিতে দিতে আমার দেহের কিছুটা ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

মুহূর্ত মধ্যে মাটি থেকে উঠে আমি আবার ছুটতে লাগলাম। এবং সম্মুখের

কাঁটাতারের বেড়া আমি লাফিয়ে পার হলাম। কিন্তু তাতেও আমি রেহাই পেলাম না। কারণ ওরা দু'জনও কাঁটাতারের বেড়া লাফিয়ে পার হল, এবং আমার পেছনে ধেয়ে আসতে লাগল।

সেই মুহূর্তে আপনার সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়ল। আপনার এবারের দেওয়া কাজটা যে সত্যিই বড়, তা বুঝতে পারলাম।

যাহোক, আমি সামনে নজর রেখে ছুটে চলেছিলাম। বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছিলাম। জঙ্গলের ঝরাপাতা মাড়িয়ে ছুটে চলেছিলাম। এবং আমার পেছনে ওদের ছুটে আসার পদশব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি কখন যেন ওদের একজন অন্যপথে ছুটেছে। এবং যে অন্যপথে ছুটেছিল, খানিকবাদে সে হঠাৎই আমার সামনে এসে হাজির হল। এবং আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর জুজুৎসুর এক প্যাঁচে আমাকে সে ধরাশায়ী করল। আর যে ব্যক্তি এতক্ষণ আমার পেছনে ছুটে আসছিল, এবারে সে সুযোগ পেল। এবং আমাকে মাটিতে থেকে টেনে তুলে সে আমাকে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। তারপর ওরা দু'জনে মিলে আমাকে বেদম প্রহার করল। আমাকে ওরা নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ ওভাবে চলল না। আমি বেশীক্ষণ ওভাবে চলতে দিলাম না। ওদের হাতে মার খেতে খেতেই আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এবং সুযোগ পেলাম। সুযোগের সদ্ব্যবহারও করলাম। আমার গুরুর কাছে শেখা বিরাশী সিক্কার ঘুসি আমি ওদের ওপর বর্ষণ করতে লাগলাম। আমার সেই বজ্রমুষ্টির আঘাত ওরা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। ফলে অচিরেই ওরা দুজন ধরাশায়ী হল।

তো ওদের দুজনকে ধরাশায়ী করে আমি আবার ছুটতে শুরু করেছিলাম। তবে আমি একাই ওদের দুজনকে ধরাশায়ী করেছিলাম বলে আমার মনে কিছুটা আত্মতুষ্টি এসেছিল। এবং আমার ছুটে চলার গতিতে কিছুটা শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। আর ওইভাবে কিছুক্ষণ ছুটে চলার পর আমি পিছু ফিরে চাইলাম। এবং দেখলাম যে ওরা আবার আমার পিছু নিয়েছে। তবে এবারে ওরা দু'জন নয়, তিনজন। এরমধ্যেই ওদের সঙ্গে আরো একজন যোগ দেওয়ায় ওরা এখন তিনজন হয়েছে। অর্থাৎ দুষ্টপঞ্চকের তিনজনই এখন আমার পিছু নিয়েছে। ওরা তিনজন আমার পেছনে ধেয়ে আসছে।

এবারে কিছুটা ভয় পেলাম। আর ভয় পেয়ে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। এবং ওই দুষ্টত্রয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ভাবতে লাগলাম।

আমার গুরু বলতেন, প্রতিপক্ষ যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন, একটা না একটা দুর্বল দিক তার থাকেই। আর সেটা জানতে পারলে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা কঠিন হয় না। পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয় না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ভেবে পেলাম না আমার পেছনে ছুটে আসা ওই প্রতিপক্ষের কোন্‌টা দুর্বল দিক। কারণ ওরা ভাল তলোয়ার চালাতে জানে, ওরা ভাল

লাঠিয়াল। ওরা জুজুৎসুতে দক্ষ, ওরা ভাল তীরন্দাজ। ওরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ওরা বল্লম নিক্ষেপে পটু। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে আমি সেই মুহূর্তে আছড়ে পড়েছিলাম এবং ওদের নিক্ষেপিত বল্লম থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যবিরূপ হলে ওদের নিক্ষেপিত বল্লম সেই মুহূর্তেই আমার দেহকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত। আমি শেষ হয়ে যেতাম।

আমি ছুটে চলেছিলাম। আর মনে মনে ওদের দুর্বল দিক খুঁজছিলাম। আমার বাঁচার পথ খুঁজছিলাম। এবং ওইভাবে ছুটতে ছুটতে, খুঁজতে খুঁজতে একসময় হঠাৎই ওদের দুর্বল দিকটির কথা আমার স্মরণে এল। এবং ওদের দুর্বল দিকটির কথা স্মরণে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। মনে হল যেন সাক্ষাৎ কালান্তকের হাত থেকে আমি রক্ষা পেলাম। আমি জীবন ফিরে পেলাম। সেই মুহূর্তে আমি জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দ অনুভব করলাম। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন ফিরে পাওয়া কত আনন্দকর! আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো কত আতঙ্ককর!

কী ওদের সেই দুর্বল দিক? বলছি। ওদের দুর্বলদিকটি হল, ওরা সাঁতার জানে না। অন্য সব দিকে পটু হলেও সাঁতারে ওরা বড়ই অপটু। নদীর জলে হাত-পা ছুড়ে ওরা হয়তো দু'এক গজ এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু সাঁতরে নদী পার হওয়া ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এটাই হল ওদের দুর্বলদিক। আর এটাই হল আমার বাঁচার পথ।

আমি বাঁচার জন্য ছুটে চললাম। ছুটতে ছুটতে আমি আমার গতিপথ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নিলাম। গতিপথ পরিবর্তন করে নিয়ে আমি অদূরবর্তী নদীর দিকে ছুটে চললাম। ওরা আমার মতলব বুঝতে পারল না। আগের মতোই ওরা আমার পেছনে ছুটে আসতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে একসময় আমি নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। সেই সময় ওদের সঙ্গে আমার ব্যবধান অনেকটাই কমে এসেছিল। আর তা দেখে ওরা তিনজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি দেখে ওরা নিশ্চয়ই ভাবছিল যে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। আর তারপর গায়ের জ্বালা মেটাতে ওরা আমাকে স্রেফ পিটিয়েই মেরে ফেলবে। শেষে আমার লাশটাকে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে যেয়ে নদীর জলে ছুড়ে দেবে। ব্যাপারটাকে ওরা একেবারে জলের মতো সোজা করে ভেবে নিয়েছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা অমন সোজা হল না। অমন সোজাসুজি ঘটল না। কারণ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি নদীর উঁচু তটে পৌঁছে গেলাম। জল থেকে নদী তটের উচ্চতা ওখানে প্রায় বিশফুট। আঁধার রাত। কিন্তু তবুও আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম। জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে আমি আত্মহারা হলাম।

একবার পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান তখন মাত্র

একমুহূর্ত। অর্থাৎ এক মুহূর্ত দেরী হযে গেলেই ওরা তিনজন আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তারপর—।

আর দেরী করলাম না। ভগবানের নাম স্মরণ করে আমি সেই আঁধার রাতে সমুখের স্রোতস্বিনীর বুকে ঝাঁপ দিলাম।

ওরা তিনজন নদীতটে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা হতভম্ব হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে শত্রু ওদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ওরা তিনজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নিষ্ফল আক্রোশে ওরা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করতে লাগল। আর নির্বিকার চিত্তে তা শুনতে শুনতে আমি সাঁতার কেটে নদীর ওপারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললাম। নদীর ওপারে পৌঁছে আমি রাত্রি অবসানের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

তারপর একসময় পুবের আকাশ ঈষৎ ফিকে হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড়কুমার ওঁর দলবল নিয়ে মৃগয়ারণ্য ত্যাগ করলেন। আর আমি তখন সাঁতরে নদীর এপারে ফিরে এলাম। এবং বেতালকে উদ্ধার করে নিয়ে আমি এইমাত্র রাজবাড়িতে ফিরে এলাম।

নিশির মুখ থেকে সব কথা শোনার পর রানীমা বললেন, সকাল বেলায় একটা সুসংবাদ এনেছিস, নিশি। এরজন্য তোকে আমি অবশ্যই পুরস্কৃত করব। কিন্তু একই সঙ্গে তোকে আমি তিরস্কারও করছি। কারণ তুই তোর কর্তব্যে অবহেলা করেছিস। কাজের সময় তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছিস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুই অপ্সরী-কিন্নরীর স্বপ্ন দেখেছিস। আর এখন তুই আমাকে ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ শোনাচ্ছিস।

একটু থেমে রানীমা বললেন, তোর বোধহয় জানা নেই নিশি যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের শাসনে অপ্সরী-কিন্নরীরা সব দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আর তাই কাল রাতে তুই যাকে বড়কুমারের সঙ্গে বিহার করতে দেখেছিস, সে অপ্সরীও নয়, কিন্নরীও নয়। সে বেচারী নেহাৎই এক মানব কন্যা। এক অপহৃতা মানবকন্যা। আর যেহেতু সে একজন মানবকন্যা, তাই সে আকাশপথে ভেসেও আসেনি, উড়েও আসেনি। সে সেজেগুজে বেরিয়ে এসেছে প্রমোদভবনেরই কোন এক গুপ্তকক্ষ থেকে।

তুই বলছিস, ওই নীলবসনা অপ্সরীর দেহ থেকে একটা হাল্কা নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ব্যাপারটা তোর কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে, তাই না?

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়, নিশি। সোনারূপোর জরিবসানো দামী নীল-শাড়ি পরলে যে কোন নারীর অঙ্গ থেকেই অমন হাল্কা নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়। কারণটা ওই শাড়ি, সেই নারী নয়।

একটু থেমে রানীমা আবার বললেন, শোন নিশি, আমি আবার বলছি। তোর এই সংবাদের জন্য আমি তোকে পুরস্কৃত করব। কিন্তু কেন জানিস?

নিশি অবাক হয়ে রানীমাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

রানীমা উত্তর দিলেন, কারণ তোর ওই স্বপ্নে দেখা অপ্সরী মোটেও অপ্সরী নয়। আসলে সে হল সেই হারিয়ে যাওয়া সুবর্ণলতা। সেই অপহৃতা সুবর্ণলতা।

রানীমার কথা শুনে নিশি অবাক হয়ে গেল। এবং সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, সুবর্ণলতা!

হ্যাঁ, সুবর্ণলতা। শিওল গ্রাম নিবাসী রাম রাম ভট্টাচার্য্যের বালবিধবা কন্যা সুবর্ণলতা। কয়েকমাস আগে আমার গুণধর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজশঙ্কর যাকে গাঙের ঘাট থেকে অপহরণ করেছিল, সেই সুবর্ণলতা।

কিন্তু রাণীমা—নিশি রানীমাকে কিছু বলতে চাইল।

কিন্তু নিশিকে বাধা দিয়ে রানীমা বললেন, কোন কিন্তু নয়। যৌবনবতী সুবর্ণলতা এমনিতেই যথেষ্ট সুন্দরী। তারপর এই ক'মাস ধরে সে বড়কুমারের অনুগ্রহ লাভ করে চলেছে। তার সান্নিধ্য লাভ করে চলেছে। আর সেই কারণেই তাকে দেখে তোর অপ্সরী বলে মনে হয়েছে।

যাহোক, সুবর্ণলতাকে আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই, নিশি। তুই সহিসকে বল, সে যেন আমার ঠান্ডারকে প্রস্তুত করে রাখে।

আজ সন্ধ্যার পর আমি নিজে বের হব। তুই আমার সঙ্গে থাকবি।

কিন্তু যদি লোক জানাজানি হয়? ব্যাপারটা যদি রাজাবাবু জানতে পারেন?

লোক জানাজানি হবে না। আর রাজাবাবুও কিছু জানতে পারবেন না। কারণ উনি এখন তালুকে আছেন। ফিরতে ক'দিন দেরী হবে।

কিন্তু রানীমা, মৃগয়ারণ্য আমাদের জমিদারীর একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত। যেতে-আসতে অনেকটা পথ। এতটা পথ আপনি ঠান্ডারের পিঠে যাতায়াত করবেন! আপনার কষ্ট হবে না?

মৃগয়ারণ্য আমার অচেনা নয়, নিশি। আর ঠান্ডারের পিঠে যাতায়াত করতে আমার কোন কষ্ট হবে না। কারণ আমার পিতার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় আমাদের দু'বোনকে তিনি পুত্রের মতো করে মানুষ করেছেন। একজন জমিদার পুত্র যে সব শিক্ষা পেয়ে থাকে, সেই সব শিক্ষাই আমরা দু'বোন পেয়েছি। তাছাড়া আমি মৃগয়ারণ্যে যাব রাতের অন্ধকারে এবং ছদ্মবেশে। আমাকে দেখে তখন কেউ রানীমা বলে চিনতেও পারবে না। আর লোক জানাজানিও হবে না।

যাহোক, তোর চিন্তিত হওয়াব কোন কারণ নাই। সন্ধ্যার পর আমি তৈরী থাকব। বড়কুমার তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমাকে তুই খবর দিবি।

আর নিশি, তুই এখুনি একবার বেরিয়ে পড়। ভুবন মাঝিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। বলবি, ব্যাপারটা খুব জরুরী।

অতঃপর রানীমাকে প্রণাম করে নিশি চিন্তিত মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

রানীমার খাস পরিচারিকা-পারুলের সঙ্গে ছিদাম ঢালির একটা সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা প্রেম-পিরিতের। আর সে কারণে অন্দরমহলের অনেক খাসখবরই ছিদাম

পারুলের মাধ্যমে জানতে পারে। তো এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না। পারুল আড়িপেতে যতটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারল তাতে সে বুঝল যে আজ সন্ধ্যার পরে রানীমা ছদ্মবেশে মৃগয়ারণ্যে যাবেন। আর নিশি তাঁর সঙ্গে যাবে। সুতরাং সময় ও সুযোগ বুঝে পারুল ছিদামের কানে খবরটা তুলে দিল।

পারুলের মুখ থেকে খবরটা শুনে ছিদাম অবাক হল। রাতের অন্ধকারে, ছদ্মবেশ ধারণ করে, ঠান্ডারের পিঠে চেপে রানীমা যাবেন দূরের সেই মৃগয়ারণ্যে! শুধুমাত্র নিশির ওপর ভরসা করে! কিন্তু কেন এই রাতের অভিযান? ব্যাপারটা কী?

কিন্তু পারুল ছিদামের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। ফলে ছিদাম পড়ল মহাচিন্তায়।

এদিকে রাজাবাবু রয়েছেন দূরের তালুকে। তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছে দেবার আগেই রানীমা ছুটবেন মৃগয়ারণ্যের বিপদসঙ্কুল পথে। আঁধার রাতে। পথের বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু পথে যদি বিঘ্ন ঘটে, বিপদ ঘটে, তাহলে? দুর্বিপাকে পড়ে যদি রানীমার প্রাণ যায়, তাহলে? কী জবাব দেবে সে রাজাবাবুর কাছে? সে যে রাজাবাবুর নুন খায়!

না, ছিদাম আর ভাবতে পারে না! শেষে সব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ছিদাম স্থির করে যে সে নিজেও যাবে মৃগয়ারণ্যে। রাতের অন্ধকারে। সবার অলক্ষ্যে। রানীমাকে বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করতে।

* * *

তো সন্ধ্যে হতেই রানী জগদম্বা দেবী পুরুষ বেশে অপেক্ষা করে রইলেন তাঁর নিজের মহলে। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন নিশির সংবাদের জন্য। ওদিকে ছিদাম ঢালি ঘোড়া তৈরী রেখে অপেক্ষা করে রইল রানীমার পিছু নিতে। তাঁকে পথের বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করার জন্য। আর কুমার রাজশঙ্কর সেজেগুজে তৈরী হয়ে রইল তার নিজের মহলে, মিত্র পঞ্চককে সঙ্গে নিয়ে। সে অপেক্ষা করে রইল সন্ধ্যের আঁধার একটু ঘনীভূত হওয়ার জন্য।

একসময় সন্ধ্যের আঁধার ঘনীভূত হয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুমার ছুটে চলল মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে, মিত্র পঞ্চককে সঙ্গে নিয়ে। নিশি এ সংবাদ রানীমাকে পৌঁছে দিতেই তিনি ছুটলেন কুমারের পেছনে, যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে। সঙ্গে ছুটল নিশি। আর সবার পেছনে ছুটল ছিদাম ঢালি, রানীমাকে পথের বিপদ হতে রক্ষা করতে, মনের মধ্যে একরাশ কৌতূহল নিয়ে।

কিছুদূর ছুটে চলার পর শুরু হল ধু ধু মাঠের বুক চিরে ধুলোয় ঢাকা কাঁচা রাস্তা। জনমানবহীন রাস্তা। ভোরবেলায় এ রাস্তায় জাল আর খালি ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে জেলেরা যায় নদী-বাঁওড়ে মাছ ধরতে। দুপুরবেলায় তারা ফিরে আসে মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, বাজার ধরতে।

সকালবেলায় এ রাস্তায় গরুর পাল নিয়ে রাখাল ছেলেরা যায় গরু চরাতে।

গোধুলিবেলায় তারা ফিরে আসে ঘরে, গরুর পাল সঙ্গে নিয়ে। দিনের বেলায় এ রাস্তায় কিছু গ্রামবাসীকে দেখা যায় বটে, কিন্তু এখন. এই রাতের অন্ধকারে সারাপথ জনমানবহীন। চারদিক সুনসান। শুধু নয়টি ঘোড়া তাদের সওয়ারীদের পিঠে নিয়ে ছুটে চলে জ্যৈষ্ঠের ধুলো উড়িয়ে। আঁধার রাতে। শুধুমাত্র নক্ষত্রের আলো সম্বল করে।

এইভাবে মাইল তিনেক ছুটে চলার পর দেখা যায় যে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। একটি রাস্তা বাঁদিকে মোড় নিয়ে পৌঁছে গেছে মৃগয়ারণ্যে। আর সোজা রাস্তাটি ঘুরে ফিরে, জঙ্গলের পায়ে-চলা পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেছে বাঁওড় তীরে।

বড়কুমার তার দলবল নিয়ে ছুটে চলল বাঁদিকে মোড় নিয়ে, মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে; কিন্তু রানীমা ছুটে চললেন সোজা রাস্তায়, বাঁওড় তীরের দিকে। আর তা দেখে নিশি পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, ওটি মৃগয়ারণ্যের রাস্তা নয়, রানীমা। আপনি ভুল রাস্তায় চলেছেন।

রানীমা চিৎকার করে বললেন, তুই আমাকে অনুসরণ কর, নিশি। আমি মৃগয়ারণ্যের রাস্তা চিনি।

রানীমার এহেন বাক্যে নিশি অবাক হল। কিন্তু আদেশ মেনে সে রানীমার পেছনে ছুটে চলল।

আর সবার পেছনে থেকে ছিদাম যখন দেখল যে নিশিকে সঙ্গে নিয়ে রানীমা ছুটে চলেছেন বাঁওড় তীরের দিকে, তখন সেও বড় কম অবাক হল না। সে ভাবল, ব্যাপার কী? পাকল কী তবে তাকে ভুল সংবাদ দিল?

অবশ্য এই রাতের অন্ধকারে, দুর্গম পথে, পুরুষের ছদ্মবেশে রানীমা যে দিকেই ছুটুন না কেন, এর পেছনে যে একটা রহস্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই রহস্যটাই জানতে হবে। এবং একই সঙ্গে এই দুর্গম পথের বিপদ থেকে রানীমাকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং ছিদামও ছুটে চলল রানীমার পেছনে, যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে।

এইভাবে ছুটতে ছুটতে একসময় ধুলোয় ঢাকা বড় রাস্তা শেষ হল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ শুরু হল। আঁকাবাঁকা পথ শুরু হল। এই জঙ্গলের পথে চলতে যেয়ে ঘোড়ার গতি স্বাভাবিক কারণেই কমে গেল। রানীমা বাঁওড় তীরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন। নিশি তাঁকে অনুসরণ করল। আর একটু দূরে থেকে ছিদাম রানীমা ও নিশির প্রতি লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলল।

আর এইভাবে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই অতর্কিতে এক বিপদ দেখা দিল। মশাল হাতে সাতজনের এক সশস্ত্র ডাকাত দল রানীমার পথ আগলে দাঁড়াল। এবং দলের সর্দার হুঙ্কার ছেড়ে বলল, এই তোরা কারা? এখুনি ঘোড়া থেকে নেমে আয়। আর তোদের কাছে টাকাপয়সা, সোনাদানা যা কিছু আছে আমাদের দিয়ে যা। নইলে তোদের প্রাণ যাবে।

রানীমা ডাকাত সর্দারের হুঙ্কার শুনে অবাক হলেন। ভাবলেন, রাজা সৌভদ্র

ঙ্করের জমিদারীতে এখনও এরা বেঁচে আছে! আশ্চর্য ব্যাপার তো! উনিও সমানে
ঙ্কার ছাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এই, তোরা কারা? কে তোদের সর্দার? তোরা
পালিয়ে বাঁচতে চাস, না আমার হাতে মরতে চাস?

রানীমার হুঙ্কার শুনে ডাকাত সর্দার অবাক হল। ভাবল, তার জঙ্গলের রাজত্বে
দাঁড়িয়ে তাকেই ভয় দেখায়, এমন মানুষও আছে নাকি? যাহোক, রানীমার হুঙ্কারের
জবাবে সর্দারও পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল। বলল, আমরা ক্ষুদিরামের দল। যার নাম শুনলে
মানুষ কেঁপে ওঠে। যাকে সামনে দেখলে মানুষ মূর্ছা যায়। আমরা সেই ক্ষুদিরামের
দল।

মিথ্যে কথা! আজ থেকে তিনমাস আগে রাজা সৌভদ্রশঙ্কর ক্ষুদিরাম ও তার
দলবলকে গুলি করে মেরেছেন। আর সেই সঙ্গে ক্ষুদিরামের দলও ভেঙে গেছে।

হ্যাঁ, ক্ষুদিরাম মারা গেছে। রাজাবাবু তাকে গুলি করে মেরেছেন। আর সেই সঙ্গে তার
দলও ভেঙে গেছে। কিন্তু তোদের বোধহয় জানা নেই যে ক্ষুদিরামের একটি দল ভেঙে
যেয়ে তার জায়গায় তিনটি দল গড়ে উঠেছে। সেই তিনটি দলের একটি দল হল মেধো
সর্দারের দল। আর আমিই সেই মেধো সর্দার। জঙ্গলের এই এলাকা আমার এলাকা।
এখানে আমিই রাজত্ব করি। যাক, অত কথায় কাজ নেই। হয় তোরা তোদের যথাসর্বস্ব
আমার হাতে তুলে দে, নয়তো তোরা মরবার জন্য তৈরী হ।

মেধো সর্দারের কথা শুনে রানীমার মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি কোমরে গোঁজা
পিস্তলে হাত দিলেন। ভাবলেন, দিই কটাকে শেষ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভেবে
দেখলেন যে এই নিস্তব্ধ রাতে পিস্তল চালালে যে আওয়াজ ছড়াবে তাতে তাঁর এই
অভিযানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ বাঁওড় অতি নিকটে। এবং
বাঁওড়ের ওপারেই রয়েছে বড়কুমার রাজশঙ্কর, দুষ্টপঞ্চক এবং অপহৃতা সুবর্ণলতা।
পিস্তলের আওয়াজ শুনে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। এবং মুহূর্ত মধ্যে সুবর্ণলতাকে ওরা
অন্য কোথাও সরিয়ে দেবে। তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু মেধো ডাকাতের ঔদ্ধত্য রানীমা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি
ডাকাতদলকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর রানীমা নিশিকে
আদেশ দিলেন, 'আক্রমণ কর।'

মুহূর্তে রানীমা এবং নিশি খোলা তলোয়ার হাতে মেধো ডাকাত ও তার দলবলের
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর অমন আচমকা আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে গোটা
ডাকাতদলটি একেবারে হকচকিয়ে গেল। ওরা আশ্চর্য হল। কারণ ওদের জঙ্গলের
রাজত্বে এসে ওদের ওপরেই কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ওদের ওপরেই কেউ হামলা
করতে পারে, এমন কথা ওরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি!

যাহোক, প্রতিপক্ষের প্রথম আক্রমণ কোনক্রমে প্রতিহত করে ডাকাতদলটি প্রতি
আক্রমণ শুরু করল। ওরা লড়াই করতে লাগল। আসলে ওরা তলোয়ার আর রামদা
হাতে নিয়ে রানীমা এবং নিশির সম্মুখে আনাড়ীর মতো লম্ফঝম্প করতে লাগল।

আর তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তলোয়ার চালনায় দক্ষ রানীমা এবং নিশির হাতে গুরুতর রূপে জখম হয়ে দু'জন ডাকাত ধরাশায়ী হল।

এহেন দৃশ্য দেখে মেধো সর্দারের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এবং সে ডাকাতদলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, ওরে তোরা জান দে, কিন্তু মান দিস নে তোরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়। ওদের দু'জনকে এখুনি খতম কর।

মুহূর্ত মধ্যে পাঁচজন ডাকাত রে রে করে রানীমা এবং নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা জীবনপন লড়াই শুরু করল। রানীমা ও নিশির হাতে ওরা জখম হল ক্ষত-বিক্ষত হল, কিন্তু পিছু হটল না। এবং একসময় মেধো সর্দারের রামদার আঘাতে রানীমার শিরস্ত্রান মাটিতে খসে পড়ল। আর বেসামাল হয়ে রানীমা নিজেও ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

রানীমা ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যেতেই মেধো সর্দার রামদা উঁচিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেল। এবং রামদার এক কোপে সে তাঁর দেহটাকে দ্বিখন্ডিত করতে উদ্যত হল। কিন্তু তার হাতে ধরা রামদা নীচে নেমে আসার আগেই জঙ্গলের আড়াল থেকে ছোড়া একটি ঝকঝকে ফলা-যুক্ত বড়শা তার পেটে ঢুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। অমন আচমকা আঘাতে সে দু'পা পিছিয়ে গেল। তার হাতে ধরা রামদা মাটিতে খসে পড়ল। সে তাব পেটে ঢুকে যাওয়া বড়শাটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। সেটাকে সে টেনে বার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। আর তার পরক্ষণেই সে কাটা কলাগাছের মতো কাত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। আর চোখের সামনে সর্দারের এহেন পরিণতি দেখে অবশিষ্ট ডাকাতরা ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। রানীমা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

রানীমা মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আর তারপর তিনি তাঁর রক্ষাকর্তাকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করলেন। বললেন, হে মহৎজন, দয়া করে আপনি আমার সম্মুখে আসুন। আপনি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। দয়া করে একবার আমার সম্মুখে আসুন।

কিন্তু বার বার আহ্বান কবা সত্ত্বেও কেউ রানীমার সম্মুখে এলেন না। তখন রানীমা বুঝলেন যে তাঁর রক্ষাকর্তা, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আশপাশেই কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছেন। তবে কোন এক অজানা কারণে তিনি আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

রানীমা তখন নিশিকে বললেন, সময় বয়ে যাচ্ছে। চল, আমরা এগিয়ে যাই।

অতঃপর ওঁরা দু'জন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁওড় তীরে এসে পৌঁছলেন।

প্রতিবছরই বর্ষাবারিধন্য হয়ে নদী এখানে নবোঢ়ার মতো পরিপূর্ণতা লাভ করে। সে তখন উজ্জ্বল, উচ্ছল, উত্তাল হয়। নদী আর এই বাঁওড়কে তখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। দুই সখী তখন মিলেমিশে একাকার।

তারপর শরৎ আসে। সে চলেও যায়। আর শরৎ চলে যেতেই আসে হেমন্ত। আর

এই হেমন্তের শেষে, গাঢ় হিমের স্পর্শ পেয়ে নদী আর বাঁওড় যে যার নিজের রূপে ফিরে যায়। তখন নদী ফিরে যায় তার আপন খাতে, বাঁওড় পড়ে থাকে একা।

এই বাঁওড়ের জলে আশ্রয় নিয়েছে অজস্র সবুজ শ্যাওলা আর ছোটবড় মাছ। আর আশ্রয় নিয়েছে কিছু কচ্ছপ পরিবার। বংশানুক্রমে যারা এই বাঁওড়ের বাসিন্দা। বর্ষায় এখানে কিছু বহিরাগত কুমিরের দেখা মেলে। কিন্তু এখানে তারা বেশীদিন টিকতে পারে না। জেলেদের উৎপাতে নাকাল হয়ে তারা নদীর গভীরে যেয়ে মুখ লুকায়। কিন্তু তবুও থেকে যায় দু'একটি নির্লজ্জ কুমীর। জেলেদের উৎপাতে নাকাল হয়েও বাঁওড় ছাড়া হয় না তারা। জেলেরা তাদের কানকাটা বলে।

তো রানীমা এবং নিশি বাঁওড় তীরে পৌঁছতেই ভুবন মাঝি এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে সে রানীমাকে করজোড়ে প্রণাম জানাল।

রানীমা ভুবনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ওরা সব কারা, ভুবন?

ভুবন উত্তর দিল, ওরা আমার বেটা। আমার সাত বেটা, রানীমা।

তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ভুবন বলল, তোরা সব রানীমাকে প্রণাম কর।

ভুবনের ছেলেরা একে একে এগিয়ে এসে রানীমার পায়ের কাছে হাত রেখে মাথা নত করল। আর তারপর ওরা সরে যেয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। রানীমা লক্ষ্য করলেন, ওদের প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে খাপে ভরা, কামারশালে গড়া অমসৃণ তলোয়ার আর হাতে বড়শা।

রানীমা ভুবনকে বললেন, তোমার ও তোমার বেটাদের ব্যবহারে আমি খুশি হয়েছি। এবারে তুমি আমাদের বাঁওড় পার করে দাও, মাঝি।

মাঝি বলল, এসো মা। নৌকো তৈরি আছে। আমি এখুনি তোমাদের বাঁওড় পার করে দিচ্ছি।

তারপর সে বলল, আমার এক বেটা এপারে থেকে তোমাদের ঘোড়া দু'টিকে পাহারা দেবে। আর আমি আমার ছয় বেটাকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাঁওড় পার করে দেব। এসো মা, নৌকোয় ওঠ।

মাঝি রানীমা ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় উঠল। মাঝারি আকারের লম্বা ছিপ নৌকো। অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌকো। মাঝি হাল ধরল। আর ওর জোয়ান ছয় বেটা নৌকোর দু'পাশে বসে দাঁড়ে টান দিল। মুহূর্তমধ্যে নৌকো গতি পেল, বাঁওড় পারের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুবন মাঝির নৌকো বাঁওড়ের ওপারে পৌঁছল। সকলে নৌকো থেকে ডাঙায় নামল। দেখা গেল বাঁওড়ের ঘাটে বাঁধা রয়েছে একখানা সুসজ্জিত বজরা। মাঝি রানীমাকে বলল, এখানা বড়কুমারের বজরা। জ্যোৎস্না রাতে কুমার তাঁর দলবল নিয়ে বজরার ছাদে বসে হাওয়া খেতে বের হন। তখন খানাপিনা হয়। গানবাজনা হয়। বাঈজী নাচ হয়। আজ অমাবস্যা। তাই বজরাখানা ঘাটে বাঁধা রয়েছে।

ভুবনের কথা শুনে রানীমা বললেন, মাঝি, তুমি বজরার বাঁধন খুলে দাও। তারপর সকলে মিলে ধাক্কা দিয়ে ওটাকে ঘাট থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

কিন্তু রানীমা, এটা বড়কুমারের বজরা। এর বাঁধন খুললে—।

মাঝিকে বাধা দিয়ে রানীমা বললেন, আমি জানি এটা বড়কুমারের বজরা। তোমাকে যা বললাম, তুমি তাই কর। এটার বাঁধন খুলে দাও। তারপর সকলে মিলে ধাক্কা দিয়ে এটাকে বাঁওড়ের গভীর জলে ভাসিয়ে দাও।

অতঃপর রানীমার আদেশ মেনে মাঝি বজরার বাঁধন খুলে দিল। তারপর সকলে মিলে ধাক্কা দিয়ে বজরাকে বাঁওড়ের গভীর জলে ভাসিয়ে দিল।

রানীমা ভুবনকে বললেন, তুমি তোমার বেটাদের নিয়ে নৌকোতেই তৈরী হয়ে বসে থাক। আমি নিশিকে নিয়ে ওপরে যাচ্ছি। কাজ সেরে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। এর মধ্যে তোমরা কোনরকম শব্দ কোরো না।

মাঝি বলল, আচ্ছা মা।

মৃগয়ারণ্যের প্রমোদভবন বাঁওড় থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এদিকটা ভবনের পেছন দিক। রানীমা নিশিকে সঙ্গে নিয়ে চুপিসারে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন। এবং ওপরে ওঠার পর ওঁরা ঢোলক আর নূপুরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। ওঁরা বুঝতে পারলেন যে অদূরেই কেউ একজন ঢোলক বাজাচ্ছে আর তার সামনে কোন নারী নূপুর পায়ে তালে তালে নাচছে। নিস্তব্ধ রাতে সেই ঢোলকের বোল আর নূপুরের নিক্কন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

ওঁরা দেখতে পেলেন, ভবনের পেছনের ফটক বন্ধ। আর এদিকে কেউ পাহারায় নেই। ওঁরা দুজন অনেক কষ্টে বাঁওড় তীরের এক গাছে চড়ে উঁচু কাঁটাতারের বেড় পার হলেন। তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ওঁরা ভবনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এক হেনার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওঁরা সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ওঁরা দেখলেন, বড়কুমার রাজশঙ্কর খোলা আকাশের নীচে আদিবাসীর সাজে সজ্জিত হয়ে ঢোলকে বোল তুলছে, বোলের তালে তালে নৃত্য করছে। আর কুমারের সম্মুখে এক সুন্দরী যুবতী আদিবাসী রমনীর সাজে সজ্জিত হয়ে, নূপুর পায়ে নৃত্য করছে। রানীমা এবং নিশি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে, অবাক হয়ে ওদের ওই মনোরম নৃত্য উপভোগ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিশি রানীমার কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করুন, রানীমা। আদিবাসী রমণীর সাজে সজ্জিতা, নৃত্যরতা ওই যুবতীর পা কিন্তু সবসময় মাটি স্পর্শ করছে না। মাঝে মাঝে ও শূন্যে নৃত্য করছে।

রানীমা, আপনি আরও লক্ষ্য করুন, ওই যুবতী যখন শূন্যে নৃত্য করছে, ওর দেহ হতে একটা হাল্কা নীল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর এসব দেখে আমার মনে হচ্ছে যে ও সুবর্ণলতা নয়। এমনকি ও কোন মানুষও নয়। ও অপ্সরী! অথবা ও কোন প্রেতাত্মাও হতে পারে।

নিশির কথা শুনে রানীমা চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না নিশি, একজন সুন্দরী যুবতীকে দেখে তোর বার বার দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে কেন! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ওই নীলবসনা যুবতী দিব্যি মাটির ওপর নাচছে। অথচ তুই বলছিস ও শূন্যে নাচছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে আদিবাসী রমনীর সাজে সজ্জিতা, নৃত্যরতা ওই সুন্দরী যুবতীই অপহৃতা সুবর্ণলতা। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই!

রানীমার ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনে নিশি চুপ করে রইল। সে আর কোন কথা কইতে সাহস করল না। কিন্তু সে মনে মনে বুঝতে পারল যে রানীমা ভুল পথে চলেছেন।

খানিকবাদে রানীমা নিশিকে বললেন, আমার যা দেখার ছিল তা দেখেছি। চল, এবারে ফিরে যাই। আমাদের অভিযান সফল হয়েছে।

অতঃপর নিশিকে সঙ্গে নিয়ে রানীমা ঘাটের দিকে ফিরে চললেন।

* * *

ওদিবে বাঁওড়ের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিদাম ঢালি যখন দেখল যে রানীমা নিশিকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে বাঁওড় পার হচ্ছেন, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে বুঝতে পারল যে ভুবন মাঝির দ্রুতগামী ছিপে চড়ে রানীমা তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চলেছেন। আর সে নিজে এপারে দাঁড়িয়ে বোকার মতো তা দেখছে। কারণ পারুল তাকে পুরো খবর দিতে পারেনি। আর তাই সে আগে থেকে বাঁওড় পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এখন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কপাল চাপড়ানো ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই!

ছিদাম স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখল যে এই আঁধার রাতে, পুরুষের ছদ্মবেশে রানীমা যখন বাঁওড় পারে যাচ্ছেন তখন এর পেছনে একটা গূঢ় রহস্য আছে। অথচ কী সেই গূঢ় রহস্য তা এপারে দাঁড়িয়ে জানা যাবে না। জানতে হলে তাকে ওপারে যেতে হবে। আর ওপারে যেতে হলে এখন তাকে সাঁতরে বাঁওড় পার হতে হবে। আর আঁধার রাতে এই বিশাল বাঁওড় সাঁতরে পার হতে গেলে সে যে কোন সময় কানকাটার পেটে চলে যেতে পারে। তাহলে? তাহলে এখন সে কী করবে? এই পরিস্থিতিতে এখন তার কী করা উচিত?

ছিদাম বুঝতে পারল, সোজাপথ ছেড়ে রানীমা কেন বাঁওড় পার হয়ে মৃগয়ারণ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। কারণ তিনি জানেন যে বড়কুমার যখন মৃগয়ারণ্যে অবস্থান করে তখন তার সবসময়ের সঙ্গী দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চক সম্মুখের ফটকে পাহারায় থাকে। কিন্তু পেছনের ফটক অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। আর তাই তিনি সম্মুখের প্রবেশপথ পরিহার করে পেছনের পথে মৃগয়ারণ্যে প্রবেশ করতে চলেছেন। যদিও পেছনের দিকে বাঁওড়-তীর বরাবর উঁচু কাঁটাতারের বেড়া আছে, কিন্তু কেউ পাহারায় নেই। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এ এক বড় ত্রুটি। আর রানীমা সেই সুযোগটাই নিতে যাচ্ছেন।

ছিদাম বাঁওড় তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, এই আঁধার রাতে, জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে রানীমা কেন চলেছেন মৃগয়ারণ্যে? তাঁর উদ্দেশ্যটা কী? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে সম্পত্তির লোভে আঁধার রাতে, নিশিকে সঙ্গে নিয়ে রানীমা চলেছেন সতীন পুত্রকে গুপ্তহত্যা করতে! কথাটা মনে হতেই সে চমকে উঠল। এবং আগুপিছু না ভেবে, মাঝির বেটার নজর এড়িয়ে সে বাঁওড়ের জলে নেমে পড়ল। তারপর ডুব-সাঁতারে সে বাঁওড় পারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল।

আর ওদিকে 'সফল অভিযান' শেষে, ভুবন মাঝির দ্রুতগামী ছিপে চড়ে রানীমা ফিরে আসছিলেন বাঁওড়ের এপারে। এবং তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, বড়কুমারকে এবার আচ্ছামতো জব্দ করা যাবে। প্রজার ঘরের সুন্দরী যুবতীকে জোর করে তুলে এনে ফূর্তি করার মজা সে এবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে। তিনি তাকে এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বেন।

রানীমা ভাবছিলেন, বড়কুমারের এই গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি নিজে শিওল গ্রামের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন। প্রজাদের তিনি বড়কুমারের লাম্পট্য প্রমাণ করে রাজাবাবুর কাছে তার বিচার চাইতে বলবেন। তার উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করতে বলবেন। আর একবার বড়কুমারের লাম্পট্য প্রমাণ হয়ে গেলে, সে সাজাপ্রাপ্ত হলে, রাজাবাবুকে তিনি তাঁর অপমানজনক উইল পাল্টাতে বাধ্য করতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে বড়কুমারের পরিবর্তে তিনি ছোটকুমার তেজশঙ্করকেই চন্দনপুর জমিদারীর আসনে বসানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন।

কিন্তু রানীমার এইসব ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে নিশির ভাবনা-চিন্তা একেবারেই মিলছিল না। রানীমার এই অভিযানকেও নিশি 'সফল অভিযান' বলে মেনে নিতে পারছিল না। ওই নৃত্যরতা যুবতীকেও সে সুবর্ণলতা বলে মেনে নিতে পারছিল না। কারণ ওই যুবতীকে গতকাল রাতে সে আকাশপথে উড়ে আসতে দেখেছে। আর আজ রাতে সে তাকে শূন্যে নৃত্য করতে দেখেছে। সে যদি সুবর্ণলতাই হত তবে এসব করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। যদিও রানীমা এসব কিছুই মানেননি। তিনি ওই অদ্ভুত যুবতীকে সুবর্ণলতা বলে মনে করেছেন। তিনি তাকে সুবর্ণলতা বলে বিশ্বাস করেছেন।

ভুবন মাঝির ছিপ বাঁওড় পারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছিল। আর রানীমার ভাবনা-চিন্তা ও নিশির ভাবনা-চিন্তা দুইপথে এগিয়ে চলেছিল। এমন সময় সব ভাবনা-চিন্তায় ছেদ টেনে ভুবন মাঝি চিৎকার করে বলে উঠল, ওই দেখ রানীমা, এক রাক্ষুসে কানকাটা একজনের পিছু নিয়েছে। লোকটি এই আঁধার রাতে সাঁতরে বাঁওড় পার হচ্ছে। অথচ ও জানে না যে সাক্ষাৎ মৃত্যু ওর পিছু ধাওয়া করেছে। জানোয়ারটা এখনই ওকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে। ওকে তুমি বাঁচাও! ওকে তুমি রক্ষা কর, রানীমা!

ভুবন মাঝির চিৎকার শুনে ওর বেটারা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ছিপের গতি মন্থর হয়ে গিয়েছিল। এবার ভুবন মাঝি চুপ করতেই রানীমা ঝটিতে কোমরে গোঁজা পিস্তল টেনে বার করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমিরটির মাথা লক্ষ্য

করে তিনি পর পর তিনটি গুলি ছুড়লেন। রানীমার অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘায়েল হয়ে কুমিরটি বাঁওড়ের জল তোলপাড় করতে লাগল। আর সন্তরণরত লোকটি চমকে উঠে পেছন ফিরে তার মৃত্যুদূতকে স্বচক্ষে দেখে অবাক হল। এবং মনে মনে সে রানীমার উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

ভুবন মাঝি বলল, মা, তোমার দয়ায় লোকটি প্রাণে বেঁচে গেছে। এবার ওকে আমি নৌকোয় তুলে নিই?

রানীমা বললেন, না। তার দরকার নাই। লোকটি বেঁচে গেছে। ওর বিপদ কেটে গেছে। এবার তুমি তোমার বেটাদের বাইতে বল। আমাকে তাড়াতাড়ি ওপারে নিয়ে চল।

ভুবন মাঝির নির্দেশে ওর বেটারা আবার দাঁড় বাইতে শুরু করল। ভুবন হাল ধরল। ছিপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

ছিপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু রানীমা জানলেন না তিনি কাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। রানীমা এও জানলেন না যে জঙ্গলের পথে তাঁকে কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

কিন্তু নিশি জানল, রানীমা কাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। সে তার শ্বাপদসম দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পেল, কে নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে প্রাণ ফিরে পেল।

ছিপ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। নিশি ছিপে বসে ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল। এবং ভাবতে ভাবতে সে বুঝতে পারল যে ছিদাম ঢালি অনেক আগে থেকেই তাদের পিছু নিয়েছিল। সবার অলক্ষ্যে সে তাদের পেছনে ছুটে আসছিল। এবং জঙ্গলের পথে সেই রানীমাকে মেধো ডাকাতের হাত থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। আর ঘটনাচক্রে রানীমা এখন সেই ছিদাম ঢালিকেই রাক্ষুসে কুমিরের হাত থেকে প্রাণে বাঁচালেন।

ভুবন মাঝির ছিপ দ্রুতগতিতে বাঁওড় পারের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

* * *

ক'দিন পরে রাজাবাবু তালুক থেকে ফিরে এলেন। আর রানীমা সময় ও সুযোগ বুঝে রাজাবাবুর কাছে সুবর্ণলতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বললেন, জানেন, এতদিনে সুবর্ণলতার খোঁজ পাওয়া গেছে। নিশি তাকে খুঁজে বের করেছে।

রাজাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কে সুবর্ণলতা? সে কি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল?

এ কী কথা বলছেন, স্বামী! আপনি এর মধ্যেই মেয়েটির কথা ভুলে গেছেন? আমি আমাদের শিওল গ্রামের প্রজা স্বর্গীয় রাম রাম ভট্টাচার্য্যের বিধবা কন্যা সুবর্ণলতার কথা বলছি। গতবছর আশ্বিন মাসে গাঙের ঘাটে জল আনতে যেয়ে সে নিখোঁজ হয়েছিল। এবার মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ছিদামকে মেয়েটির খোঁজ করতে বলেছিলাম। তা কোথায় পাওয়া গেল তাকে?

প্রমোদভবনে। বড়কুমার তাকে প্রমোদ ভবনে নিয়ে তুলেছে। তবে ব্যাপারটা এখনও গোপন আছে।

কি বলছ তুমি? বড়কুমার মেয়েটিকে প্রমোদ ভবনে আশ্রয় দিয়েছে?

গত আশ্বিন মাস থেকে বড়কুমার তাকে প্রমোদভবনে রেখেছে। নাচগানের তালিম দিয়ে সে তাকে বাঈজী করে তুলেছে। তবে ব্যাপারটা এত গোপন রাখা হয়েছে যে প্রজারা এখনও কিছু জানতে পারেনি। তবে প্রজারা জানার আগেই এব্যাপারে আপনাকে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় অনর্থ ঘটে যাবে।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, রানী। আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাইছ যে বড়কুমার সুবর্ণলতাকে গাঙের ঘাট থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রমোদভবনে রেখেছে? আর নাচগানের তালিম দিয়ে সে তাকে বাঈজী করে তুলেছে?

হ্যাঁ, স্বামী। ব্যাপারটা তেমনই ঘটেছে।

কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ বড়কুমার এমন গর্হিত কাজ করতে পারে না।

আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ বড়কুমার সম্বন্ধে আপনি সবকিছু জানেন না। কিন্তু আমি জানি। প্রজারাও জানে। আর প্রজারা জানে বলেই প্রথম থেকেই তারা বড়কুমারকেই সন্দেহ করেছে। আর তাদের সন্দেহের কথা তারা আপনার মুখের ওপর বলার সাহস করেছে। এরপরেও আপনি অবিশ্বাস করছেন, স্বামী?

রানীর যুক্তির কাছে রাজা হার মানলেন। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তারপর তিনি গম্ভীর মুখ করে বললেন, হ্যাঁ, একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আর তারপর তিনি আসন ত্যাগ করে চলে গেলেন। আর রাজা চলে যেতেই রানীর মুখে ক্রুর হাসি দেখা দিল।

* * *

ঘন্টাখানেক পরে, রানীর অসাক্ষাতে রাজাবাবু নিশিকে ডেকে পাঠালেন। এবং নিশি হাজির হতেই রাজাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা নিশি, বড়কুমার সুবর্ণলতাকে প্রমোদভবনে রেখেছে, এখবর তুমিই এনেছ? তুমিই তাকে খুঁজে বের করেছ?

নিশি উত্তর দিল, আজ্ঞা, মেয়েটি সুবর্ণলতা কিনা তা জানি না, রাজামশাই। তবে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে রাতের অন্ধকারে বড়কুমারের কাছে আসা-যাওয়া করে। গল্প করে। নাচগান করে। এসব দেখেছি। তবে মেয়েটি কোন সাধারণ মেয়ে নয়। ওকে আমার অপ্সরী বলে মনে হয়েছে।

সে কী কথা! মেয়েটি সুবর্ণলতা নয়?

আজ্ঞা, আমার মনে হয় মেয়েটি সুবর্ণলতা নয়। এমনকী ও মানুষও নয়। কারণ রাতের অন্ধকারে ওকে আমি আকাশপথে উড়ে আসতে দেখেছি। শূন্যে নৃত্য করতে দেখেছি। এবং নৃত্যকালে ওর দেহ থেকে আমি হাল্কা নীল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে

দেখেছি। আর এসব দেখে আমার মনে হয়েছে যে মেয়েটি অপ্সরী। অবশ্য ও কোন প্রেতাত্মাও হতে পারে।

নিশির কথা শুনে রাজাবাবু বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। মনে মনে কিছু ভাবলেন। তারপর তিনি নিশিকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।

নিশি রাজাবাবুকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর নিশি বেরিয়ে যাওয়ার খানিকক্ষণ বাদেই রাজাবাবু সুবর্ণলতা সম্বন্ধে নিশির মতামতের কথা রানীকে জানালেন। আর তা শুনে রানী বললেন, স্বামী, এদেশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে ভালবাসে। এক-একটা সাধারণ ঘটনাকেও তারা অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। এবং অলৌকিক ঘটনা বলে সেটাকে তারা প্রচার করে। আর তাদের সমগোত্রীয় কিছু মানুষ আছে যারা সে কথা বিশ্বাস করে। নিশি হল সেইসব মানুষেরই একজন। আর তাই সুবর্ণলতাকে দেখে তার অপ্সরী বলে মনে হয়েছে। এবং সে তেমনটাই বলে বেড়াচ্ছে।

তারপর তিনি রাজামশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা স্বামী, আপনি তো তালুকে-মুলুকে ঘুরে বেড়ান। দেশ বিদেশে পাড়ি জমান। তা আপনি কোথাও কোনদিন অপ্সরীর দেখা পেয়েছেন?

রানীর প্রশ্নের উত্তরে রাজামশাই বললেন, না রানী, আমি কোথাও কোনদিন অপ্সরীর দেখা পাইনি।

তো কিছুক্ষণ পরে রাজাবাবু ছিদাম ঢালিকে ডেকে পাঠালেন। এবং ছিদাম ঢালি রাজাবাবুর সম্মুখে হাজির হতেই তিনি তার কাছে সুবর্ণলতা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

কিন্তু ছিদাম রাজাবাবুকে বলল যে সে সুবর্ণলতা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আর বড়কুমার সুবর্ণলতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে প্রমোদভবনে তুলেছেন বলে যা রটেছে তাও সে বিশ্বাস করে না।

রাজাবাবু বললেন, তবুও তোমাদের রানীমা যখন বলছেন যে বড়কুমার তাকে প্রমোদভবনে নিয়ে তুলেছে, তখন তুমি সেখানে তার খোঁজ কর। ওখানকার মালীদের এব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। প্রমোদভবনের প্রত্যেকটি ঘর খুলে দেখ। আমার কাছে সব ঘরের একপ্রস্ত চাবি আছে। কালই কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়। এখন যাও।

ছিদাম হাতজোড় করে রাজাবাবুকে প্রণাম করল। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর এদিকে রাজাবাবুকে প্রণাম করে ছিদাম ঢালি যখন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, রাজবাড়ির রানীমহলে বসে রানীমা তখন নিশিকে ডেকে পাঠালেন। আর খানিক বাদে নিশি হাজির হতেই রানীমা তাকে বললেন, নিশি, তুই এখনই একবার

শিওল গ্রামে যা। ওই গ্রামের ফটিকচাঁদ আমার লোক। ওকে তুই সঙ্গে করে নিয়ে আয়। বলবি, জরুরি প্রয়োজন।

আর ঘন্টা দুয়েক পর ফটিকচাঁদ রানীমার সামনে হাজির হতেই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ফটিকচাঁদ, তোদের গ্রামের সুবর্ণলতা গত বছর আশ্বিন মাসে গাঙের ঘাটে জল আনতে যেয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। তার কোন খোঁজ পেয়েছিস?

ফটিকচাঁদ উত্তর দিল, আজ্ঞা, সুন্দরী যুবতী একবার নিখোঁজ হলে তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না, রানীমা। সে বেচারী চিরকালের মতো হারিয়েগেছে। আর মেয়ের শোক সহ্য করতে না পেরে ওর বাপ মাও দেহ রেখেছে। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখজনক!

কিন্তু সুবর্ণলতা হারিয়ে যায়নি, ফটিকচাঁদ। ও আমাদের জমিদারীর মধ্যেই আছে। বড়কুমার রাজশঙ্কর ওকে তুলে এনে প্রমোদভবনে রেখেছে। নাচগানের তালিম দিয়ে সে ওকে বাঈজী করে তুলেছে। ও এখন বহাল তবিয়তে আছে।

এ কি কথা শোনালেন, রানীমা! সুবর্ণলতা হারিয়ে যায়নি! ও বড়কুমারের কাছে আছে। ও বহাল তবিয়তে আছে। আঃ! এই খবরটা আগে জানাজানি হলে ওর বাপ মায়ের অকাল মৃত্যু হত না। ওরা বেঁচে যেত, মা।

কিন্তু বড়কুমারের কাছে সুবর্ণলতা বড় ঘৃণিত জীবনযাপন করছে, ফটিকচাঁদ। বড়কুমার ওকে রক্ষিতা করে রেকেছে। এই অনাচার সহ্য করা যায় না। এর প্রতিকার করতে হবে। তারজন্য শিওল গ্রামের প্রজাদের এগিয়ে আসতে হবে। বড়কুমারের কাছ থেক সুবর্ণলতাকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করে এনে ওকে সম্মানজনক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই অনাচার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু শিওল গ্রামের গরিব প্রজাদের ক্ষমতা কতটুকু, মা? প্রজারা গরিব। প্রজারা অশিক্ষিত। প্রজারা অনাহার ক্লিষ্ট। আর তাই তাদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, সবই তাদের মুখবুজে সহ্য করতে হয়।

একটু থেমে ফটিকচাঁদ বলল, তাছাড়া এরজন্য প্রতিবাদ করার প্রয়োজনই বা কী, মা? সুবর্ণলতা গরিব ঘরের সুন্দরী বিধবা। বোম্বেটেদের হাতে পড়লে তারা ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেত। অথবা ওকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিত। তার চেয়ে এ ঢের ভাল হয়েছে।

অনাহার ক্লিষ্ট ঘরের বিধবা মেয়ে সুবর্ণলতা। বড়কুমারের কাছে বেচারী খেয়েদেয়ে সুখে আছে। গানবাজনা নিয়ে আছে। ভাল ভাল শাড়ি গয়না পরছে। আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। এ আর এমন দোষের কি! এমন ঘটনা তো আকছার ঘটছে!

কিন্তু এযে অন্যায়! এ যে অনাচার! আমার জমিদারীর মধ্যে এমন ঘটনা ঘটলে আমি তো তা বরদাস্ত করতে পারি না। এর একটা বিহিত করতে হবে!

শোন, ফটিকচাঁদ। তুই তোদের শিওল গ্রামের প্রজাদের একত্রিত কর। একত্রিত করে তোরা রাজাবাবুর কাছে দরবার কর। বড়কুমারের এই জঘন্য অপরাধের জন্য তোরা তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা কর। আমি তোদের সঙ্গে আছি।

কিন্তু মা, আমরা বড়কুমার এবং ওর দুষ্টপঞ্চককে বড় ভয় পাই। এমন কোন দুষ্কর্ম নাই যা ওঁরা করতে পারেন না।

বললাম তো, আমি তোদের সঙ্গে আছি। তোদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

শোন। সুবর্ণলতা বড়কুমারের কাছে ঘৃণিত জীবন যাপন করছে। ওকে ঘৃণিত জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে। তোরা ওকে উদ্ধার কর। তারপর বাকী জীবন ও যাতে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে, সে ভার আমার।

কথা ক'টি শেষ করেই রানীমা একটি ভারী টাকার থলি ফটিকচাঁদের দিকে ছুড়ে দিলেন। এবং বললেন, এই নে। এতে বেশ কিছু টাকা আছে। এগুলো দিয়ে তুই শিওল গ্রামের মাতব্বরদের কিনে নে। তাহলে আর অশিক্ষিত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে অসুবিধা হবে না। তাদের একত্রিত করতে অসুবিধা হবে না। কাজটা গ্রামেব মাতব্বররাই করে দেবে।

ফটিকচাঁদ রানীমার ছুড়ে দেওয়া ভারী টাকার থলিটা দু'হাতে লুফে নিল। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে বলল, আপনি যেমনটি চাইছেন, ঠিক তেমনটিই হবে, রানীমা। এবারে আমাকে আজ্ঞা দিন।

রানীমা বললেন, হ্যাঁ তুই আয়।

* * *

তো তার পরদিন ছিদাম ঢালি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ারণ্যে গেল। এবং ওখানকার প্রমোদভবনের প্রত্যেকটি কক্ষ ও গুপ্তকক্ষ খুলে সুবর্ণলতাব খোঁজ করল। আশপাশেও খুঁজে দেখল। কিন্তু সুবর্ণলতাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

ওখানকার মালীদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, আমরা সারাদিন মৃগযারণ্যে থাকি। গাছপালার পরিচর্যা করি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি। তারপব সন্ধ্যের আগে আমরা আমাদের গ্রামে ফিরে যাই। তাই রাতের বেলা কোন ঘটনা ঘটলে আমরা তা জানতে পারি না। তবে দিনের বেলায় আমরা কোন মেয়েছেলেকে মৃগয়ারণ্যে দেখি নি।

* * *

রাজাবাবুর মুখে এখবর শুনে রানীমা বললেন, অমন সাদামাটা ভাবে খোঁজ করলে সুবর্ণলতাকে পাওয়া যাবে না। সুবর্ণলতাকে পেতে হলে বড়কুমারের গতিবিধির প্রতি নজর রাখতে হবে। কুমারের খাস পরিচারককে হাত করে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। তারপর দলবল নিয়ে, রাতের অন্ধকারে বড়কুমার এবং ওর দুষ্ট পঞ্চকের পিছু নিতে হবে। আব তাহলেই সুবর্ণলতার কাছে পৌঁছনো যাবে। এবং কুমারের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করা যাবে। ওর ঘৃণিত জীবনযাপনে ইতি টানা যাবে।

তারপর রানীমা বললেন, আপনি সবসময় রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন। আপনার সময় কম। তাই সংবাদ সংগ্রহের ভারটা আমিই নিলাম। এব্যাপারে আপনাকে আমি যথাসময়ে অবহিত করব।

আর তার ঠিক দু'দিন বাদে ফটিকচাঁদ শিওল গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রাজসমীপে হাজির হল। এবং সুবর্ণলতাকে বড়কুমারের কবল থেকে উদ্ধার করে তাকে সম্মানজনক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজামশাইয়ের কাছে আর্জি জানাল। আর বড়কুমারের এই গর্হিত অপরাধের জন্য তারা তাঁর বিচার প্রার্থনা করল।

প্রজাদের আর্জি শুনে রাজামশাই বললেন, আপনাদের কথা অনুযায়ী বড়কুমার রাজশঙ্কর সুবর্ণলতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘৃণিত জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। কথাটা ক'দিন আগে আমার কানে আসায় আমি ইতিমধ্যেই আমার ক'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা প্রমোদভবনের প্রত্যেকটি কক্ষে অনুসন্ধান করিয়েছি। এ ব্যাপারে ওখানকার মালীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়েছি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সুবর্ণলতার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

রাজামশাই চুপ করতেই ফটিকচাঁদ এগিয়ে এসে বলল, অপরাধ নেবেন না, রাজামশাই। এমন একটা ঘটনা যে ঘটবে তা আমরা আগে থেকেই আঁচ করেছিলাম। লোক জানাজানি হওয়ায় বড়কুমার যে সুবর্ণলতাকে অন্যত্র সরিয়ে দেবেন তা আমরা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন দেখছি ঘটনাটা সেদিকেই মোড় নিয়েছে।

ফটিক চাঁদের কথা শুনে রাজামশাই মনে মনে রুষ্ট হলেন। এবং তিনি বললেন, সুবর্ণলতার অপহরণ নিয়ে আপনারা বড়কুমারকে সন্দেহ করছেন। আপনারা তার বিচার চাইছেন। কিন্তু যথাযথ বিচারের জন্য, পক্ষপাতহীন বিচারের জন্য সাক্ষী-সাবুদের প্রয়োজন হয়। তাই বড়কুমার যে সুবর্ণলতাকে অপহরণ করেছে আপনারা তার প্রমাণ দিন। আপনারা আমার সম্মুখে এমন একজনকে হাজির করুন যিনি স্বচক্ষে সুবর্ণলতাকে অপহরণ করতে দেখেছেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, দোষী সাব্যস্ত হলে বড়কুমারকে আমি কঠোর শাস্তি দেব।

রাজামশাইয়ের কথা শুনে সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। এবং এইভাবে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সুবর্ণলতা অপহরণের প্রমাণ দিতে কেউ রাজামশাইয়ের সম্মুখে এগিয়ে এল না। বা, কেউ এগিয়ে এসে বলল না যে সে স্বচক্ষে সুবর্ণলতাকে অপহরণ করতে দেখেছে।

তখন চতুর ফটিকচাঁদ এগিয়ে এসে বলল, রাজামশাই, আপনার শিওল গ্রামের প্রজারা বড় গরিব। তাদের ধনবল নেই। আর তাই তাদের মনবলও নেই। অন্যদিকে বড়কুমার রাজশঙ্কর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মহাপরাক্রমশালী। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার সাহস শিওল গ্রামের প্রজাদের নেই।

আপনি আমাদের রাজা। এবং আমরা আপনার প্রজা। আর রাজা হলেন প্রজার পিতার সমান। আপনার এক প্রজার ঘরের বালবিধবা সুন্দরী কন্যা অপহৃতা হয়েছে। আর একমাত্র কন্যার শোক সহ্য করতে না পেরে ইতিমধ্যেই তার পিতামাতা প্রাণত্যাগ

করেছে। এবং এই ধরনের এক অঘটন ঘটে যাওয়ায় আমরা, শিওল গ্রামের প্রজারা শোকাহত হয়েছি। মর্মাহত হয়েছি।

কয়েকদিন পূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার অধীনস্থ কোন এক রাজকর্মচারী অপহৃতা সুবর্ণলতার সন্ধান পেয়েছেন। এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সুবর্ণলতা এখন বড়কুমার রাজশঙ্করের কাছে রয়েছে। এবং সে অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করছে। তাকে অবাঞ্ছিত জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় আমরা, শিওল গ্রামের প্রজারা আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি অনুগ্রহ করে সুবর্ণলতাকে বড়কুমারের কবল থেকে উদ্ধার করুন। এবং উদ্ধার করে তাকে সম্মানজনক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, রাজামশাই।

ফটিকচাঁদের কথার নৈপুণ্যে রাজামশাই শান্ত হলেন। এবং তিনি বললেন, ঠিক আছে। আপনারা আমাকে মাসখানেক সময় দিন। বড়কুমার যদি সত্যই সুবর্ণলতাকে অপহরণ করে থাকে, তবে আমি তাকে উদ্ধার করে এনে সম্মানজনক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব। আর এই গর্হিত কর্মের জন্য কুমারকে আমি কঠোর শাস্তি দেব।

রানী জগদম্বা দেবী রাজামশাইয়ের পাশেই বসেছিলেন। রাজামশাই চুপ করতেই তিনি সমবেত প্রজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, রাজামশাই আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সুবর্ণলতাকে বড়কুমারের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে সম্মানজনক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর বড়কুমারের এই অপরাধের জন্য তিনি তাকে শাস্তিও দেবেন। এবারে আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যান।

এরপর সমবেত প্রজারা রাজামশাই এবং রানীমাকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

* * *

**কুমার রাজশঙ্করের সঙ্গে সুলতার পরিচয় হওয়ার দ্বিতীয় দিনে সে কুমারকে বলেছিল, কুমার, তুমি তোমার অতীতকে ভুলে যাও। অন্ধকারময় অতীতকে ভুলে তুমি বর্তমানের আলোয় এসে দাঁড়াও। তোমার ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা বিসর্জন দিয়ে তুমি মানুষকে ভালবাস। প্রজাদের ভালবাস। আগে তুমি একজন ভালমানুষ হও। তাহলেই ভবিষ্যতে তুমি একজন ভাল জমিদার হতে পারবে। আর আমাকেও তোমার পাশে পাবে।**

**সুলতার কথা ভেবে কুমার তাই চুপ করে বসেছিল। তার পিতা রাজা সৌভদ্রশঙ্করের নিকট শিওল গ্রামের প্রজারা তার নামে মিথ্যা নালিশ করেছে জেনেও সে চুপ করে বসেছিল। কারণ সে সুলতাকে কথা দিয়েছিল, সে ভাল হতে চেষ্টা করবে।**

**শিওল গ্রামের সুন্দরী যুবতী সুবর্ণলতা গতবছর আশ্বিনমাসে গাঙের ঘাটে জল আনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। তখন নানা জনে নানা কথা বলেছিল। সুবর্ণলতার**

পিতা এবং কিছু প্রজা তখন তাকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তখনকার মতো চাপা পড়ে যাওয়ায় সে আর এনিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এতদিন পরে শিওল গ্রামের প্রজারা এবার উঠে পড়ে লেগেছে। রাজামশাইয়ের কাছে তারা মিথ্যা নালিশ করেছে। তারা তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

সুলতার কথাগুলো স্মরণে এনে কুমার ভাবতে লাগল, আচ্ছা, এইসব দুর্জন এবং মিথ্যাচারী প্রজাদের কী ভালবাসা যায়? এদের মতো প্রজাদের ভালবেসে কী নিজে ভাল হওয়ার চেষ্টা করা যায়? এদের মতো প্রজাদের নিয়ে কী নিজে একজন ভাল জমিদার হওয়া যায়? একজন প্রজাবৎসল জমিদার হওয়া যায়?

কুমার ভাবতে লাগল, খুব ভাল হত যদি এই মুহূর্তে একবার সুলতার সঙ্গে দেখা করা যেত। এই পরিস্থিতি নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা যেত। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

কারণ, সুলতা তাকে আগেই বলেছে যে তারা সূক্ষ্মদেহী প্রাণী। একমাত্র অমাবস্যা তিথির অন্ধকার রাতে তারা বায়বীয় দেহ ধারণ করতে পারে। এবং সেই বায়বীয় দেহ দৃষ্টিনন্দন হয়। আর তা অটুট থাকে। কিন্তু অন্য তিথির অন্ধকার রাতে বায়বীয় দেহ ধারণ করলে তা ধূমজ দেহের ন্যায় কুৎসিত এবং ক্ষণভঙ্গুর হয়। সুতরাং সুলতার সঙ্গে দেখা করতে হলে তাকে আগামী অমানিশার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী অমানিশার আগে সুলতা তার কাছে আসবে না। সুলতার সঙ্গে তার দেখা হবে না। তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনাও করা যাবে না।

নিজের মহলে বসে কুমার এইসব কথা ভাবছিল। এমন সময় তার সর্বক্ষণের সঙ্গী 'পঞ্চমিত্র' এসে হাজির হল। এবং তাদের দলপতি দিলদার সক্ষোভে বলল, আর তো সহ্য করা যায় না, কুমার। শিওল গ্রামের প্রজারা এবার বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। তোমাকে তারা সুবর্ণলতার অপহরণকারী বলে অভিযোগ করেছে। তাই এর একটা বিহিত করা দরকার। ওইসব মিথ্যাচারী প্রজাদের সম্যক শাস্তি দেওয়া দরকার।

কিন্তু মিত্র, আমি যে সুলতাকে কথা দিয়েছি, অতীতের ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ভুলে আমি মানুষকে ভালবাসতে চেষ্টা করব। প্রজাদের ভালবাসতে চেষ্টা করব। আমি ভাল হতে চেষ্টা করব।

কিন্তু তুমি ভাল হতে চেষ্টা করলেও ওই দুরাচারী প্রজারা তোমাকে ভাল হতে দেবে না। ভাল থাকতে দেবে না। শান্তিতে থাকতে দেবে না।

কুমার, ওরা তোমার নামে মিথ্যা নালিশ করেছে। ওরা তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আর তুমি ওদের ভালবাসতে চাও? ওরা তোমাকে সুবর্ণলতার অপহরণকারী বলে প্রচার চালিয়ে এ রাজ্যের মানুষের মন বিষিয়ে তুলেছে। আর তুমি ওদের ভালবাসতে চাও? ওরা তোমার গায়ে কলঙ্কের কাদা ছোটাচ্ছে। ওরা তোমার নামে ঘৃণার থুতু ছেটাচ্ছে। আর তুমি ওদের ভালবাসতে চাও?

আসলে শিওল গ্রামের প্রজারা এই মুহূর্তে এক-একটি দুষ্ট কুকুর। আর ওইসব দুষ্ট

কুরদের শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজন শক্ত মুগুর। শক্ত মুগুরের যথোচিত ব্যবহারে রা ঠান্ডা হবে। ওরা শান্ত হবে। ওদের ভালবাসার কথাটা তুমি তখন চিন্তা কোরো। খন নয়।

একটু থেমে দিলদার বলল, তবে তোমাকে আমরা কথা দিচ্ছি, কুমার। শিওল ামে গিয়ে আমরা কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাব না। খুন-খারাবির মধ্যে যাব না। আমরা ধু ওদের ঘরগুলোতে আগুন দেব। আমরা ওদের গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার রে দেব। আমরা ওদের মিথ্যা অপবাদ রটানোর বদলা নেব। ব্যস্।

একটু থেমে পঞ্চমিত্র প্রধান দিলদার আবার বলল, কুমার, তুমি শুধু একবার 'হ্যাঁ' ল। বাকী ব্যবস্থা আমরাই করে নেব।

কিন্তু দিলদারের কথায় কুমার স্বস্তি পেল না। আর তাই সে দিলদারকে বলল, দেখ মিত্র, শিওলগ্রামের ওই ফটিকচাঁদ স্বল্পশিক্ষিত, কিন্তু অধিক চতুর। আর সে ছোটরানীর াতের লোক। ওর মতো একজন সাধারণ প্রজার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আমার যেন ানে হচ্ছে যে এর পেছনে ছোটরানীর হাত আছে। আর ওই ফটিক চাঁদ যা বলে গেল, া সবই ছোটরানীর শেখানো বুলি। এবং এটা ছোটরানীর একটা চক্রান্ত। আর এই ক্রান্তের পেছনে তাঁর কোন দুরভিসন্ধি আছে। তাই কিছু না বুঝে তোমরা তাঁর ক্রান্তের শিকার হয়ো না। তাঁর পাতা ফাঁদে পা দিও না। অন্ধের মতো ওই মনুষ্যরূপী াগিনীর লেজে পা দিতে যেও না। শিওল গ্রামের প্রজাদের ঘরপোড়া কালিতে যেন নজেদের মুখমন্ডল কালিমালিপ্ত কোরো না।

মিত্র দিলদার, আমার কথা শোন। তোমরা যা করতে চাইছ, ভেবেচিন্তে কোরো। বং কিছু করার আগে দু'বার ভাল করে ভেবে নিও।

* * *

শিওল গ্রাম সম্বন্ধে দুষ্ট পঞ্চকের নির্মম মনোভাবের কথা রানীমার কানে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। কুমারের মহলের হুঁকাবরদার মধুসূদন এসে রানীমাকে হাতজোড় করে লল, মা, তুমি শিওল গ্রামকে রক্ষাকর। দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চক ঠিক করেছে যে আগামীকাল াতে তারা শিওল গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। এই গতবছর আমি ওই গ্রামে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ওদের তুমি রক্ষা কর। শিওল গ্রামকে তুমি ক্ষা কর, মা।

মধুসূদনের কথা শুনে রানীমা অবাক হলেন। মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। এবং উনি মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, দুষ্টপঞ্চকের ওইসব কথাবার্তা তুই নিজের কানে শুনেছিস, মধু?

মধু উত্তর দিল, হ্যাঁ মা, আমি নিজের কানে শুনেছি। ওদের সব কথা আমি আড়ি পেতে শুনেছি। আর তাই মেয়ে জামাইয়ের কথা ভেবে আমার বড় ভয় হচ্ছে। শিওল গ্রামের কথা ভেবে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মা।

তোর কোন ভয় নাই। আমি শিওল গ্রামকে রক্ষা করব। তুই তোর কাজে যা। তবে ওদের প্রস্তুতির প্রত্যেকটি খবর তুই ঠিক সময়মতো আমার কাছে পৌঁছে দিস।

এখন যা।

যে আজ্ঞে, বলে মধুসূদন রানীমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর মধুসূদন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রানীমা বসলেন কালিকলম নিয়ে। ওঁর পিতাকে একখানি জরুরী পত্র লিখতে। উনি লিখলেন,

চন্দনপুর,
১২ই চৈত্র

পরম পূজনীয় পিতা,

আগামী কল্য রাত্রে কুখ্যাত দুষ্টপঞ্চক দ্বারা আমাদের শিওল গ্রাম আক্রান্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। উক্ত গ্রামটিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করিতে হইবে। সেইহেতু অদ্যরাত্রেই আপনি আপনার এস্টেটের দশজন পাকা লাঠিয়ালকে শিওল গ্রামে প্রেরণ করিবেন। উক্ত গ্রামের বিশ্বস্ত লোক ফটিক চাঁদ উহাদের সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিবে।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি—আপনার স্নেহধন্যা কন্যা
জগদম্বা

আর পত্র লেখা শেষ হতেই নিশি ছুটল রানীমার পিতা জমিদার বিশ্বজিৎ রায়ের এস্টেটের উদ্দেশ্যে, জরুরী পত্রখানা তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে।

* * *

তো পরদিন বিকেল হতেই গোটা শিওল গ্রাম উত্তেজনায় টানটান হয়ে রইল। জমিদার বিশ্বজিৎ রায়ের এস্টেটের লেঠেলদের সঙ্গে শিওল গ্রামের তাবৎ যুবকবৃন্দ যোগ দিল। তারা লাঠিসোটা, তীর-ধনুক, ভল্ল নিয়ে তৈরী হয়ে রইল। তারা তৈরী হয়ে রইল কুখ্যাত দুষ্টপঞ্চকের মোকাবিলা করার জন্য। তারা তৈরী হয়ে রইল তাদের শিওল গ্রামকে রক্ষা করার জন্য।

আর গ্রামের যুবতীরা, ঝি-বৌয়েরা তারাই বা কম যায় কিসে? সারাদিনের পরিশ্রমে তারা লড়িয়েদের হাতিয়ারগুলো ব্যবহারযোগ্য করে তুলল। সেগুলোকে তারা গোছগাছ করে রাখল। ঠিক সময়ে সেগুলোকে তারা লড়িয়েদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখল। আর বিকেল হতেই তারা লড়িয়েদের জন্য লুচি-তরকারি তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তারপর সন্ধ্যা হল। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠল। মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হল। মসজিদ হতে পবিত্র আজান ধ্বনি ভেসে এল। খানিকবাদে সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হল। আর সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হতেই সারা গ্রামে অজস্র মশাল জ্বেলে দেওয়া হল

তারপর জলযোগ সেরে সশস্ত্র লড়িয়েরা অপেক্ষা করে রইল দুষ্ট পঞ্চকের মোকাবিলা করার জন্য। শিওল গ্রামকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

রাত বাড়তে লাগল। পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল রাম রহিম শ্যাম করিমদের উত্তেজনা! সশস্ত্র লড়িয়েদের উত্তেজনা। গোটা গ্রামবাসীদের উত্তেজনা। সবার মনেই কী হয়, কী হয় ভাব।

রাত বাড়তে লাগল। কিন্তু কোথায় কী? কোথায় কে? এক সময় মনে হল ওরা বুঝি আর এল না। কারণ গ্রামবাসীদের প্রস্তুতির খবর ওরা পেয়ে গেছে। রানীমার গোপন সহায়তার কথা ওরা জেনে গেছে। আর তাই ওরা ভয় পেয়ে গেছে। ওরা পিট্টান দিয়েছে।

রাত বাড়তে লাগল। এক সময় শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ল। আর ঠিক তখনই উঁচু গাছের মগডাল থেকে ফটিকচাঁদ ও তার সঙ্গীসাথীরা চিৎকার করে উঠল, ওরা আসছে, ওরা আসছে। ওরা পাঁচ নয়, ওরা পঁচিশ। ওরা পঁচিশ নয়, হয়তো পঞ্চাশ। ওরা অশ্বারোহী। ওরা অশ্বারোহণে ছুটে আসছে। ওরা মরা বিলের পাশের মাঠ দিয়ে ছুটে আসছে। ওরা আমাদের গ্রামের দিকে ছুটে আসছে। ওদের হাতে জ্বলন্ত মশাল, কোমরে ঝকঝকে তলোয়ার। ওরা ছুটে আসছে। ওরা ছুটে আসছে। তোরা তৈরী হ। তোরা তৈরী হ। তোরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী হ।

ফটিকচাঁদ ও তার সঙ্গীসাথীদের চিৎকারে শিওল গ্রামের লড়িয়েরা সচকিত হল, আলোড়িত হল। মুহূর্ত মধ্যে তারা যে যার হাতিয়ার হাতে তুলে নিল। তারপর তারা গ্রামে ঢোকার মাঠের দিকে ছুটে চলল।

মাঠে গিয়ে তারা সংহত হল। মাঠে যেয়ে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তাদের কেউ বা অশ্বারোহী, কেউ বা পদাতিক।

তারা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। লড়াই করে তাদের শিওল গ্রামকে রক্ষা করার জন্য। আর ছদ্মবেশী রানীমা, নিশিকে পাশে নিয়ে অশ্বারোহণে দাঁড়িয়ে রইলেন তাদেরই পাশে। তাদের মনে সাহস যোগাতে। তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে।

দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চকের কাছে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া কোন নতুন ব্যাপার নয়। ও কাজ তারা আগেও করেছে। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, একহাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তারা অতর্কিতে অবাধ্য প্রজার গ্রামে হানা দিয়েছে। তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। ঘর পুড়েছে। প্রজারা প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। আর সেসব দেখে পঞ্চবীর উল্লাসে ফেটে পড়েছে। তারপর বীরদর্পে তারা কুমারের কাছে ফিরে এসেছে। দু'হাত ভরে ইনাম নিয়েছে। রাজা সৌভদ্রশঙ্করের রাজ্যে কুমার ও তার পঞ্চমিত্র এইভাবে সমান্তরাল শাসন চালিয়ে এসেছে। আর সবকিছু জেনেও স্নেহান্ধ পিতা না-জানার ভান করে চুপ করে থেকেছেন।

কিন্তু এবারের ব্যাপার-স্যাপারগুলো যেন একেবারে আলাদা। মরা বিলের মাঠ

পেরিয়ে এসে দুষ্টপঞ্চক ও তার পঞ্চাশজন সঙ্গীসাথী তাই থমকে দাঁড়ায়। ওই পঞ্চান্নজন অভিজ্ঞ লড়িয়ে অবাক হয়ে শিওল গ্রামের দিকে তাকায়। হাজারো মশালের আলোয় আলোকিত গ্রামের দিকে তাকিয়ে তারা ধন্দে পড়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। আর হঠাৎ অমন থমকে দাঁড়ানোয় ঘোড়াগুলো অশান্ত হয়ে ওঠে। পা ঠুকতে থাকে। চিঁহি চিঁহি রব তোলে। দিলদারের সহযোদ্ধারা অমন বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দলপতির মুখের দিকে তাকায়। তার নির্দেশ জানতে চায়।

কুমারের সতর্কবাণীর কথা দিলদারের মনে পড়ে যায়—'এটা ছোটরানীর চক্রান্ত। কিছু না বুঝে তোমরা তাঁর চক্রান্তের শিকার হয়ো না। তাঁর পাতা ফাঁদে পা দিও না।'

হ্যাঁ, হতে পারে এটা ছোটরাণীর একটা চক্রান্ত। হতে পারে এটা তাঁর পাতা ফাঁদ। কিন্তু লড়াই করতে এসে তো আর পিছু ফেরা যায় না! জানের ভয়ে তো আর মান খোয়ানো যায় না!

হোক এটা ছোটরানীর একটা চক্রান্ত। হোক এটা তাঁর পাতা ফাঁদ। তবুও লড়তে হবে। জান যায় যাবে। একজন লড়িয়ের কাছে জানের চেয়ে মান বড়। মান রাখতে জানের মায়া ত্যাগ করতে হবে।

এসব কথা ভেবে দলপতি দিলদার ফুঁসে ওঠে। সে তার সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে, মনে হচ্ছে, রানীমার সহায়তায় শিওলের গেঁয়োগুলো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। প্রতিরোধ গড়ে তুলে ওরা আমাদের প্রতিহত করতে চাইছে। আনাড়ীগুলো হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে অসম লড়াই করে ওরা শহীদ হতে চাইছে। ওদের মনোবাঞ্ছা আমরা অবশ্যই পূরণ করব। ওদেরকে আমরা বিধ্বস্ত করব। ওদের খড়কুটোর কুঁড়েগুলোকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব। আমরা কুমারের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার বদলা নেব।

হে আমার বীর সাথীরা, তোমরা ছুটে চল। বীরবিক্রমে ছুটে চল। বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চল। তোমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। ওদেরকে তোমরা বিধ্বস্ত কর। ওদের গ্রামটাকে তোমরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।

দলপতি দিলদারের সময়োচিত ভাষণে কাজ হল। ওর সঙ্গীসাথীদের ইতস্ততঃ ভাব কেটে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কেটে গেল। দলপতির ভাষণে ওরা উজ্জীবিত হল। ওরা প্রবুদ্ধ হল। ওরা জ্বলন্ত মশাল উঁচিয়ে শিওল গ্রামের দিকে ছুটে চলল। মুখে রে ... তুলে ওরা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলল।

... কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শিওল গ্রামের শ'দুয়েক অনভিজ্ঞ লড়িয়ের প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। চিৎকার চেঁচামেচি আর অস্ত্র আস্ফালনের মধ্য দিয়ে দু'দল দু'দলের দিকে ধেয়ে গেল। দু'দল দু'দলের কাছাকাছি এল। দু'দল দু'দলের কাছাকাছি হল কিন্তু সংঘর্ষ বাঁধল না। দলপতি দিলদার সংঘর্ষের পথে হাঁটল না। সে তার সঙ্গীসাথীদের সংঘর্ষের পথে হাঁটতে দিল না। উল্টে দলপতির নির্দেশে তার সঙ্গীসাথীরা তাদের হাতের জ্বলন্ত মশালগুলো শিওল গ্রামের অনভিজ্ঞ লড়িয়েদের লক্ষ্য করে

ছুড়তে লাগল। আর অভিজ্ঞ লড়িয়েদের এহেন আচরণের সম্মুখীন হয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্য লড়িয়েরা হকচকিয়ে গেল। তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল। অতগুলো জ্বলন্ত মশালের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তারা ছুটোছুটি করতে লাগল। দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কিছু লড়িয়ের পোষাকে আগুন ধরে যাওয়ায় তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। গায়ের আগুন নেভাতে কেউ কেউ খোলামাঠে গড়াগড়া দিতে লাগল। আর এহেন দৃশ্য দেখে কুমারের অভিজ্ঞ লড়িয়েরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। তারা অনভিজ্ঞ গ্রাম্য লড়িয়েদের পিছু ধাওয়া করল। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া গ্রাম্য লড়িয়েরা ছুটে পালাতে লাগল।

দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চক ও তাদের সঙ্গীসাথীদের নির্মমতার কথা জমিদার বিশ্বজিৎ রায়ের এস্টেটের লেঠেলরা এতদিন লোকমুখে শুনে আসছিল। এবারে চোখের সামনে তাদের তান্ডব দেখে তারাও হকচকিয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এবং শেষে গ্রাম্য লড়িয়েদের পথ অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে হওয়ায় তারাও ছুটে পালাতে লাগল। ফলে মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই শিওল গ্রামের লড়াইয়ের ময়দান পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গেল।

লড়াইয়ের ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল, কিন্তু ময়দানের আশপাশের ঝোপেজঙ্গলে তখনও ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচি এবং বিজয়ীদের উল্লাস ধ্বনির শব্দ শোনা যেতে লাগল। এবং ওটা চলতেই থাকল।

আর শিওল গ্রামের লড়িয়েদের আচরণ লক্ষ্য করে, জমিদার বিশ্বজিৎ রায়ের লেঠেলদের আচরণ লক্ষ্য করে, রানীমা নিশিকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তর ছুটোছুটি করলেন, গলা ফাটিয়ে সকলকে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে আসতে বললেন। লড়াই করতে বললেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতই করল না। আর এসব দেখে অশ্বারোহী রানীমা যারপর নাই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি লজ্জায় অধোবদন হলেন।

* * *

আর এদিকে শিওল গ্রামের লড়িয়েরা, জমিদার বিশ্বজিৎ রায়ের লেঠেলরা যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ছুটোছুটি করছিল, দৌড়াদৌড়ি করছিল, চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, গায়ের আগুন নেভাতে কেউ কেউ খোলামাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, ফটিকচাঁদ ও তার সঙ্গীসাথীরা তখন তাদের গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। গ্রামে ছুটে যেয়ে তারা তাদের বিপর্যয়ের কথা গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বলছিল। এবং গ্রামের ঝি-বৌ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তারা মশাল হাতে তুলে নিতে বলছিল। অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলছিল। তারপর লড়াইয়ের ময়দানে ছুটে যেয়ে তারা তাদের শিওল গ্রামকে রক্ষা করতে বলছিল। শিওল গ্রামের ইজ্জত রক্ষা করতে বলছিল।

ফটিকচাঁদ ও তার গ্রামের সঙ্গীসাথীদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল না। শিওল গ্রামের সাতশো ঝি-বৌ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল মুহূর্ত মধ্যে জ্বলন্ত মশাল হাতে তুলে নিল। অস্ত্র হাতে তলে নিল। তারপর তারা লড়াইয়ের ময়দানের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

ওদিকে শিওল গ্রামের দুশো লড়িয়েকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে, বিপর্যস্ত করে দিয়ে দুষ্টপঞ্চক ও তাদের সঙ্গীসাথীরা ততক্ষণে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে এসেছিল। লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে এসে তারা পূর্বপরিকল্পনা মাফিক গোটা শিওল গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর ঠিক তখনই তারা শিওল গ্রামের সাতশো ঝি-বৌ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মশাল হাতে নিয়ে, অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝড়ের গতিতে তাদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখল। এবং ওই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। নারীশক্তির জাগরণ, মাতৃশক্তির জাগরণ, সারা শিওল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার অভূতপূর্ব জাগরণ দেখে তারা চমকিত হল, শিহরিত হল। অবাক হয়ে তারা ওই জেগে ওঠা মানুষের মহামিছিলের দিকে চেয়ে রইল।

আর শুধুমাত্র দুষ্টপঞ্চক ও তাদের সঙ্গীসাথীরা নয়, ওই ধেয়ে আসা মানুষের মহামিছিলের দিকে চেয়ে ঝোপেজঙ্গলে লুকিয়ে থাকা শিওল গ্রামের লড়িয়েরাও চমকিত হল। তাদেরই ঘরের ঝি-বৌ, ভাইবোন, বৃদ্ধ পিতামাতাদের লড়াইয়ের ময়দানে ধেয়ে আসতে দেখে লজ্জায় তাদের মাথা কাটা গেল। মুহূর্তমধ্যে তারা তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ঝোপ-জঙ্গল হতে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা লড়াইয়ের ময়দানে ছুটে এল। তারপর শিওল গ্রামের প্রায় হাজার খানেক আবালবৃদ্ধবণিতা একতাবদ্ধ হয়ে দুষ্টপঞ্চক ও তাদের পঞ্চাশজন সঙ্গীসাথীকে ঘিরে ফেলল। তাদের শত্রুদের ঘিরে ফেলে তারা চক্রব্যূহ্য রচনা করল। তারপর তাদের হাতের জ্বলন্ত মশালগুলো তারা শত্রুদের মুখে ছুড়ে মারতে লাগল। তাদের হাতের অস্ত্র দিয়ে তারা শত্রুদের আঘাত হানতে লাগল। আঘাতে আঘাতে তারা তাদের জর্জরিত করতে লাগল। অবাধ্য প্রজার ঘরে আগুন দিতে এসে শেষে অবাধ্য প্রজার হাতেই তাদের প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হল।

মহাভারতের বীরযোদ্ধা অর্জুনপুত্র অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবেশ করার কৌশল শিখেছিলেন; কিন্তু নির্গমের উপায় শিক্ষা করেন নাই। আর তাই তাঁকে সপ্তরথী মিলে অন্যায়যুদ্ধে সংহার করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের আখ্যায়িকার পঞ্চান্নজন বীরপুঙ্গবের শিক্ষার ধরন-ধারন ছিল একেবারে আলাদা। তারা চক্রব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবেশ করার কৌশল শিক্ষা করে নাই; কিন্তু নির্গমের উপায় শিখেছিল। আর তাই শিওল গ্রামের হাজার খানেক লড়িয়ের প্রহার সহ্য করতে না পেরে শেষে তাদের রচিত চক্রব্যূহ ভেদ করে পঞ্চাশজন বীরপুঙ্গব পালিয়ে যেয়ে প্রাণ বাঁচাল। কিন্তু অবশিষ্ট পাঁচজন লড়িয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পথ পরিহার করে লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দেওয়া শ্রেয়জ্ঞান করল। কারণ তারা মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চক। তারা লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দেবে, কিন্তু পালিয়ে যেয়ে মান দেবে না। আর তাই তারা পাঁচজন

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শিওল গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার নির্মম প্রহার মুখ বুজে সহ্য করতে লাগল। এবং শেষে তারা অচৈতন্য হয়ে ভূপতিত হল।

মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুষ্টপঞ্চক ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিওল গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার দল অস্ত্র উঁচিয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল। তারা তাদের শত্রুদের ওপর শেষ আঘাত হানতে গেল। কিন্তু অশ্বারূঢ়া রানীমা তা হতে দিলেন না। অচৈতন্য দুষ্টপঞ্চককে লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করতে দিলেন না। তিনি শিওল গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, তোমরা আমার কথা শোন। ওদেরকে তোমরা প্রাণে মেরো না। কারণ ওরা আমাদের কাউকে প্রাণে মারেনি। তোমরা ওদের অচৈতন্য দেহগুলোকে তুলে এনে ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে বাঁধ। তারপর চাবুক মেরে ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে দাও। ছুটতে ছুটতে ঘোড়াগুলোই একসময় ওদের অচৈতন্য দেহগুলোকে ওদের প্রভুর কাছে পৌঁছে দেবে।

শিওল গ্রামের লড়িয়েরা রানীমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। তারা দুষ্টপঞ্চকের অচৈতন্য দেহগুলোকে তুলে এনে তাদের ঘোড়ার পিঠে শক্ত করে বাঁধল। তারপর তারা চাবুক মেরে ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে দিল।

ছদ্মবেশী রানীমা নিশির দিকে তাকিয়ে বললেন, চল, ঘরে ফিরি। আমাদের এবারের অভিযানও সফল হয়েছে।

রানীমা শিওল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। তারপর নিশিকে পাশে নিয়ে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রাত্রির অবসানে পুবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছিল।

* * *

নামী বৈদ্যের সুচিকিৎসায় আহত দুষ্টপঞ্চক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিল। আর ইতিমধ্যেই রানীমা একদিন দুষ্টপঞ্চক প্রধান দিলদারকে গোপনে ডেকে পাঠালেন। এবং দিলদার রানীমার সম্মুখে হাজির হতেই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি করে বলতো দিলদার, শিওল গ্রামের সুন্দরী যুবতী সুবর্ণলতাকে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? আমি তার হদিস চাই।

দিলদার উত্তর দিল, কে সুবর্ণলতা? আমরা তাকে চিনি না, রানীমা।

তোমরা তাকে চেন। আঁধার রাতে সুবর্ণলতা বড়কুমারের কাছে আসে। তারসঙ্গে নাচগান করে। তার কাছে রাত কাটায়।

হ্যাঁ, একজন সুন্দরী যুবতী আঁধার রাতে বড়কুমারের কাছে আসে। তারসঙ্গে নাচগান করে। তার কাছে রাতও কাটায়; সে সব দেখেছি। কিন্তু ওই যুবতী সুবর্ণলতা কিনা জানি না।

হ্যাঁ, ওই সুন্দরী যুবতীই সুবর্ণলতা। বালবিধবা সুবর্ণলতা। গতবছর আশ্বিনমাসে কুমার তাকে গাঙের ঘাট থেকে অপহরণ করেছিল। তুমি তার হদিস দাও। আর তার বিনিময়ে তুমি দু'হাত ভরে ইনাম নিয়ে যাও।

গত চোদ্দ বছরে আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক ইনাম নিয়েছি। আপনি আমাদের পাঁচ বন্ধুর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আমার মনের মতো কাজ করেছ, ইনাম পেয়েছ। আমার আদেশে বড়কুমারকে তোমরা বিপথে পরিচালিত করেছ, ইনাম পেয়েছ। তাকে তোমরা জাহান্নমে যাওয়ার রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছ, ইনাম পেয়েছ।

অন্যায় করেছি, রানীমা। অন্যায় করেছি। আমরা পাঁচবন্ধু ঘোরতর অন্যায় করেছি।

একটু থেমে দিলদার বলল, জঠর জ্বালায় কাতর হয়ে আমি, সংগ্রাম সিংহ এবং আমাদের আরো তিনবন্ধু আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আপনার কাছে আমরা কাজ চেয়েছিলাম। ক্ষুধার অন্ন চেয়েছিলাম। আপনি আমাদের পাঁচবন্ধুকে কাজ দিয়েছিলেন। ক্ষুধার অন্ন দিয়েছিলেন। আর তারপর থেকে আপনার আদেশে আমরা অনেক অন্যায় কাজ করেছি। অর্থের লোভে, প্রতিপত্তির লোভে আমরা অনেক অন্যায় কাজ করেছি। একজন সুকুমারমতি রাজপুত্রকে আমরা বিপথগামী করেছি। সেইসব ঘোরতর অন্যায়ের কথা ভেবে এখন আমাদের আফসোস হয়, অনুতাপ হয়, অনুশোচনা হয়। আমরা দুঃখ পাই, মনঃকষ্টে ভুগি। ওপরওয়ালার কাছে আমরা প্রার্থনা করি। তাঁর দোয়া মাঙি।

দিলদারের কথা শুনে রানীমা বললেন, অর্থের লোভে যখন তোমরা অনেক অন্যায় কাজ করেছ, ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছ, তখন না হয় আর একটা অন্যায় কাজ করলে। অনেক দুঃখ পেয়েছ, না হয় আরো একটু দুঃখ পেলে। আরো একটু মনঃকষ্টে ভুগলে।

একটু থেমে রানীমা আবার বললেন, একবার ভেবে দেখ, দিলদার। বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। শুধুমাত্র সুবর্ণলতার সন্ধান দিলেই আমি তোমাকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেব তা হবে তোমার কল্পনারও অতীত। তাছাড়া আমার কনিষ্ঠপুত্র তেজশঙ্কর অদূর ভবিষ্যতে যখন চন্দনপুর এস্টেটের জমিদার হয়ে বসবে, তোমাকে আমরা একটা সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করব। ব্যাপারটা একবার ভাল করে ভেবে দেখ!

কিন্তু সুবর্ণলতার সন্ধান আমার জানা নাই, রানীমা। আপনি আমাকে আজ্ঞা দিন।

দিলদারের জবাব শুনে রানীমা গম্ভীর ভাবে বললেন, ঠিক আছে। তুমি যেতে পার। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা জেনে যাও, সুবর্ণলতাকে তোমরা যেখানেই লুকিয়ে রাখ না কেন, আমি তাকে খুঁজে বের করবই। আর তোমাদের পাঁচ বন্ধুকেও আমি সমুচিত শাস্তি দেব।

* * *

যাহোক, প্রখ্যাত বৈদ্যের সুচিকিৎসায় আহত মিত্রপঞ্চক প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আর এর মধ্যেই এসে গেল পরবর্তী অমাবস্যা তিথি। সুতরাং সন্ধ্যা হতেই বড়কুমার

তাই মহার্ঘ বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে মৃগয়ারণ্যে রওনা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

কুমারের সর্বক্ষণের সঙ্গী মিত্রপঞ্চক চিকিৎসাধীন থাকায় সে একাই এবারে মৃগয়ারণ্যে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যার আঁধার একটু ঘনীভূত হওয়ার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। আর ঠিক সেই সময় তার পাঁচ মিত্র তার মহলে এসে উপস্থিত হল। তারা সকলেই কুমারের সঙ্গী হওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে এসেছিল। কারণ তারা ততদিনে বুঝে গিয়েছিল যে রানীমার প্রচার চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়ে শিওল গ্রামের প্রজারা মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। তাদের গ্রামের সুন্দরী সুবর্ণলতাকে কুমার এবং তার সঙ্গীসাথীরা অপহরণ করেছে বলে তারা বিশ্বাস করেছে। এবং ভবিষ্যতেও তাদের গ্রামের সুন্দরীরা একইভাবে অপহৃতা হবে বলে তারা ভীত হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই তারা বড়কুমার ও তার সকল সঙ্গীসাথীদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। আর এ সবই সংঘটিত হচ্ছে স্বয়ং রানীমাব চক্রান্তে।

রানীমার চক্রান্তের ব্যাপারটা সেদিন তারা লড়াইয়ের ময়দানেই বুঝতে পেরেছিল। কারণ লড়াইয়ের ময়দানে সেদিন তারা ছদ্মবেশী রানীমাকে চিনতে না পারলেও তাঁর প্রিয়বাহন ঠান্ডারকে চিনেছিল। ছদ্মবেশী নিশির কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব বেতালকেও তারা চিনেছিল।

ধূর্ত রানীমা একদিন তাঁর নিজের প্রয়োজনে পাঁচজন সরল, সাদাসিধে গ্রাম্য যুবককে দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চকে পরিণত করেছিলেন। আর এখনও তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনেই তাঁর হাতে গড়া সেই দুর্ধর্ষ দুষ্টপঞ্চককে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। কারণ এখন তারা সকলেই বড়কুমারের মিত্র এবং তার আজ্ঞাবহ, রানীমার নয়। অর্থ এবং প্রতিপত্তির লোভ দেখিয়েও এখন তিনি তাদের দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করাতে সক্ষম নন।

একথা সত্য যে রাজা সৌভদ্রশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেউ জনসমক্ষে হত্যা করার সাহস পাবে না। কিন্তু রানীমার প্ররোচনায় যদি কেউ তাকে গুপ্তহত্যা করে! আর ছোটকুমারকে ভবিষ্যৎ জমিদার হিসাবে দেখার জন্য এ কাজ তিনি করতেই পারেন!

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে বড়কুমারকে তারা কিছুতেই একা ছেড়ে দেবে না। তারা পাঁচবন্ধু তার সঙ্গে যাবে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও তারা কুমারের প্রাণ রক্ষা করবে। তারা তাদের অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

যাহোক, পঞ্চমিত্র তার রাতের অভিসারের সঙ্গী হতে অনড় দেখে বড়কুমার গবাক্ষপথে অদূরের সিংহদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করল। এবং সে দেখতে পেল, নিশি এবং কয়েকজন রাতের প্রহরী সেখানে বসে খোশগল্পে মেতে রয়েছে। কিন্তু তাদের দেখে কুমারের মনে হল যে তারা আসলে তার মহলের প্রতি নজর রাখার জন্যই ওখানে বসে জটলা করছে।

কমার জানে যে ছোটরানীর নিয়োজিত কিছু লোক প্রতিনিয়ত তার এবং তার

মহলের প্রতি নজর রেখে চলেছে। এবং পালা করে তারা তাদের সংগৃহীত তথ্য ছোটরানীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আর দূরে বসে, সবার অলক্ষ্যে বসে তিনি তাঁর নিয়োজিত লোকদ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।

কুমার এও জানে যে তার পিতার সরলতার সুযোগ নিয়ে, শালীনতার সুযোগ নিয়ে, সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার বিমাতা এরাজ্যে সমান্তরাল শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কুমারের মনে হয়, তার পিতা একজন ভালমানুষ। খুব ভালমানুষ। কিন্তু একজন জমিদারের বোধহয় অত ভালমানুষ হওয়া ভাল নয়।

যাহোক, সিংহদুয়ারের ওই জটলার দিকে তাকিয়ে কুমার বুঝতে পারল যে এখন যদি সে তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সিংহদুয়ার অতিক্রম করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে সংবাদ ছোটরানীর কাছে পৌঁছে যাবে। আর ছোটরানীর আদেশে নিশি ও কিছু গুপ্তচর তাদের পিছু নেবে। তারা দূরে থেকে তাদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখবে। নজর রেখে তারা এগিয়ে যাবে। এবং পালা করে তারা তাদের সংগৃহীত তথ্য তাদের মালকিনের কাছে পৌঁছে দেবে। আর সবার অলক্ষ্যে বসে তাদের মালকিন অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা নেবেন।

এসব কথা চিন্তা করে কুমারের মনে হল যে জমিদার দুহিতা, তথা জমিদার ঘরনী রানী জগদম্বা দেবী সারা রাজ্য জুড়ে যে চক্রান্তের জাল বিছিয়েছেন তা নিশ্ছিদ্র করার কোন কসুর করেন নি তিনি। আর এই ছিদ্রহীন চক্রান্তের জাল ভেদ করে মহলের বাইরে বের হতে হলে তাকে সম্মুখের সিংহদুয়ার পরিহার করতে হবে। এছাড়া উপায় নেই।

অতএব পঞ্চমিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে কুমার তাদের সিংহদুয়ার পথে মহলের বাইরে চলে যেতে বলল। একটু আগে যে পথে তারা তার মহলে প্রবেশ করেছিল।

এবং পঞ্চমিত্র বিদায় নিতেই কুমার তার মহার্ঘ বসন-ভূষণ খুলে ফেলল। তারপর সেগুলোকে সে একফালি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে নিল। একটা বোঁচকা তৈরী করে নিল। আর শেষে মাথায় একখানা পুরনো গামছা বেঁধে, পরিচারকের পোশাক পরে, বোঁচকাটি বগলে নিয়ে পশ্চাতের অন্ধকার গলিপথ ধরে এগিয়ে গেল। যে অন্ধকার গলিপথে শুধু রাজবাড়ির পরিচারক-পরিচারিকারাই যাতায়াত করে। কোন রাজপুত্রের যাতায়াতের নিয়ম নাই। কুমার সেই অন্ধকার গলিপথ ধরেই এগিয়ে চলল। কেননা অভিসারে যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট পথ থাকে না। নির্দিষ্ট সময় থাকে না। এবং কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। রনে আর প্রেমে অনিয়ম বলে কিছু নেই।

বড়কুমার পরিচারক-পরিচারিকাদের জন্য নির্দিষ্ট অন্ধকার গলিপথ ধরে এগিয়ে গেল। কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই সে বাধা পেল। সে বাধা পেল একজন বৃদ্ধ পরিচারকের কাছ থেকে। সে গলিপথের উল্টোদিক থেকে আসছিল। এবং তার মুখোমুখি হতেই সে কুমারকে জিজ্ঞাসা করল, কেরে, মদন নাকি? আজ বুঝি তোর

দেরীতে ছুটি হল? তারপর সে কুমারের বগলে ধরা বোঁচকাটা টিপে দেখে বলল, রেতের খাবারটা ভালই পেছিস দেখি! তা বেশ। তাড়াতাড়ি ঘর যা। তোর বুড়ো বাপটা পেটে খিদে নিয়ে বসে আছে। তারপর কুমারকে পাশ কাটিয়ে সে রাজবাড়ির দিকে চলে গেল।

কুমার পেছন ফিরে একবার ওই বৃদ্ধের দিকে চাইল। তারপর হনহন করে সে সড়কের দিকে এগিয়ে গেল।

রাজবাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে, সড়কের পাশের এক ঘন জঙ্গলের আড়ালে একজন সহিস কুমারের শ্বেত অশ্বটির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর কুমারের পঞ্চমিত্র সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে, নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে কুমারের জন্য অপেক্ষা করছিল। কুমার সেথায় পৌঁছে চটজলদি তার ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে বোঁচকায় বাঁধা বসন-ভূষণ পরিধান করে নিল। তারপর পঞ্চমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সে মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল।

* * *

পঞ্চমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে বড়কুমার যখন মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছিল, নিশি ও ক'জন রাতের প্রহরী তখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে বসে খোশগল্পে মেতেছিল। মাঝে মাঝে তারা আড়চোখে কুমারের মহলের দিকে তাকাচ্ছিল। এবং মহলের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলছে দেখে তারা নিশ্চিন্ত হচ্ছিল। কুমার মহলে আছে ভেবে তারা খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছিল।

আসলে শিওল গ্রামের সেই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কুমার এখন আর তেমন বাইরে বের হয় না। বাইরে বের হলেও সে আগের মতো অধিক রাত অবধি বাইরে কাটায় না। তাড়াতাড়ি মহলে ফিরে আসে। মহলে ফিরে এসে সে পানাহার করে। কখনো বা সে আপন মনে বেহালা বাজায়। কলের গান শোনে। আর কুমারের এহেন সহজ, সরল এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে দেখে নিশি খুশী হয়। গুপ্তচরেরা নিশ্চিন্ত হয়। আর পশ্চিমে প্রহরীরা টুলে বসে খৈনি টেপে, স্বস্তির হাই তোলে।

রাত বেড়ে চলেছিল। নিশির ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল। তাই ঘুম কাটানোর জন্য সে একবার চুপিসারে কুমারের মহলে উঁকি মারতে গেল। কুমার এবং তার মহলের তত্ত্বতালাস নিতে গেল। সে চুপিসারে কুমারের মহলে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানে সে কাউকে দেখতে পেল না। সেখানে কুমার নেই। কুমারের পরিচারক-পরিচারিকারাও নেই। সারা মহলটা সুনসান। সে আশ্চর্য হল!

খানিকক্ষণ আগে কুমারের ঘরে যে বড় রেকর্ডের কলের গান বাজছিল, কখন যেন সেটা থেমে গিয়েছিল। তারা কেউ সেটা খেয়াল করেনি।

নিশি আরো একটু এগিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বারান্দার কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল, এ্যাই, কে তুমি? বেরিয়ে যাও বলছি; নইলে পুলিশে দেব!

নিশি চমকে উঠে বারান্দার কোণে তাকাল। এবং সে দেখতে পেল, কুমারের পোষা ময়নাটি সেথায় দাঁড়ে বসে আছে। নিশির দিকে তাকিয়ে ময়নাটি আবারও সেই একই বুলি আওড়াল। কিন্তু নিশি গ্রাহ্য করল না। সে এগিয়ে গেল।

নিশি তার কথা গ্রাহ্য করছে না দেখে, তাকে অবজ্ঞা করছে দেখে ময়নাটি ক্ষুব্ধ হল। এবং সে চোর চোর বলে চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে কুমারের মহলের দুজন প্রহরী সে দিকে ছুটে এল। আর বিপদ বুঝে নিশি সেখান থেকে ছুটে পালাল। ময়নাটি এবার খুশী হল। সে ঘাড় কাত করে পলায়নরত নিশির দিকে চেয়ে রইল।

উদ্বিগ্ন নিশি ছুটতে ছুটতে রানীমার মহলে যেয়ে হাজির হল। এবং কুমারের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা সে রানীমাকে খুলে বলল। নিশির মুখ থেকে কুমারের অন্তর্ধানের কথা শুনে রানীমা কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন না। বরং তিনি খুশী হলেন। কারণ এই খবরটা শোনার জন্য তিনি এই ক'দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু রানীমা তাঁর মনের কথা নিশির কাছে প্রকাশ করলেন না। বরং তিনি উল্টোটাই করলেন। উল্টোটাই বললেন। কপট ক্রোধে তিনি নিশিকে বললেন, এতগুলো লোকের চোখের সামনে দিয়ে কুমার বেরিয়ে গেল, আর তোরা কেউ তাকে দেখতে পেলি না! আজ কী তোরা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিলি? আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অপ্সরী-কিন্নরীর স্বপ্ন দেখছিলি?

নিশি সবিনয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞা, কুমার আমাদের সামনে দিয়ে বের হননি, রানীমা। তিনি সিংহদুয়ার দিয়ে বের হননি। মনে হয় তিনি অন্যপথে বেরিয়ে গেছেন।

অন্যপথে! কোন পথে? রাজবাড়ির কোনপথই প্রহরীবিহীন নয়। আর রানীমহল ভিন্ন রাজবাড়ি হতে বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোন গুপ্তপথও নেই। আর রানীমহলের গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কৌশল বড়কুমারের জানা নেই।

তারপর তিনি বললেন, রাজশঙ্কর রাজপুত্র। আর তাই সে রাজপুত্রের মতোই সিংহদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তোদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে রাজবাড়ির বাইরে চলে গেছে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, যাহোক, সুবর্ণলতাকে উদ্ধার করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। যতশীঘ্র সম্ভব রাজামশাইয়ের পরিচালনায় মৃগয়ারণ্যে অভিযান চালাতে হবে।

* * *

অতঃপর সেই রাত দুপুরে গোটা রাজবাড়িটা হঠাৎ জেগে উঠল। পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ, লাঠিয়াল এবং মশালচীদের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। তারা শুধু এইটুকু জানতে পারল যে অতিদ্রুত

তাদের কোন এক অভিযানে বেরোতে হবে। রাজা সৌভদ্র শঙ্করের পরিচালনায় তাদের কোন এক বিশেষ অভিযানে বেরোতে হবে। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয়। এবং সময় অত্যন্ত কম।

সেই রাত দুপুরে রাজবাড়িতে উপস্থিত লোক-লস্করের সংখ্যা সুবর্ণলতা উদ্ধারের পক্ষে অপ্রতুল নয়। কিন্তু মুশকিল হল, সেই দুপুর রাতে তাদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না যে নাকি সুবর্ণলতাকে স্বচক্ষে দেখেছে। অথবা সুবর্ণলতার সঙ্গে যার পরিচয় আছে। তাকে দেখে যে চিনতে পারবে।

এদিকে নিশি যাকে রাতের অন্ধকারে বড়কুমারের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে, নাচ গান করতে দেখেছে, সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি সুবর্ণলতা কিনা তা সে জানে না। এমনকি ওই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি আদৌ মানুষ কিনা তাও সে জানে না। বরং মেয়েটিকে দেখে তার অপ্সরী বলে মনে হয়েছে। মুশকিলের কথা!

অথচ স্বয়ং রানীমা বলছেন ওই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিই সুবর্ণলতা। গতবছর আশ্বিনমাসে বড়কুমার যাকে গাঙের ঘাট থেকে অপহরণ করেছিল, সেই সুবর্ণলতা। অপ্সরী-কিন্নরীর ব্যাপারটা হল আসলে নিশির উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত একটা গল্প মাত্র। একটি অতি সাধারণ ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনা বলে প্রচার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ দোর্দন্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের শাসনে অপ্সরী-কিন্নরীরা সব কবেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আর তাই ওই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি সুবর্ণলতা না হয়ে যায় না, এটাই রানীমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপয়ান্তর না দেখে রাজামশাইয়ের হুকুমে শেষে নিশি ছুটল শিওল গ্রামে। ফটিক চাঁদ ও তাব সঙ্গীসাথীদের রাজবাড়িতে নিয়ে আসতে। যারা সুবর্ণলতার গাঁয়ের লোক। যারা সুবর্ণলতার আপনজন। সেই ছোটবেলা থেকে যারা সুবর্ণলতাকে চেনে।

* * *

অতঃপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাত্র ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সকলে তৈরী হয়ে নিল। তারপর সেই গভীর রাতে জমিদার সৌভদ্রশঙ্করের পরিচালনায় প্রায় একশো জন সশস্ত্র পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ, লাঠিয়াল এবং ফটিক চাঁদের দলবল মৃগয়ারণ্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল, সঙ্গে চলল জনা পঁচিশেক মশালচী। এবং যাত্রারম্ভের পূর্বমুহূর্তে তারা সকলে জানতে পারল যে তাদের গন্তব্যস্থল মৃগয়ারণ্য। আর উদ্দেশ্য সুবর্ণলতা উদ্ধার।

* * *

অশ্বক্ষুর ধ্বনি, হ্রেষারব এবং রাজা সৌভদ্রশঙ্করের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে কুমার রাজশঙ্কর ও সুলতা চমকে উঠল। চমকে উঠে ওরা দুজন তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। এবং ওরা দেখতে পেল যে স্বয়ং রাজামশাই এবং তাঁর পাইক-পেয়াদার দল মুহূর্তমধ্যে ওদের দু'জনকে ঘিরে ফেলেছেন। গভীর অন্তরঙ্গ আলাপনে মগ্ন থাকায় ব্যাপারটা

ওরা আগে থেকে বুঝতেই পারেনি। আর তাই হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে দেখে ওরা দুজন আশ্চর্যান্বিত হল। বিস্ময়াবিষ্ট হল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এবং ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই অশ্বপৃষ্ঠে আসীন রাজামশাই তাঁর বাগদী সর্দারকে হুকুম দিলেন, ঈশান, তুই কুমার রাজশঙ্কর এবং সুবর্ণলতাকে বন্দি কর। বন্দি করে ওদের দুজনকে তুই বন্দিশালায় নিয়ে চল। আমি ওদের বিচার করব।

রাজামশাইয়ের মুখে সুবর্ণলতার নাম শুনে কুমার ফুঁসে উঠল। মনে মনে ভাবল, আবার সেই সুবর্ণলতা! এবং সে চিৎকার করে বলল, কে সুবর্ণলতা? আপনি কাকে সুবর্ণলতা বলছেন? আপনি যাকে সুবর্ণলতা বলছেন সে আসলে সুলতা। আর সুলতা আপনার কোন প্রজার ঘরের কন্যা নয়। সে মুক্তবিহঙ্গী। আর মুক্ত বিহঙ্গীকে বন্দি করার ক্ষমতা আপনার ওই বাগদী সর্দারের বাহুতে নেই।

কী, এত বড় স্পর্ধা! ঈশান, তুই এখনই ওদের দুজনকে বন্দি কর।

রাজাজ্ঞা পালন করতে, লৌহশৃঙ্খল হাতে নিয়ে ঈশান এগিয়ে গেল। ওদের দুজনকে সে বন্দি করতে গেল। কিন্তু পারল না। সে ওদের কাছে পৌঁছতে পারল না। ওদের কাছে পৌঁছনোর আগেই সবকিছু ওলোট-পালট হয়ে গেল। বায়ুকোণ হতে ধেয়ে আসা প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড় মুহূর্তমধ্যে সবকিছু ওলটপালট করে দিল। সবকিছু তছনছ করে দিল। রাশি রাশি ধুলোবালি, ঝরাপাতা আর খড়কুটো সঙ্গে নিয়ে সে মৃগয়ারণ্য ও তার আশপাশের বিশাল প্রান্তরে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল। সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ে সে তান্ডবনৃত্য শুরু করে দিল।

ঈশান আর এগোতে পারল না। সে ওদের দু'জনের কাছে পৌঁছতে পারল না। ওদের দুজনের কাছে পৌঁছনোর আগেই সে চোখে অন্ধকার দেখল। প্রয়লঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে ধেয়ে আসা ধুলোবালি, ঝরাপাতা আর খড়কুটো মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিক অন্ধকার করে দিল। সুবর্ণলতা উদ্ধারে আসা উপস্থিত সকলেই চোখে অন্ধকার দেখল।

শেষে প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখীর দাপট উপেক্ষা করে ঈশান কিছুটা এগিয়ে গেল। লৌহশৃঙ্খল হাতে নিয়ে সে অনেক কষ্টে খানিকটা এগিয়ে গেল। ওদের দুজনকে সে বন্দি করতে গেল। রাজাজ্ঞা পালন করতে গেল। কিন্তু দুজন কোথায়? এ তো একজন! অন্যজন কোথায়? সুবর্ণলতা কোথায়? এতগুলো লোকের বেষ্টনী ভেদ করে সে গেল কোথায়? শত সিপাহীর বেষ্টনী ভেদ করে সে কোথায় গেল?

ঈশান অবাক হল। আশ্চর্য হল। বিস্মিত হল। ধুলোর দাপটে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখে সে চারপাশে চেয়ে দেখল। চারপাশে খুঁজে দেখল। কিন্তু সুবর্ণলতাকে সে কোথাও দেখতে পেল না। সুবর্ণলতাকে সে কোথাও খুঁজে পেল না। শত সিপাহীর চোখে ধুলো দিয়ে সে যেন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। অথবা কুমারের মুক্ত বিহঙ্গী সকলের চোখ এড়িয়ে নীলাকাশে ডানা মেলেছে। নীল নীলিমায় মিশে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ঝড়ের দাপট উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। বায়ুকোণ হতে ধেয়ে আসা কালবৈশাখী

এমন পৈশাচিক শব্দে ছুটে চলল যে রাজাবাবুর স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোক-লস্করা ভয় পেয়ে গেল। নিশির প্রেতাত্মার গল্পটা তাদের কাছে সত্যি বলে মনে হল। এক প্রেতাত্মার বিপদ দেখে শত প্রেতাত্মার ছুটে আসার ব্যাপারটা তারা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল। স্পষ্ট দেখতে পেল। আর তাই তারা ভীত হল। সন্ত্রস্ত হল। শত প্রেতাত্মার রুদ্ররোষ তাদের ওপর ঝরে পড়েছে ভেবে তারা ছুটোছুটি করতে লাগল। দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। প্রাণভয়ে তারা আর্তনাদ করতে লাগল।

আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হল। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। ঝড়ের দাপট সহ্য করেও যে কটা জ্বলন্ত মশাল এতক্ষণ আলো দিচ্ছিল, সেগুলোও নিভে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে অমনিশার গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেল। ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো এবার চিঁহি চিঁহি রব তুলল। তারা লাফালাফি করতে লাগল। দাপাদাপি করতে লাগল। ঝটকা মেরে তারা তাদের পিঠের সওয়ারীদের নীচে ফেলে দিতে লাগল। সওয়ারীদের নীচে ফেলে দিয়ে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। তাদের পায়ের তলায় পড়ে কিছু লোক হতাহত হল। কিছু লোক হতাহত হল ঝড়ে ভেঙে পড়া ডালপালা চাপা পড়ে। কিছু লোক হতাহত হল ঝড়ে উৎপাটিত গাছ চাপা পড়ে। এবং মাত্র আধঘন্টার কালবৈশাখী তান্ডবে রাজা সৌভদ্রশঙ্করের মৃগয়ারণ্য আক্ষরিক অর্থেই নরকের রূপ নিল।

* * *

ঝড়বৃষ্টি ততক্ষণে পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল। রাজা সৌভদ্রশঙ্করের বহুদূর বিস্তৃত মৃগয়ারণ্য ততক্ষণে যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তরের রূপ নিয়েছিল। চর্তুদিকে নীরবতা বিরাজ করছিল। সুনসান হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু গুরুতর আহত ব্যক্তিদের কাতরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। তাদের বেদনার্ত স্বর ভেসে আসছিল। বৃষ্টিসিক্ত ভূমিতলে পড়ে তারা অসহায়ের মতো ছটফট করছিল। বেদনায় কাতরধ্বনি করছিল। সুবর্ণলতা উদ্ধারে আসা বহু লোকলস্কর ও শিওল গ্রামের অধিবাসীরা ভেঙে পড়া ডাল চাপা পড়ে, উৎপাটিত গাছ চাপা পড়ে এবং অশ্বক্ষুরের কঠিন আঘাত পেয়ে প্রাণ হারিয়েছিল।

অপেক্ষাকৃত স্বল্প আঘাতপ্রাপ্ত বড়কুমার রাজশঙ্কর এবং কয়েকজন লস্কর তখন জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে আহতদের খুঁজে ফিরছিল। খুঁজে পেতে তারা তাদের নিকটবর্তী প্রমোদভবনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রমোদভবনে বয়ে নিয়ে যেয়ে তারা তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিল। সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করছিল। এইভাবে বড়কুমার এবং কয়েকজন লস্কর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যেয়ে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।

এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একসময় তারা রাজা সৌভদ্র শঙ্করকে আহত অবস্থায়

দেখতে পেল। ঝড়ের দাপটে একটা গাছের ডাল তাঁর ওপর ভেঙে পড়ায় তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর কোমরে আঘাত লেগেছিল। গাছের ডালের নীচে চাপা পড়ে তিনি যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করছিলেন। কুমার রাজশঙ্কর তাঁকে উদ্ধার করে প্রমোদভবনে নিয়ে গেল। প্রমোদভবনে নিয়ে যেয়ে সে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করল।

এইভাবে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুবর্ণলতা-উদ্ধার অভিযানে আসা সকল আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রমোদভবনে নিয়ে আসা হয়েছিল। উদ্ধার করে নিয়ে এসে তাদের প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষা করা হয়েছিল। এইভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কালরাত্রি অবসান হয়ে আসছিল। এমন সময় একজন মশালধারী লস্কর ছুটে এসে কুমারকে সংবাদ দিল যে একজন পুরুষবেশী রূপবতী মহিলা জলকাদার মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁকে দেখে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলবধূ বলে মনে হচ্ছে। তবে তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। অজ্ঞান অবস্থায় তিনি জলকাদার মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখুনি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে সেবা-শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। অন্যথায় তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

ওই মশালধারী লস্করের কথা শুনে কুমার অবাক হল। রাজা সৌভদ্রশঙ্করের মৃগয়ারণ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলবধূ! তাও আবার এই ভয়ঙ্কর রাত্রে? অজ্ঞান অবস্থায়! আশঙ্কাজনক অবস্থায়! ব্যাপার কী?

কিন্তু অধিক চিন্তার সময় ছিল না। তাই সেই মশালধারী লস্করকে সঙ্গে নিয়ে কুমার তৎক্ষণাৎ উক্ত কুলশীলার কাছে ছুটে গেল। এবং সে দেখতে পেল যে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় জলকাদার মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার উষ্ণীষ খসে পড়েছে। এবং তাঁর এক ঢাল কালো চুল জলকাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁর দুগ্ধফেননিভ গাত্রবর্ণ, লাবণ্যময়ীরূপ এবং রক্তবর্ণ সীমন্তরাগ সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলবধূর পরিচয় বহন করছে। তবে উক্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলবধূ তার অপরিচিতা নন। তিনি রাজনন্দিনী, রাজবধূ এবং তার বিমাতা।

যদিও কুমার কোনদিন ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেনি, তবে সে শুনেছে যে তার বিমাতা প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি নানা অভিযানে বের হন। আর তিনি যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে কোন অভিযানে বের হন, ছদ্মবেশী নিশি তখন তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে সঙ্গে থাকে। নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিশি রানীমাকে বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এবারে তাকে রানীমার পাশে পাওয়া গেল না। জীবিত অথবা মৃত, কোন অবস্থাতেই তাকে এবার রানীমার পাশে খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখীর রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পাওয়া লস্করদের মুখ থেকে কুমার যা শুনেছে তাতে তার মনে হল যে সুবর্ণলতা উদ্ধার-অভিযানে আসা অনেকের মতো

নিশিও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিশাল বাঁওড়ের অশান্ত হয়ে ওঠা জলে ছিটকে পড়েছে। এবং সে বাঁওড়ের জলেই ডুবে মরেছে।

ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর দাপটে অনেকেরই প্রাণ গেছে। কারো প্রাণ গেছে ভেঙে পড়া ডালপালা চাপা পড়ে। কারো প্রাণ গেছে উৎপাটিত গাছ চাপা পড়ে। আবার কারো প্রাণ গেছে অশান্ত হয়ে ওঠা বাঁওড়ের জলে ছিটকে পড়ে। শুধু রাজাবাবুর লোকলস্কর নয়, ফটিকচাঁদ সহ অনেক শিওল গ্রামবাসীরও প্রাণ গেছে এই প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়ে। আর শুধু মানুষের নয়, প্রাণ গেছে অনেকগুলি অশ্বেরও।

যাহোক, সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। তাই কুমার তার সংজ্ঞাহীন বিমাতাকে অতি যত্নসহকারে অদূরের মালীদের কুটিরে নিয়ে গেল। কুটিরটি অত্যন্ত ছোট এবং বিরাট প্রমোদভবনের আড়ালে অবস্থিত হওয়ায় ঝড়-জলের পরেও সেটি অক্ষত ছিল। তাই কুমার তার বিমাতাকে সেখানে নিয়ে গেল। কারণ কুমার জানত যে তার বিমাতার জ্ঞান থাকলে তিনি কখনই প্রমোদভবনে প্রবেশ করতেন না। তাঁর সংস্কারে বাধত। কারণ প্রমোদভবনকে তিনি চিরদিন বাঈজীকুঠি বলে জেনে এসেছেন। আর কোন রাজবধূর পক্ষে বাঈজী কুঠিতে প্রবেশ করা অসম্মানজনক বলে ভেবেছেন।

কুমার এও জানত যে তার বৈমাত্রেয় ভাই তেজশঙ্করকে চন্দনপুরের জমিদারীর আসনে আসীন করার জন্য তার বিমাতা তার প্রতি যতই অন্যায় করে থাকুন না কেন, তিনি যে একজন সতীলক্ষ্মী রাজবধূ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কালরাত্রি অবসান হয়ে আসছিল। আর খানিকক্ষণ যত্ন সহকারে সেবা-শুশ্রূষা করার পর তার বিমাতার জ্ঞান ফিরে এল। এবং জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন। সম্ভবত ঠান্ডারের পিঠ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যাওয়ায় তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। তাই জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন।

একটু পরে তিনি চোখ মেলে চাইলেন। আর চোখ মেলে চাইতেই তিনি বড়কুমারকে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখলেন। এবং অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মায়ের মতো তিনি কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ তুই আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছিস, বাবা?

কুমারও অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলের মতো উত্তর দিল, প্রলয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়ের দাপটে তুমি জ্ঞান হারিয়ে জলকাদার মধ্যে পড়েছিলে, মা। তোমাকে আমি মালীদের পর্ণকুটিরে নিয়ে এসেছি। ভোর হতেই তোমাকে আমি মহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

কিন্তু মহলে ফিরে যাওয়ার মতো আমার শারীরিক অবস্থা নাই। আর সে সময়ও নাই। দুরন্ত অশ্বের পিঠ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যাওয়ায় আমার শরীরের হাড়গোড় ভেঙে গেছে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, বাবা।

তারপর রানীমা কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজাবাবু কোথায়? তিনি ভাল আছেন তো?

কুমার উত্তর দিল, বাবা প্রমোদভবনে আছেন। প্রচন্ড ঝড়-জলের সময় উনি একটা ভেঙেপড়া ডালের নীচে চাপা পড়েছিলেন। উনি কোমরে আঘাত পেয়েছেন।

ওঁকে আমার কাছে নিয়ে আয়, বাবা। বিদায় নেওয়ার আগে ওঁকে আমি শেষবারের মতো প্রণাম করে যাব।

বিমাতার কথা শুনে এবং তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে কুমার বুঝতে পারল যে তিনি আর বেশীক্ষণ বাঁচবেন না। তাই কয়েকজন লস্করকে ডেকে সে তার বাবাকে মরণাপন্ন বিমাতার কাছে নিয়ে আসতে বলল।

লস্কররা আহত রাজাবাবুকে আনতে প্রমোদভবনে চলে গেল।

লস্কররা চলে যেতেই রানীমা কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই তো মা বলে ডাকলি বাবা, তবে আগে ডাকলি না কেন? এই হতভাগিনী মায়ের কাছে সময়মতো ছুটে এলি না কেন?

কুমার তার মায়ের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইল। তখন তার মা ক্ষীণস্বরে বললেন, তোর কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি, বাবা। পারিস তো এই হতভাগিনী মাকে তুই ক্ষমা করে দিস।

রানীমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। একটু পরে তিনি কুমারকে বললেন চন্দনপুর এস্টেটের ভাবী জমিদার তুই-ই। তুই-ই তার ন্যায্য দাবীদার। তবে তোর বৈমাত্রেয় ভাই তেজশঙ্করকেও তুই সহোদর ভাইয়ের মতো প্রতিপালন করিস। তাকে তুই রক্ষা করিস। রক্ষা করিস তুই প্রজাদেরও।

কুমার বলল, ওসব নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না, মা। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি তেজশঙ্করকে আমি আমার সহোদর ভাইয়ের মতোই প্রতিপালন করব, রক্ষা করব। রক্ষা করব আমি প্রজাদেরও।

কখন যেন মিত্রপঞ্চক প্রধান আহত দিলদার কুমারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কুমার তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু রানীমা তাকে দেখেছিলেন। তিনি দিলদারকে উদ্দেশ্য করে ক্ষীণস্বরে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি, দিলদার। তুমি তোমার দলের সর্বশক্তি দিয়ে এদের দু'ভাইকে রক্ষা কোরো। এদেরকে তুমি সুপথে চলার পরামর্শ দিও।

রানীমার কথা শুনে দিলদার নতজানু হয়ে বসল। এবং মাথা নত করে, বুকে হাত রেখে সে বলল, রানীমা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি এবং আমার দলের সর্বশক্তি দিয়ে এদের দু'ভাইকে রক্ষা করব। এদেরকে আমি সুপথে চলার পরামর্শ দেব।

রানীমা এবার কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুবর্ণলতা কোথায়? তাকে দেখছি না তো?

কুমার উত্তর দিল, কে সুবর্ণলতা? আমি তাকে চিনি না, মা।

তাহলে ঝড় ওঠার আগে তোর পাশে আমি যে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে দেখলাম সে কে?

ওর নাম সুলতা।

সুলতা! সুলতা কে? ও কী কোন রাজদুহিতা?

না মা, সুলতা কোন রাজদুহিতা নয়। এমনকি ও মানুষও নয়।

মানুষ নয়! তবে ও কে! ওর পরিচয় কী?

জানিনা, মা। আমি ওর সঠিক পরিচয় জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে ওর নাম সুলতা। এবং ও মারিগ্রামে বাস করে।

মারিগ্রামে বাস করে! এ তুই কী বলছিস, বাবা? ও গ্রামে কোন মানুষ বাস করে না। ও নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মা। মানুষের রূপ ধরে ও তোর কাছে আসে। ও তোকে শেষ করে দেবে, বাবা।

তারপর রানীমা বললেন, তুই আমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কর। আর কোনদিন তুই ওই সুলতার সংস্পর্শে যাবি না। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবি না।

রানীমার কথা শুনে রাজশঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর সে উঠে যেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের পা ছুয়ে বলল, মা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনদিন আমি সুলতার সংস্পর্শে যাব না। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।

রাজশঙ্কর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় রানীমা নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

একটু থেমে রানীমা বললেন, যাওয়ার আগে তোর কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে, বাবা। যতশীঘ্র সম্ভব তুই শতরূপাকে বিবাহ করিস।

রানীমার কথা শুনে কুমার আশ্চর্য হল। এবং সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, কোন শতরূপা? তুমি কী সেই দেড় পয়সার জমিদার-কন্যার কথা বলছ, মা?

হ্যাঁ বাবা, আমি তার কথাই বলছি। শতরূপার পিতা ছোট জমিদার, এই অছিলায় আমি তোর বিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। আর তাই আমি শতরূপার পিতাকে দেড় পয়সার জমিদার বলে উপহাস করেছিলাম। ওঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আমি আপত্তি করেছিলাম। আমি অপরাধ করেছিলাম, বাবা।

আমি জানি যে ছোট জমিদার হলেও শতরূপার পিতা একজন সজ্জন ব্যক্তি। এবং ওঁর কন্যাটি রূপসী, বুদ্ধিমতী এবং সর্বসুলক্ষণা। তাই যত শীঘ্র সম্ভব তুই ওকে বিবাহ করিস। আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করিস, বাবা।

মাতাপুত্রের কথার মধ্যেই কয়েকজন লস্কর রাজাবাবুকে আরামকেদারায় চাপিয়ে, আধশোয়া অবস্থায় মালীদের পর্ণকুটিরে নিয়ে এল। তারপর তারা আরামকেদারাটি রানীমার পাশে নামিয়ে দিল।

রাজাবাবুকে দেখে রানীমার দু'চোখে জল ভরে এল। এবং একটু পরে তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, স্বামী, রাজশঙ্কর এবং তেজশঙ্করকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আপনি ওদের দু'ভাইকে দেখবেন।

তারপর তিনি স্বামীর পায়ে হাত রেখে অনেকক্ষণ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর দু'চোখ হতে অশ্রুঝরে পড়তে লাগল। আর তার একটু করেই সব শেষ হয়ে গেল। রাজনন্দিনী এবং রাজবধূ স্বামীর পায়ে হাত রেখে, মালীদের পর্ণকুটিরে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কালরাত্রি শেষে পূর্বাকাশে তখন আগত দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেবযানী চুপ করতেই আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু যাকে নিয়ে তোমার এই আখ্যান, তার কী হল? সুবর্ণলতার কী হল? সে বেচারী কী চিরকালের মতো হারিয়ে গেল? সুমন্দা পিসির উপাখ্যানে কি তার কোনই উল্লেখ নেই?

আমার প্রশ্নের উত্তরে দেবযানী বলল, আসলে সেইসময় সুবর্ণলতার কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। একমাত্র সন্তানেরশোক সহ্য করতে না পেরে তার বাপমা তো আগেই মারা গিয়েছিল। আর শিওল গ্রামের প্রজারাও তার কথা ভুলে গিয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে বেচারী সুবর্ণলতা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনার প্রায় সাতবছর পরে কলকাতার জানবাজারে পান্নাবাঈ নামে একজন লক্ষ্ণৌয়ের নামকরা বাঈজী এসেছিল। আর শিওল গ্রামের কয়েকজন শৌখিন লোক সেই বাঈজীর গান শুনতে কলকাতায় গিয়েছিল। এবং ওই পান্নাবাঈয়ের চেহারার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সুবর্ণলতার হুবহু মিল দেখে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এবং গোপনে খোঁজ-খবর করে তারা জানতে পেরেছিল যে প্রায় সাতবছর আগে একদল জলদস্যু ওই সুন্দরী বাঈজীকে গাঙের ঘাট থেকে অপহরণ করেছিল। আর তারপর তারা তাকে গোপন নিলাম বাজারে নিয়ে যেয়ে হীরাবাঈ নামে একজন প্রৌঢ়া বাঈজীর কাছে অনেক টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিল। আসলে সেই নামকরা বাঈজী পান্নাবাঈ-ই হল সাতবছর আগে হারিয়ে যাওয়া শিওল গ্রামের বালবিধবা সুন্দরী সুবর্ণলতা।

দেবযানীর মুখ থেকে সুবর্ণলতা-উপাখ্যান শুনে আমি তাকে বললাম, দেখ, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, সেরা ঘরামির ঘর জোটে না, অতি সুন্দরীর বর জোটে না তো, ঘটনাটা দুঃখজনক হলেও, প্রবাদ বাক্যটি কিন্তু সুবর্ণলতার জীবনে নিদারুণভাবে মিলে গেছে। শিওল গ্রামের অতি সুন্দরী যুবতী সুবর্ণলতার কপালে বর তো জুটলই না, উপরন্তু বাঈজী হয়ে তাকে নানা জায়গায় মুজরো করে বেড়াতে হল। অতি সুন্দরী হওয়ার কারণে তাকে জলদস্যু দ্বারা অপহৃতা হতে হল। গোপন নিলাম বাজারে নিয়ে যেয়ে তাকে চড়া দামে বিক্রী করা হল। শুধুমাত্র তাকে ঘিরেই শিওল গ্রামে অমন একটা দাঙ্গা বেধে গেল। আবার তার কারণেই কালবৈশাখী ঝড়ে অতগুলো লোকের প্রাণ গেল। আর শেষে বিনা দোষে বেচারী সুলতার প্রেমটাও টুটে গেল। সুখ নামক শুকপাখিটা অধরাই রয়ে গেল।

তো এসব দেখেশুনে আমার তো মনে হচ্ছে যে অতি সুন্দরীদের যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। এবং তাদের বেশ দেখেশুনে চলাফেরা করা উচিত, তাই না?

আমার কথা শুনে দেবযানী কপট ক্রোধে বলল, দেখ, অমন খোঁচা মেরে কথা বোলো না, দীপ। আসলে তোমরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, তাই ওইসব অপহরণ-টপহরণ তোমাদের সমাজেই ঘটে। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও তোমরাই বাধাও। আমাদের সমাজে ওসবের চল নেই।

আমাদের সমাজে আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে প্রেম করি। মনের মিল হলে তাকে বিয়ে করে ফেলি; নইলে ফিরে আসি। ব্যস্।

একটু থেমে দেবযানী বলল, দেখ, দেবলা আমাদের গ্রামের ডাকসাইটে সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তার কপালে বর জুটেছে। সামাজিক স্বীকৃতিও মিলেছে।

প্রথম দিকে বিরিঞ্চি বোধ অবশ্য সামাজিক স্বীকৃতির ব্যাপারে বাগড়া দিয়েছিল, কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। সে তার কুচুটে মনের বিচার বুদ্ধি মতো যে অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছিল, সেটাও গ্রাহ্য হয়নি। উল্টে তাকেই শেষে সভা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

আসলে সভাপতি এবং উপস্থিত সদস্যদের কাছে বিরিঞ্চি বোধের বক্তব্য ছিল যে মনুষ্য সমাজের কোন যুবকের সঙ্গে ভূতযোনি সমাজের কোন যুবতীর বিয়ে হওয়াটাই অবৈধ। আর শুধু অবৈধ নয়, বিয়েটা অনৈতিক এবং অসামাজিক। আর তাই এ বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। বিয়েটাকে মেনে নেওয়া যায় না।

তার যুক্তি ছিল, দেবলার বিয়ে মেনে নিলে, তার সামাজিক স্বীকৃতি দিলে, ভূতযোনি সমাজের অনেক কন্যাই এই ধরনের বিয়েতে উৎসাহী হবে। এবং এভাবে চলতে থাকলে দিন দিন ভূতযোনি সমাজের সদস্য সংখ্যা কমতে থাকবে। এবং এইভাবে কমতে কমতে অদূর ভবিষ্যতে একদিন এই সমাজটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমাদের এই সমাজের কথা, আমাদের কথা তখন লেখা থাকবে শুধুমাত্র মানুষের পুঁথিপত্রে।

তারপর সে বলল, অমাবস্যার এক অন্ধকার রাতের সুযোগ নিয়ে দেবলা রূপের মোহ বিস্তার করেছে। রূপের মোহ বিস্তার করে সে মনুষ্য সমাজের মেঘনাদ নামে এক সুদর্শন যুবককে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছে। আর যেহেতু মানুষ স্থূলদেহী এবং আমরা সূক্ষ্মদেহী, তাই এই বিয়ে অবৈধ, অনৈতিক এবং অসামাজিক। এবং এমন একটা নিষ্ফল বদখত বিয়েকে বিয়ে বলেই মেনে নেওয়া যায় না। সামাজিক স্বীকৃতিও দেওয়া যায় না।

তারপর সে সভাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, এই ধরনের একটা নিষ্ফল বিয়ে করে দেবলার কোন উদ্দেশ্যটা সফল হবে? বিবাহিত জীবনে সে কী তার স্বামীকে কোন সন্তান দিতে পারবে? তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারবে? তার সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারবে? না। এসবের কিছুই সে পারবে না।

আর কিছু যদি না-ই পারবে তো এমন একটা বিয়ের প্রয়োজন কী? এমন একটা বিয়ের উদ্দেশ্য কী?

এবারে আপনারা অন্য দিকটাও ভাবুন। ধরুন, দেবলা যদি ভূতযোনি সমাজের কোন যুবককে বিয়ে করে, তাহলে কী হবে? তাহলে সে তার স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারবে। স্বামীর সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারবে। বিবাহিত জীবনে সে তার স্বামীকে সন্তান দিতে পারবে। ভূতযোনি সমাজের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারবে। সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে সে আর পাঁচজন সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো সাধারণ জীবন যাপন করতে পারবে।

তো এইসব কথা বিবেচনা করে আমি মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত সদস্যদের কাছে প্রস্তাব রাখছি যে দেবলার এই অবৈধ, অনৈতিক এবং অসামাজিক বিয়েকে সরাসরি খারিজ করা হোক। এবং তাকে এই সমাজেরই যে কোন একজন যুবককে বিয়ে করতে বাধ্য করা হোক। অন্যথায় তাকে এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে এই সমাজ হতে বহিষ্কার করা হোক।

দেবলা আমার ঘরে, আমার পাশেই বসেছিল। বিরিঞ্চি বোধের ওইসব কুচুটে প্রস্তাব শুনে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে জড়িয়ে ধরে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কারণ মেঘনাদকে যে ও প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসে।

দেবলার কান্না দেখে আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, তুই মিছামিছি ভয় পাচ্ছিস, সই। প্রেম করেছিস, ভাল করেছিস। বিয়েকরেছিস, বেশ করেছিস। ওই কুচুটেটা বলার কে?

তুই চুপটি করে আমার ঘরে বসে থাক, সই। দরকার হলে আমি নিজে আসরে নামব। ওই পাজিটার নাকে আমি আচ্ছা করে ঝামা ঘষে দেব!

ওদিকে বিরিঞ্চি বোধের প্রস্তাব শুনে সভায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই তার আশপাশের সদস্যদের সঙ্গে নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। এমন সময় সুমন্দা পিসি উঠে বললেন, দয়া করে আপনারা একটু চুপ করুন। এই সভার কাছে আমিও কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই।

পিসির কথা শুনে সকলে চুপ করল। তখন পিসি বললেন, সভাপতি অনুমতি দিলে, বিরিঞ্চি বোধের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সভার কাছে আমিও কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

সভাপতি বললেন, অনুমতি দেওয়া হল। তুমি বক্তব্য রাখ, সুমন্দা।

পিসি তখন গম্ভীর স্বরে বললেন, সভায় উপস্থিত সদস্যদের কাছে আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। আশাকরি আমি তার যথাযথ উত্তর পাব।

একটু থেমে পিসি বললেন, আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আমাদের সমাজ গান্ধর্ব বিবাহকে সমর্থন করে কিনা, এবং একে বৈধ বিবাহ বলে মানে কিনা?

সভার উপস্থিত সদস্যরা একসঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমাদের সমাজ গান্ধর্ব বিবাহকে সমর্থন করে এবং একে বৈধ বিবাহ বলে মানে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আমাদের এই সংগঠিত সমাজ কী একজন বিবাহিতা নারীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তাকে দ্বিচারিণী হতে বাধ্য করতে পারে?

সভায় উপস্থিত সদস্যরা একসঙ্গে চিৎকার করে বলল, না, না, তা পারে না। বিরিঞ্চি বোধের এটা একটা ঘৃণ্য প্রস্তাব এবং এটা বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

এই সভার কাছে আমার তৃতীয় প্রশ্ন হল যে বিরিঞ্চি বোধের কুচুটে স্বভাবের জন্য আমরা তাকে অনেক দিন আগেই এই মারিগ্রাম সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছি। তো যাকে আমরা এই সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছি, যে আমাদের সমাজের সদস্য নয়, সে কী অযাচিত ভাবে উপস্থিত হয়ে এই সভার কাছে কোন প্রস্তাব রাখতে পারে?

উপস্থিত সদস্যরা একযোগে বলে উঠল, না, না, তা পারে না। সভার কাছে প্রস্তাব রাখার তার কোন অধিকারই নাই। এই মুহূর্তে তাকে এই সভা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হোক।

কিন্তু সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিরিঞ্চি বোধকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। হাওয়া প্রতিকূল বুঝে কখন যেন সে নিজেই সভা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

তখন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে রব উঠল, পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। বিরিঞ্চি বোধ সভা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে রব চলতে থাকল। তখন সুমন্দা পিসি সভার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা একটু চুপ করুন। এই সভার কাছে আমার আরো কিছু বলার আছে।

পিসির কথা শুনে সভায় উপস্থিত সদস্যরা চুপ করল। তখন পিসি বললেন, দেখুন, বিবাহের ব্যাপারে আমরা আমাদের সমাজের যুবক-যুবতীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই গুরুত্ব দিই, প্রাধান্য দিই। আমরা জোর করে কারো ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। কারণ তাতে অনর্থ ঘটে।

এটা ঘটনা যে আমাদের সমাজের সদস্যসংখ্যা কিছুদিন ধরে হ্রাস পেয়ে চলেছে। তবে তা মনুষ্য সমাজের যুবকদের সঙ্গে আমাদের সমাজের যুবতীদের বিবাহের কারণে নয়। দেবলার সঙ্গে মেঘনাদের বিয়েটা নেহাৎই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এবং এর আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। আর আমাদের সমাজের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পাওয়াটাও একটা সাময়িক ঘটনা। এখনই এটাকে একটা ধারাবাহিক ঘটনা বলা যায় না। আর তাই 'গেল গেল' রব তোলা যায় না।

অথচ একটু আগে বিরিঞ্চি বোধ এই সভায় দাঁড়িয়ে সেই 'গেল গেল' রবই তুলেছিল। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমরা ইতিহাস হয়ে যাব বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিরিঞ্চি

বোধের ওই হতাশা ব্যঞ্জক মনোভাবের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ আমরা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে জানি। আর যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে জানে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। তারা ইতিহাস হয়ে যায় না।

আর আমি পরিশেষে বলি যে করুণাময় ঈশ্বর এই বিরাট বিশ্বকে এলোমেলো ভাবে সৃষ্টি করেননি। সকলের কথা মনে রেখেই তিনি এই বিরাট বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। সকলের কথা স্মরনে রেখেই তিনি এই বিরাট বিশ্বকে সুষ্ঠুরূপে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁর এই সুষ্ঠু সৃষ্টির মাঝে সকলের সঙ্গে আমরাও আছি। তাঁর এই সুষ্ঠু সৃষ্টির মাঝে সকলের সঙ্গে আমাদেরও স্থান আছে। আর তাই আমরা আগেও ছিলাম, এখনও আছি। এবং আমরা পরেও থাকব।

এরপর সভাপতি এবং উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুমন্দা পিসি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সভায় 'সাধু সাধু' রব উঠল।

অবশেষে সভাপতির ভাষনে আমার বাবা বললেন, সুমন্দা বোনের বক্তব্যের মধ্যেই আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশ আছে। অর্থাৎ দেবলা এবং মেঘনাদের বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতির ব্যাপারে আমরা পথ-নির্দেশ পেয়ে গেছি। তবুও শেষ কথা বলার আগে আমি আপনাদের কাছে, বিশেষ করে নব্য প্রজন্মের কাছে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

একটু থেমে সভাপতি বললেন, দেখুন, মনুষ্য সমাজ আমাদের ভূতযোনি বলে জানে। আমরা ভূতযোনি সম্ভূত সূক্ষ্মদেহী প্রাণী। আমরা সূক্ষ্মদেহী, মানুষ স্থূলদেহী। তবে মানুষের মতো আমরাও জন্ম-মৃত্যু চক্রে বাঁধা। অর্থাৎ মানুষের মতো আমাদেরও জন্ম হয়, মৃত্যু হয়। মানুষের মতো আমাদেরও কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য আসে। তবে মানুষ স্থূলদেহী হওয়ায় আমরা তাদের সবসময় দেখতে পাই। কিন্তু আমরা সূক্ষ্মদেহী হওয়ায় মানুষ আমাদের দেখতে পায় না। তবে অমাবস্যা তিথির অন্ধকার রাতে আমরা আমাদের সূক্ষ্মদেহকে বায়বীয় দেহে রূপান্তরিত করতে পারি। এবং অমাবস্যা তিথির অন্ধকার রাতে সেই বায়বীয় দেহকে আমরা অটুট রাখতে পারি। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের বায়বীয় দেহের সঙ্গে তখন মানুষের স্থূল দেহের কোন প্রভেদ বোঝা যায় না। আর আমরা দেখা দিলে মানুষ তখন আমাদের দেখতে পায়। আমাদের সঙ্গে তখন তারা কথাবার্তা বলতেও সক্ষম হয়।

মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আমাদের অতি প্রিয়। আর বোধ হয় সেই কারণেই আমাদের সমাজের যুবক যুবতীরা মনুষ্য সমাজের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে প্রেম পিরিতিতে লালায়িত হয়। আর তাই অমাবস্যা তিথির আঁধার রাতে তারা তাদের সূক্ষ্মদেহকে অতি সুন্দর বায়বীয় দেহে রূপান্তরিত করে। তারপর তারা নানা বসন, ভূষন এবং সুবাসিত পুষ্পে সজ্জিত হয়ে মনুষ্য সমাজের যুবক-যুবতীদের কাছে যায়। তাদের সঙ্গে তারা প্রেম-পিরিতির সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর এইসব ঘটনাকেই গ্রাম গঞ্জের মানুষ অমুককে পরীতে ধরেছে, তমুককে হুরীতে ধরেছে, জিনে ধরেছে

বলে রটিয়ে বেড়ায়। এবং এইসব রটনাকে ভিত্তি করেই নানা আখ্যায়িকার জন্ম হয়। নানা গল্প-গাঁথার সৃষ্টি হয়।

একটু থেমে সভাপতি আবার বললেন, যাহোক, অনেক কথা বলা হল। এবারে আমি দেবলা ও মেঘনাদের বিয়ের ব্যাপারে আসছি। ওদের দু'জনার বিয়েটা সত্যিই একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। কারণ এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। আমাদের সমাজের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে মনুষ্য সমাজের যুবক-যুবতীদের প্রেম পিরিতি বিয়ে অবধি গড়ায়নি। মাঝপথেই তা শেষ হয়ে গেছে। বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অসম প্রেমের অন্ধকারময় গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে তারা সুখ নামক শুকপাখিটার খোঁজ পায়নি। তারা সুখ পায়নি, শান্তি পায়নি। শুধু দুঃখ পেয়েছে।

তো যাহোক, অষ্টবিধ বিয়ের মধ্যে আমাদের সমাজে গান্ধর্ব, প্রাজাপত্য এবং আসুর বিয়ের প্রচলন আছে। কিন্তু পৈশাচ, রাক্ষস, আর্য, ব্রাহ্ম এবং দৈব বিয়ের প্রচলন আমাদের সমাজে নেই।

আর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজের প্রচলিত নিয়ম মেনেই দেবলা গান্ধর্ব মতে মেঘনাদকে বিয়ে করেছে। এ বিয়ে তাই সবদিক দিয়েই সিদ্ধ। আর যেহেতু আমাদের এই সংগঠিত সমাজ একজন বিবাহিতা নারীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তাকে দ্বিচারিণী হতে বাধ্য করতে পারে না, এ বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আমি তাই কোন বাধা দেখিনা।

সুতরাং এই সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সম্মত হলে নির্দ্বিধায় দেবলা ও মেঘনাদের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে।

সভাপতির বক্তব্য শুনে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একযোগে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবলা ও মেঘনাদের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে।

সদস্যদের সম্মতিক্রমে সভাপতি বললেন, অতি উত্তম। উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে আমি দেবলা ও মেঘনাদের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতির আর্জি অনুমোদন করলাম। এবং সেই সঙ্গে আজকের সন্ধ্যাকালীন সভা সমাপ্ত হল।

দেবলা তখনও আমার পাশেই বসেছিল। ওদের বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতির আর্জি মঞ্জুর হয়েছে দেখে আনন্দে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে জড়িয়ে ধরে ও অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। তবে সে অশ্রু আনন্দাশ্রু। আর তা দেখে আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে চুপি চুপি বললাম, জল বিনে মীন কাঁদে পতি বিনে নারী।

শ্যামবিনে রাধা কাঁদে
শুক বিনে শারী।
এ যে, চাঁদ সোহাগী কুমুদীর
চক্ষে ঝরে বারি!

আখ্যান শেষ করে দেবযানী আমাকে বলল, আমাদের কথা তো অনেক শুনলে। এবার তোমাদের কথা বল। তোমার কথা বল। তুমি বল, আমি শুনি।

আমি বললাম, দেখ দেবযানী, লোকে আমাকে মন্দ বলে। আমি মন্দ। আমার সব কিছুই নাকি মন্দ। ভাল বলে কিছু নেই, একমাত্র আমার এই সুন্দর চেহারাটা ছাড়া। আবার দু'একজন নিন্দুক আমার এই সুন্দর চেহারাটাকেও ব্যঙ্গ করে মাকালফল বলে। তবে ওই দু'একজন নিন্দুকের ব্যঙ্গ মেনে নিয়েও আমি বলতে পারি যে চেহারায় আমি মাকাল ফল হলেও প্রকৃতিতে আমি একটা জ্বলন্ত উল্কা। একটা জীবন্ত উল্কা।

জানি না কোন এক অজানা শক্তির আকর্ষণে একদিন আমি কক্ষচ্যুত হয়েছিলাম। আর তারপর থেকে আমি ছুটে চলেছিলাম। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে চলেছিলাম। জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে আমি ছুটে চলেছিলাম। দিগন্তের একপ্রান্ত হতে আমি অপর প্রান্তে ছুটে চলেছিলাম।

আর এইভাবে জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একদিন আমি নীচের পৃথিবীর দিকে তাকালাম। নীচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমি একটা মনোরম সরোবর দেখতে পেলাম। একটা শীতল জলের সরোবর দেখতে পেলাম। এবং আমি প্রলুব্ধ হলাম। অতি কষ্টে আমি আমার দুরন্ত গতি সম্বরণ করলাম। দুরন্ত গতি সম্বরণ করে আমি নীচের পৃথিবীর বুকে ঝাঁপ দিলাম। সেই শীতল জলের সরোবরের বুকে ঝাঁপ দিলাম। সেই শীতল জলের সরোবরের বুকে ঝাঁপ দিয়ে আমি আমার দেহের জ্বালা জুড়োতে চাইলাম। আমি আমার মনের জ্বালা জুড়োতে চাইলাম।

কিন্তু হায়! কোথায় সেই শীতল জলের সরোবর? আমি যার বুকে ঝাঁপ দিলাম সে তো মোটেও কোন সরোবর নয়! এ যে এক কন্যে মাত্র। নেহাৎই এক সাধারণ কন্যে। আর কিছু নয়।

তখন রাগে, দুঃখে, হতাশায় আমি আমার দেহের আগুনে, আমার মনের আগুনে সেই কন্যেকে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে খাক করে দিতে গেলাম। আমি আমার—।

আমার কথায় বাধা দিয়ে দেবযানী বলল, শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও। দেখ, একাকী কোন পুরুষই পূর্ণ নয়। একাকী কোন নারীও পূর্ণ নয়। দুয়ে মিলে পূর্ণ। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ। আর তাই কোন পুরুষই তার দেহের জ্বালা নিজে জুড়োতে পারে না। কোন পুরুষই তার মনের জ্বালা নিজে জুড়োতে পারে না। পুরুষের দেহের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারে একজন নারী। পুরুষের মনের জ্বালাও জুড়িয়ে দিতে পারে একজন নারী। আর এ হল নারীর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

শোন বন্ধু, নারীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে পুরুষকে শীতল করার ক্ষমতা, পুরুষকে শান্ত করার ক্ষমতা। আর তাই নারীর প্রান ঢালা ভালবাসায়, নারীর দেহ স্পর্শে পুরুষ শীতল হয়, পুরুষ শান্ত হয়। এবং একই সঙ্গে সে নারীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, উদ্দীপ্ত হয়।

হে বন্ধু, আমি নিজে একজন নারী। আর তাই নারীর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার কথা, ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা আমার অজানা নয়। শীতল জলের সরোবর ভেবে তুমি

যে কন্যের বুকে ঝাঁপ দিয়েছ, সে কন্যে হয়তো সত্যি সত্যিই এক শীতল জলের সরোবর। সে কন্যে তাই সত্যি সত্যিই তোমার দেহের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে, তোমার মনের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে। আর একই সঙ্গে তোমরা দু'জনে মিলে পূর্ণ হবে, তোমরা দু'জনে মিলে সম্পূর্ণ হবে, পরিপূর্ণ হবে।

একটু থেমে দেবযানী বলল, দেখ তোমার ওই ছুটোছুটির কথা শুনে আমার মৃগতৃষার কথা মনে পড়ছে।

মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত মৃগ স্বচ্ছ জলপানাশায় মরীচিকার পেছনে ছোটে। এবং এই ভাবে ছুটতে ছুটতে হতভাগ্য মৃগটি একসময় ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। তোমাকে দেখে এবং তোমাব কথা শুনে আমার সেই হতভাগ্য মৃগের কথা মনে পড়ছে।

দেবযানীর কথা শুনে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আমাকে দেখে এবং আমার কথা শুনে তোমার কী সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছে যে ভ্রমক্রমে আমি মরীচিকার পেছনে ছুটছি? আমি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবযানী বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও! একটু দাঁড়াও! মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে ডাকছে। আমি নারীকণ্ঠের দীপ—, দীপ— ডাক শুনতে পাচ্ছি। কান পাত, তুমিও শুনতে পাবে।

আমি কান পাতলাম। কিন্তু কিছু শুনতে পেলাম না। দেবযানীকে বললাম, কই, আমি কোন ডাক শুনতে পাচ্ছি না তো!

দেবযানী বলল, ঠিক ঠিক কান পাত, শুনতে পাবে।

আমরা দু'জনে একসঙ্গে কান পাতলাম। এবারে শুনতে পেলাম। দীপ—, দীপ— ডাক শুনতে পেলাম। ওর গলা চিনতে পারলাম। লক্ষ্মী ডাকছে। অমৃতা- লক্ষ্মী ডাকছে। বলছে, দীপ, তুমি কোথায়? আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না!

দেবযানী আমায় জিজ্ঞাসা করল, কে ডাকছে বলতো?

আমি উত্তর দিলাম, লক্ষ্মী ডাকছে।

লক্ষ্মী! সে কে?

লক্ষ্মী আমার গ্রামের মেয়ে।

সে কী কুমারী কন্যে?

হ্যাঁ, সে কুমারী কন্যে।

এই অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে একজন কুমারী কন্যে তোমায় খুঁজে ফিরছে। সে কী শুধুই তোমার গ্রামের মেয়ে বলে? তার সঙ্গে তোমার অন্য কোন সম্পর্ক নেই?

দেবযানীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। তখন দেবযানী বলল, ঠিক আছে, তুমি চুপ করে বসে থাক। আমি লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলব।

দেবযানী উঠে গেল। কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে ও পিছু ফিরে দাঁড়াল। পিছু ফিরে

দাঁড়িয়ে ও আমাকে বলল, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যেও না। ওখানেই বসে থেকো। তারপর ও চলে গেল।

দেবযানী চলে গেল। ও লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলতে গেল। আমি বসে রইলাম। নীলসায়রের শান বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে আমি একা একা বসে রইলাম। লক্ষ্মীর কথা ভাবতে লাগলাম। ওর আগমনের হেতু বুঝতে পারলাম। বহুদিন আগের সেই রটন্তী অপেরার কথা আমার মনে পড়ল। সেদিনের দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেবারে লক্ষ্মী ওর উকিল মেসোমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। ওব উকিল মেসোমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ে আমাকে ও জোর করে তুলে এনেছিল। বলা যায়, সেবারে আমাকে ও ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। রটন্তী অপেরা থেকে, কৃষ্ণার কাছ থেকে আমাকে ও ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল। কৃষ্ণা সেদিন খুব কেঁদেছিল। এক একদিন আমি যখন আমার মনের গভীরে ডুব দিই, আমি কৃষ্ণার সেই কান্না শুনতে পাই। আজও শুনতে পাই।

আসলে রটন্তী অপেরার সেই কিশোরী কন্যে কৃষ্ণাকে আমি ভুলতে পারিনি। তাকে না-পাওয়ার ব্যথা আমি ভুলতে পারিনি। আজও ভুলতে পারিনি।

দেবযানীর এত কাছাকাছি এসেও আমার সে ব্যথায় প্রলেপ পড়েনি। দূর-দূরান্তে ঘুরে মরেও সে ব্যথায় প্রলেপ পড়েনি। সে ব্যথা জুড়োয়নি। সে ব্যথা জুড়োনোর নয়।

জানি না কতক্ষণ আমি ওইভাবে বসেছিলাম। বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম। এক সময় দেবযানী ফিরে এল। ফিরে এসে ও আমাকে বলল, চল, লক্ষ্মীর কাছে চল। ও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। জান, ও খুব কাঁদছিল। ও তোমাকে বড্ড ভালবাসে, তাই কাঁদছিল। ওর সঙ্গে তুমি ঘরে ফিরে যাও। ঘরে ফিরে যেয়ে ওকে তুমি বিয়ে কর। বিয়ে করে তোমরা দুজন সুখী হও। সুখে থাক। শান্তিতে থাক। আমি তাই চাই, বুঝেছ?

দেবযানীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। দেবযানী বলল, লক্ষ্মী হয়তো সুন্দরী নয়। ও চাষী-গেরস্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে। গড়া-পেটা শরীরের সাদামাটা মেয়ে। তবে ও লেখাপড়া শিখেছে। আর ওর মনটাও সরল। আর ওর সেই সরল মন জুড়ে শুধু তুমিই রয়েছ।

একটু থেমে দেবযানী বলল, তাছাড়া, লক্ষ্মী তোমার মায়ের পছন্দ-করা মেয়ে। ওকে বিয়ে করলে তুমি তোমার মায়ের আশীর্বাদ লাভ করবে। মায়ের আশীর্বাদে, লক্ষ্মীর ভালবাসায় তুমি জীবনে সুখী হবে। শান্তি পাবে। তুমি শীতল হবে। তুমি শান্ত হবে। তোমার ওই বাউন্ডুলে স্বভাবের ইতি ঘটবে। তুমি থিতু হবে।

আমার কথা শোন। ওঠ। আমার সঙ্গে লক্ষ্মীর কাছে চল। ও তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

আমি আগের মতোই চুপ করে বসে রইলাম। তখন দেবযানী বলল, দেখ, সবার

ভাগ্যে সুন্দরী বউ জোটে না। ফুল পরীও না। আর সুন্দরী হলে, ফুলপরী হলেই যে তার মনটা সুন্দর হবে, তেমন কথা বলা যায় না। সে তোমাকে লক্ষ্মীর মতো প্রানঢালা ভালবাসা দেবে কি না, তাও বলা যায় না। আর সেই জন্যই লক্ষ্মী ভাল। ঢের ভাল। কারণ ও তোমাকে ভালবাসে। নিজের প্রাণের চেয়েও ও তোমাকে বেশী ভালবাসে।

একটু থেমে দেবযানী বলল, আমার কথা শোন। ওঠ। লক্ষ্মীর কাছে চল। ওর সঙ্গে ঘরে ফিরে যাও। ঘরে ফিরে যেয়ে ওকে বিয়ে কর। এমন টো-টো করে ঘুরে না বেড়িয়ে থিতু হও, বুঝেছ? ওঠ। উঠে দাঁড়াও।

এবারে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর এগিয়ে গেলাম। দেবযানী আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। খানিকটা যেয়ে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার তুফান কোথায়? তাকে দেখছি না তো?

একটু ইতস্ততঃ করে আমি জবাব দিলাম, বোধহয় আজ আমি ওকে আনিনি!

আজ তুমি ওকে আনোনি! তাহলে এই দীর্ঘপথ তুমি কী ভাবে এসেছ, হেঁটে?

বোধহয় হেঁটেই এসেছি।

মুচকি হেসে দেবযানী বলল, ঠিক আছে। তাতে আর কি হয়েছে। দু'জনে মিলে একটা ঘোড়ায় চলে যেও। সে যুগের পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে হরণ করেছিল। এ যুগের সংযুক্তাই না হয় পৃথ্বীরাজকে হরণ করবে। আর আমি তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

আমি এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে যেয়ে দেখলাম লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ নীচু করে ও ওর ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেবযানী আমাকে বলল, যাও, ওর কাছে যাও। ওর মান ভাঙাও।

আমি আরো একটু এগিয়ে যেয়ে ওর পেছনে দাঁড়ালাম। তারপর গলা নামিয়ে বললাম, আমি এসেছি। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন সাড়া পেলাম না।

আমি আবার বললাম, লক্ষ্মী, আমি এসেছি। কিন্তু এবারেও কোন সাড়া পেলাম না। আগের মতোই ও মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আরো একটু এগিয়ে গেলাম। তারপর ওর দেহটাকে দু'হাতে ধরে ওকে আমি আমার সামনা-সামনি দাঁড় করালাম। তারপর ওকে আমি আমার বুকে টেনে নিলাম। তখন আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ও কাঁদতে লাগল। খুব কাঁদতে লাগল। বোধহয় কেঁদে কেঁদে ওর প্রতি আমার সকল অবহেলার গ্লানি ও ধুয়ে ফেলতে চাইল। বোধহয় কেঁদে কেঁদে ওর প্রতি আমার সকল অপরাধের গ্লানি ও ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে চাইল। ওকে আমি কাঁদতে দিলাম। মনের ভার হাল্কা করার জন্য ওকে আমি কাঁদতে দিলাম। ও কাঁদতে লাগল।

একটু পরে আমি ওকে বললাম, দেখ, মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ভাল মানুষেও ভুল করে। আর তারা ক্ষমাও পায়। আমি মন্দ। আমি ভুল করেছি। আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও, লক্ষ্মী।

এবারে লক্ষ্মী মুখ তুলল। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, এবারে বাড়ি চল।

ধরা গলায় লক্ষ্মী বলল, চল।

লক্ষ্মীকে আমি আমার সামনে বসতে বললাম। কিন্তু ও তাতে রাজী হল না। বলল, এখন ও তুমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছ, মায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এখনও তোমার ঘোর কাটেনি। আছাড় খেয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙবে নাকি? ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে থাকবে। ঘোড়া আমিই চালাব।

অতএব আমাকেই সামনে বসতে হল। লক্ষ্মী পেছনে বসে লাগাম হাতে তুলে নিল। যাওয়ার আগে আমরা দু'জন হাত নেড়ে দেবযানীর কাছে বিদায় চাইলাম। দেবযানী হাত নেড়ে আমাদের দু'জনকে বিদায় জানাল। লক্ষ্মী ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ভোরের আলো ফুটতে তখন আর বেশি দেরী ছিল না।

তেলোভাবে টিমটিমে হ্যারিকেনটা খানিকক্ষণ আগেই নিভে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য কারো তেমন অসুবিধা হয় নি। কারণ গল্প শুনতে আলোর প্রয়োজন হয় না, মনের প্রয়োজন হয়। মনের একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। আর তাই আগন্তুক চুপ করতেই অন্ধকারে বসে রামলোচন খুড়ো বললেন, বাঃ! বেড়ে আখ্যান শোনালে, ভায়া! সহজ, সবল, আর বাগাড়ম্বর বর্জিত ভাষায় বর্ণিত জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার একটা মেজাজি প্রীতিকর আখ্যান। পার্থিব অপার্থিব লৌকিক অলৌকিক আর মন্দ-ভালর মিশেলে তৈরী একটা প্রাণবন্তকর আখ্যান। ঠিক যেমনটি আমরা তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।

কিন্তু তবুও একটা কথা না বলে পারছি না, ভায়া। দেখ, সুখ দুঃখ হাসি-কান্না নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু তবুও কৃষ্ণা, বিদিশা এবং পদ্মিনীবাঈ-এর জীবন বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমাদের মন ভারী হয়ে উঠেছে। কারণ ওই তিন কন্যের জীবন যেন বড় বেশি দুঃখে ভরা, বড় বেশি কান্না ভেজা। ওই তিন কন্যের জীবন বৃত্তান্ত তাই আমাদরে মনে দাগ কেটে দিয়েছে।

একটু থেমে খুড়ো বললেন, যাহোক, রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই এসো, আমরা আরো কিছুক্ষন গল্প-গুজব করি। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাব। আর বাইরে রাত কাটানোর অপরাধে আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনা সহ্য করেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকব। ব্যস্।

খুড়োর প্রস্তাব শুনে আগন্তুক বললেন, কিন্তু আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না, দাদা। ভোরের আলো ফোটার আগেই আমাকে বিদায় নিতে হবে।

কিন্তু এখন ও তো আঁধার রয়েছে! এই আঁধারে তুমি কোথায় যাবে?

অনেক দিন হয়ে গেল তো, তাই আঁধারে চলাফেরা করাটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আমার বাধা আঁধারে নয়, আলোয়।

না, না, শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নিতে যেও না। আরো খানিকক্ষণ বসে যাও। আলো ফুটুক।

আর শোন। একদিন সপরিবারে আমাদের ব্রজপুরে এসো। বৌমাকে, মানে এ যুগের সংযুক্তাকে আমরা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, দাদা। কারণ আপনার বৌমা এখনও এই সুন্দর পৃথিবীর একজন। হুতোমপুরের একজন। কিন্তু আমার বর্তমান ঠিকানা সপ্তস্বর্গের দ্বিতীয় লোকের পঞ্চম স্তর। এমতাবস্থায় আপনার বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসাতো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই কথা বলে আগন্তুক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আসরের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে বললেন, রাত শেষ হয়ে আসছে। এবারে আপনারা আমাকে আজ্ঞা দিন। আমি আমার নিজ লোকে ফিরে যাই।

আগন্তুকের কথা শুনে খুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজলোকে ফিরে যাই' কথার অর্থ কী? তুমি কোথায় ফিরে যাবে?

ওই যে বললাম দাদা, সপ্তস্বর্গের দ্বিতীয় লোকের পঞ্চম স্তর। অর্থাৎ ভুবর্লোকের পঞ্চম স্তর। আমি ওখানেই ফিরে যাব।

শুনুন দাদা, খানিকক্ষণ আগে আপনাদের আমি বলেছি যে অত্যাচারী জমিদার প্রতাপ রায়বর্মনের গুমঘর হতে কন্যাসমা কাবেরীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম। আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বজরার ছাদে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সময় আগতপ্রায় বুঝে কৃষ্ণার সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মা, লিঙ্গদেহধারী আত্মা শ্বেত বসনে ভূষিতা হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। এবং অবিনাশী আত্মা সম্বন্ধে আমাকে সে নানান তত্ত্বকথা শুনিয়েছিল। আমাকে সে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই রাতেই আমার সঙ্গে এই সুন্দর পৃথিবীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং ভুবর্লোকের পঞ্চম স্তর আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল।

একটু থেমে আগন্তুক বললেন, তবে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও এই সুন্দর পৃথিবীকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। এই পৃথিবীর বুকে ঘটে-যাওয়া বিগতদিনের ঘটনাগুলোকে আমি ভুলতে পারিনি। আর ভুলতে পারিনি বলেই আঁধার রাতে মাঝে মাঝে আমি এই পৃথিবীতে নেমে আসি। আমার জীবনের ঘটনাগুলো নিয়ে, বিগত দিনের ঘটনাগুলো নিয়ে আমি গল্প করি, এবং একই সঙ্গে আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গ লাভ করি।

কিন্তু যেহেতু আমার বর্তমান অবস্থান ভুবর্লোকের পঞ্চম স্তর; তাই সেখান থেকে এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে আমার কিছুটা কষ্ট হয়। তবে যেটুকু কষ্ট হয় তার

তুলনায় আমি আনন্দ পাই অনেকখানি। আপনাদের সঙ্গ পেয়ে, আপনাদের সঙ্গে গল্প করে যেমনটা আমি আজ রাতে পেলাম।

আচ্ছা বিদায়, বলে আঁধার রাতের আগন্তুক ব্রজপুরের গল্পের আসর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আঁধারে মিশে গেলেন।

*　　*　　*

তো আঁধার রাতের আগন্তুক আঁধারে মিশে গেলেন। রাত শেষ হয়ে আসছে দেখে তিনি চটপট ভুবর্লোকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আর রামলোচন খুড়ো তাঁর মুখ নিঃসৃত বাক্যসকল শ্রবণ করে রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি বাইরের জমাটবাঁধা আঁধারের দিকে চেয়ে রইলেন। যদিও সে চাউনি ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।

আর চোখের সামনে এমন একটা অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে যেতে দেখে আসরের প্রায় সকল সদস্যই আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে তাঁরা মুখে একটা অব্যক্ত আওয়াজ করতে লাগলেন।

ওদিকে সর্বজ্ঞমশাই প্রথম থেকেই আসরের পেছনে বসেছিলেন। আসল ব্যাপারটা তাঁর মগজে ঢুকতেই তিনি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতে তিনি রাম নাম জপ করতে লাগলেন। একেবারে ননস্টপ রাম নাম জপ করে গেলেন।

আর পটসুন্দর? ব্যাপারটা প্রথমে সে মোটে বুঝতেই পারেনি। কিন্তু একটু দেরীতে যখন বুঝতে পারল, বিষম ভয়ে সে বেচারা বার কয়েক অঁ-অঁ-অঁ-শব্দ করে উঠল। আর তারপরই সে জ্ঞান হারিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর লুটিয়ে পড়ল। এবং মুহূর্ত মধ্যে ব্রজপুর গল্পের আসরের একটা লন্ডভন্ড অবস্থা হল। একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা হল।

আর ওদিকে? ওদিকে তখন আঁধার রাতের আগন্তুক আনন্দিত মনে ভুবর্লোকের পঞ্চম স্তরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছিলেন।

(কাল্পনিক)

সমাপ্ত